প্রথম বাংলা সংস্করণ
২৫শে বৈশাখ. ১৩৬৫
(৮ই মে, ১৯৫৮)

প্রকাশক :
তপন কর ভৌমিক
সোমনাথ দত্ত
সাক্ষরতা প্রকাশন
৬০ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
বিলাস হাজরা
মডার্ণ প্রিন্টার্স
৬১ বি শ্যামপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ :
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে

'তমস'-এর তর্জমা হাতে নিয়ে আমার হয়েছিল অনুরোধে ঢেঁকি গেলার অবস্থা। গাধার খাটুনি খাটার পর যখন সবে একটু জিরোবার কথা ভাবছি, তখনই গুঁইগুঁই করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলাম। কয়েকটা কারণের মধ্যে ছিল, ভীষম সাহনী অনেক দিনের বন্ধু। তবে শুধু বন্ধুকৃত্য বললে ভুল হবে, 'তমস'-এর মর্মকথা আমাদের সবারই প্রাণের তারে ঘা দিয়েছিল। ইংরেজী অনুবাদ পাইনি, কাজেই মূল হিন্দী লেখাই অনুবাদের একমাত্র অবলম্বন হয়েছে। দেবনাগরী জানলেও হিন্দী পড়াটা আমার পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিল না। একাজে আমার মেজো জামাতা বিজয় আনন্দ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। হিন্দী থেকে সীমিত শক্তিতে আক্ষরিক অনুবাদ করে আমাকে সহায়তা করেছেন দেবদাস চক্রবর্তী ও শ্যামল চক্রবর্তী।

'তমস' বইতে উর্দু-পাঞ্জাবী ছাড়াও বহির্বঙ্গের এমন অনেক আঞ্চলিক শব্দ আছে, যা হিন্দু-উর্দু অভিধানে আমি খুঁজে পাই নি। সময় পেলে খোদ লেখকের কাছ থেকেই অর্থ জেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ছাপার তাগিদে তার সুযোগ হয় নি। আশা করছি, পরবর্তী সংস্করণে এই ঘাটতিগুলো পূরণের সুযোগ মিলবে।

অনুবাদে মোটামুটি যে ধারা অনুসরণ করেছি, তা 'মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ।' ইচ্ছে করেই গোড়ে গোড় দিয়ে চলেছিল মূলের অভিপ্রায় ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে কসুর করি নি। অনুবাদ উৎরেছে কিনা সে বিচার বিশেষজ্ঞ আর মরমী পাঠকদের।

'তমস' শুধু যে টিভি-তে চিত্রায়িত হওয়ার দরুনই আমাদের মন কেড়েছে, তাই নয়—'তমস' আমাদের এমন একটা ব্যথার জায়গায় হাত দিয়েছে, যা নিরাময় না করে জাতীয় কোনো সংকল্পই আমরা সাধন করতে পারব না।

সেদিক থেকে 'তমস' হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এনে ভারতীয় মহাজাতি গঠনে এক বড় প্রেরণা।

বাংলায় এ বই বার করার ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে প্রকাশকও আমাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বলরাজজীকে

এক

কুলুঙ্গিতে রাখা পিদিমের শিষটা ফের চমকে উঠল। দেয়ালের ওপর দিকে ছাদের নিচে দুটো ইঁট খসে গিয়েছিল। তার ফাঁক দিয়ে ঘরে হাওয়া ঢুকলেই অমনি আলোটা কাঁপতে শুরু করে। আর তার ছায়া দেয়ালে ইতস্তত নেচে বেড়ায়। কিছুক্ষণ পরে আলোর শিষ আবার সোজা হয়ে ওঠে আর তার মাথার ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেয়ালের গা আঁকড়ে টলতে টলতে ওপরে উঠতে শুরু করে, নাথু হাঁফাতে থাকে আর ভাবে তার নিশ্বাস লেগেই বুঝি আলোটা এইভাবে ছটফট করছে।

নাথু দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ে। তার নজর ফের গিয়ে পড়ে শুয়োরটার ওপর। শুয়োরটা কিঁকিঁক করে ঘরের মাঝখানে রাখা জঞ্জালের স্তূপ থেকে একটা দোরসা খোসা টেনে নিয়ে চিবোচ্ছিল। ছোট ছোট চোখে কুৎকুৎ করে মেঝের দিকে চেয়ে তার গাঢ় গোলাপী রঙের থোঁতামুখ খোসার ওপর ধরে ছিল। নাথু ঘণ্টা দুই ধরে একটানা এই বদখত নোংরা জানোয়ারটার সঙ্গে যুঝেছে: শুয়োরটা এর মধ্যে তার গোলাপী থুতনি দিয়ে তিনবার নাথুর পায়ে চোট দিয়েছে। তার ফলে নাথুর পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চোখদুটো মেঝের ওপর রেখে শুয়োরটা একবার দেয়ালের দিকে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই কিঁকিঁক করতে করতে দৌড় দিচ্ছে—মনে হয় কিছু একটা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার ছোট ল্যাজটা কাঁকড়াবিছের বিষাক্ত দাঁড়ার মতো তার পিঠের ওপর হেলছে দুলছে। কখনও এমন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝি গিঁট পড়ে যাবে, আর ঠিক তার পরই আপনা আপনি পাক খুলে গিয়ে সোজা হয়ে যাচ্ছে। বাঁ চোখ থেকে পিচুটির ঢল শুয়োরটার মুখ পর্যন্ত এসে নেমেছে। চলবার সময় তার বিশাল ভুঁড়ির জন্যে মনে হয় সে যেন ডাইনে বাঁয়ে দোল খেতে খেতে চলেছে। তার এই ছুটোছুটির ফলে ঘরময় জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ভাব, আবর্জনার পূতিগন্ধ, শুয়োরের শ্বাসপ্রশ্বাস আর সরষের তেলের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘরের মধ্যে দমবন্ধ অবস্থা। ইতস্তত রক্তের ছোপ। কিন্তু মরা দূরে থাক, শুয়োরের গায়ে কোথাও এতটুকু চোট লাগারও চিহ্ন নেই।

এই দুঘণ্টা নাথু যেন জলে কিংবা বালির স্তূপে সমানে ছুরি বসিয়ে চলেছে। কখনও শুয়োরের পেটে, কখনও কাঁধে ছোরা বিঁধিয়েছে। কিন্তু ছোরা টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্তই শুধু মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে। তার আঘাতের জায়গায় ছোট একটা আঁচড় ছাড়া শুয়োরের চামড়ায় নজরে পড়ার মতো আর কোনো দাগই দেখা যায়নি। আর শুয়োরটা ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে কখনও

হয়ত নাথুর পায়ে এসে তার থুতনির বাড়ি মেরেছে, কখনও দেয়াল ঘেঁষে ঘরময় ছুটোছুটি করেছে। নাথুর ছুরির মুখ শুয়োরের চর্বির থাক অবধি কেটেই ফিরে এসেছে, চর্বির স্তর পেরিয়ে আর ভেতরে ঢুকতে পারে নি।

শেষটায় মারার জন্যে পেলাম কিনা একটা অলক্ষুণে শুয়োর! কুচ্ছিত। ভুঁড়ি-সর্বস্ব। পিঠভর্তি কালো কালো চুল, মুখের আশপাশে সজারুর কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা সাদা কুঁচি।

নাথু কারও কাছে যেন শুনেছিল শুয়োর মারতে গরম জল লাগে। কিন্তু গরম জল নাথু পাবে কোথায়? একবার চামড়া সাফ করবার সময় শুয়োরের চর্বির কথা উঠেছিল, তখন তার দোসর ভিখু চামার বলেছিল, 'পেছনের ঠ্যাং ধ'রে শুয়োরকে পটকান মারো, তাহলে চিৎপটাং শুয়োর আর চট্ করে উঠে পড়তে পারবে না। তখন তার গলার টুঁটি কেটে দাও। ব্যস, তাহলেই শুয়োরের দফা রফা।' নাথু সব রকমের কেরামতিই করে দেখেছে, কোনোটাই কাজে আসেনি। মাঝের থেকে সে তার নিজের টেংরি আর হাঁটুতেই চোট পেয়েছে। এখন সে বিলক্ষণ বুঝতে পারছে চামড়া পরিষ্কার করা এক কথা আর শুয়োর মারা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কেন যে মরতে সে এই কাজের ভার নিয়েছিল। ইস্, পয়সা আগাম না নিলে সে অনায়াসে শুয়োরটাকে ঠেলে ঘরের বাইরে বার করে দিতে পারত।

'আমাদের সলোত্রি * সাহেবের একটা মরা শুয়োর দরকার। ডাক্তারি কাজের জন্যে'—নাথুকে এ কথাটা বলেছিল মুরাদ আলী। তখন চামড়া সাফাইয়ের কাজ সেরে নাথু সবে কলতলায় হাতমুখ ধুচ্ছিল।

নাথু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'শুয়োর! কী করতে হবে, হুজুর?'

'এখানে পিগারির শুয়োর চারপাশে আকছার ঘুরে বেড়ায়। তারই একটাকে কুঠুরির ভেতর পুরে ফ্যালো'।

শুনে নাথু হাঁ করে মুরাদ আলীর দিকে তাকায়। 'আমি কখনও শুয়োর মারিনি, হুজুর। শুনেছি শুয়োর মারা শক্ত কাজ। মাপ করুন, আমাকে দিয়ে ও কাজ হবার নয়, হুজুর। যদি ছাল ছাড়াতে বলেন তো ছাড়িয়ে দিতে পারি, মারার কাজ তো পিগারিওয়ালারাই করে।'

'পিগারিওয়ালাদের দিয়েই যদি হবে, তো তোমাকে আর বলতে যাব কেন? এ কাজ তোমাকেই করতে হবে—' ব'লে মুরাদ আলী কর্‌করে একটা পাঁচটাকার নোট পকেট থেকে বার করে নাথুর জোড়-করা হাতের পেছনের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

'এটা তোমার পক্ষে খুব একটা ভারী কাজ নয়। সলোত্রি ফরমাশ করেছেন আমি আর কী ক'রে না বলি।' মুরাদ আলী তার কোনো কথায় কান না দিয়ে ব'লে চলল, 'ভাগাড়ের আশপাশে পিগারির বিস্তর শুয়োর ঘুরে বেড়ায়। কায়দা করে একটাকে ধরে ফ্যালো। সলোত্রি সাহেব নিজেই পরে পিগারিওয়ালার সঙ্গে

---

* পশুর ডাক্তার

...বলে দেবেন।' এরপর নাথুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই মুরাদ আলী সেখান থেকে সরে পড়বার উপক্রম করল। হাতের সরু ছড়িটা নিজের পায়ে ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'আজ রাতেই কাজটা সেরে ফ্যালো। সকাল-সকাল রাস্তার জমাদার গাড়ি নিয়ে এসে যাবে। তার মধ্যে ফেলে দিও। ভুলো না যেন! সলেতীর সাহেবের বাড়িতে আপনা থেকেই ওটা পৌছে যাবে। ওঁকে আমি ব'লে রাখব। বুঝেছো তো?'

নাথু তখনও হাতজোড় করে রয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি, কর্‌করে পাঁচ-টাকার নোটটা তার পকেটের মধ্যে ঢুকে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

'এটা মুসলমান পট্টি। কোনো মুসলমান দেখে ফেললে পাড়ার লোক কিন্তু ক্ষেপে যাবে। তুমি সেটা খেয়াল রেখো। এ কাজ করতে আমারও খারাপ লাগছে। কিন্তু করি কী? সাহেবের হুকুম। কী করে অমান্য করি।' এই ব'লে মুরাদ আলী ফের তার নিজের পায়ে ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে সেখান থেকে চলে গেল।

মুরাদ আলীর সঙ্গে তার রোজের কাজ। তাই নাথুই বা কী ক'রে 'না' বলে। শহরে ঘোড়া মরলে, গোরু-মোষ মরলে মুরাদ আলী নাথুকে তার ছাল-চামড়া পাইয়ে দেয়। তারজন্যে অবশ্য মুরাদ আলীকে হাতে টাকাটা আধুলিটা গুঁজতে হয়। তবে চামড়াটাতো তেমনি পাওয়া যায়। হেঁজিপেঁজি লোক তো নয় মুরাদ আলী! খোদ কমিটির একজন চাঁই। সুতরাং ছোটবড় সকলেরই তাকে দরকার পড়ে।

শহরের সব রাস্তাতেই মুরাদ আলীর গতি ছিল অবাধ। হাতে বেতের ছড়ি নিয়ে বেঁটে কালো মুরাদ আলী টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াত। শহরের যেকোনো অলিগলিতে তার দর্শন মিলত। সাপের মত কুৎকুতে চোখ। ঝাঁটার মত গোঁফ। হাঁটু অবধি লম্বা খাকী কোট। পরনে সালোয়ার। মাথায় পাগড়ি।—সব সময় একেবারে ফিটফাট। এই সবকিছু নিয়ে মার্কামারা লোক ছিল মুরাদ আলী। হাতে ছড়ি না থাকলে মাথায় পাগড়ি না থাকলে, বেঁটেখাটো না হলে, মুরাদ আলীর পুরো চেহারাই যেন খুলত না।

মুরাদ আলী তো হুকুম দিয়েই খালাস। এদিকে নাথুর যে জান যাওয়ার দাখিল। কোথা থেকে সে এখন শুয়োর ধরবে, আর মারবেই বা কী করে? নাথু একবার ভেবেছিল সোজা শহরের বাইরে পিগারিতে চলে যাবে। গিয়ে ওদের বলবে একটা শুয়োর কেটে ওরা যেন সলেতীর সাহেবের কুঠিতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পিগারির দিকে যেতে নাথুর পা ওঠে নি।

শুয়োরটাকে এই ঘরের মধ্যে নিয়ে আসাটাও বড় সহজে হয়নি। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নাথু লক্ষ্য করেছিল শুয়োরের দল কিভাবে ময়লার মধ্যে মুখ ঘষে ঘষে চলে। এছাড়া আর কিছু তার মাথায় খেলে নি। ময়লার একটা গাদা থেকে নাথু দফায় দফায় ময়লা তুলে এনে ভাঙাচোরা এই কুঠুরির বাইরের উঠোনে দরজার পাশে জমা করতে লাগল। যখন সন্ধ্যে হয়-হয়, তখন পচা এঁদো ডোবা, গোবরের ডাঁই আর জঞ্জালে ঠাসা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে তিনটে শুয়োরকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তার মধ্যে একটা শুয়োর ময়লার গন্ধে গন্ধে এসে উঠোনে পা দিতেই নাথু

ঝট্ করে খিড়কির দরজা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর [illegible]
ঘরের দরজা খুলে হাতের লাঠিটা দিয়ে শুয়োরটাকে হাঁকিয়ে ঘরের মধ্যে চালান করে দিল। পাছে খোঁয়াড়ের কেউ শুয়োরের খোঁজে এদিকে এসে পড়ে, সেই ভয়ে শুয়োরের কিঁক-কিঁক আওয়াজ বন্ধ করার জন্যে নাথু উঠোন থেকে ময়লা তুলে তুলে সমানে ঘরের মধ্যে এনে ফেলতে লাগল। ঘরের মধ্যে রাশীকৃত ময়লা পেয়ে শুয়োরটাও দিব্যি তাই নিয়ে মেতে উঠল। আর নাথুও বেশ নিশ্চিন্তে ঘরের বাইরে বসে বিড়ি টানতে টানতে মনে মনে অন্ধকারের আরাধনা করতে লাগল। অনেকক্ষণ পর সন্ধ্যে যখন বেশ ঘন হয়ে এল, তখন নাথু ঘরের মধ্যে ঢুকলো। প্রদীপের কাঁপো-কাঁপো ম্যাড়মেড়ে আলোয় সে দেখল—ঘরময় ময়লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আর তা থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে। কুচ্ছিত ধুম্সো শুয়োরটাকে দেখে নাথু দমে গেলো। মনে মনে তার এই ভেবে আপসোস হতে লাগল যে, এই জঘন্য বিপজ্জনক কাজটা কেন সে মরতে ঘাড়ে নিয়েছে। একবার এও মনে হল যে, উঠে এক লাফে কুঠুরির দরজাটা খুলে দেয়, আর শুয়োরটাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়।

এদিকে মাঝরাত্তির পার হতে যায়। অথচ জানোয়ারটা তখনও আগের মতই ময়লার মধ্যে হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে রক্তের দু-একটা ফোঁটা; শুয়োরের ভুঁড়ির দু-এক জায়গায় নজরে পড়ছে চেরা দাগ। নাথুর নিজের পায়েও জানোয়ারটার থুতনির চোট লেগেছে। শুয়োরটা আগের মতই ঘরের মধ্যে দিব্যি বহালতবিয়তে রয়েছে। এদিকে নাথুর ভারী নিশ্বাস পড়ছে। সারা গায়ে দরদর করে ঘাম দিচ্ছে। আচ্ছা বিপদে পড়া গেছে! নাথু এ থেকে মুক্তির কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছে না।

দূরে শেখের বাগানের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নাথু ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। শুয়োরটার দিকে ফের তার নজর গেল। ময়লার গাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুয়োরটা পেচ্ছাপ ক'রে ভাসাল। তারপর ঘরের মাঝখান থেকে ছিটকে ডানহাতি দেয়াল বরাবর চলতে লাগল। আর পিদিমের শিষটাও ফের চমকে উঠল। তার ছায়াটা যেন কোনো দুঃস্বপ্নের মতো বার বার দেয়ালে লুটোপুটি খেতে লাগল। অবস্থা যে-কে সেই, শুয়োরটা আগের মতই কখনও মাথা নিচু ক'রে ময়লা শোঁকার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কখনও দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে, আবার কখনও ঘোঁতঘোঁত ক'রে দেয়াল বরাবর ছুটে পালাচ্ছে। আগেরই মত তার সরু ল্যাজটা লিকলিকে লম্বা কেন্নোর মতো কখনও গুটিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও সোজা টান-টান হচ্ছে।

'উঁহু এভাবে চলবে না'—দাঁত কিড়মিড় ক'রে নাথু ব'লে উঠল: এ রোগের ওষুধ আমার জানা নেই। শুয়োরটা আজ উল্টে আমাকেই যমের বাড়ি না পাঠিয়ে ছাড়বে না।

নাথু ভাবল, পেছন থেকে শুয়োরটার ঠ্যাং টেনে একবার ওকে উল্টে ফেলার চেষ্টা করে দেখলে হয়। বাঁ হাতে ছুরি উঁচিয়ে গুটি গুটি পা ফেলে নাথু ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল শুয়োরটা ততক্ষণে ডানদিকের দেয়ালের শেষ অবধি গিয়ে তারপর বাঁ-দিকের দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করেছে। ওর দিকে নাথুকে এগোতে

দেখে শুয়োরটা পালিয়েতো গেলই না, বরং নাথুর দিকেই মুখ করে এগোতে লাগল। শুয়োরটা হঠাৎ একবার এমন হুংকার ছাড়ল যে, মনে হল যেন সে এখুনি নাথুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। নাথু একপা একপা করে পিছু হটতে লাগল। এবার ওর থুতনির দিকে ঠায় তার চোখ। শুয়োরটা এখন নাথুর প্রায় মুখোমুখি এসে সোজা নাথুকে নিশানা করেই এগাচ্ছে। এ অবস্থায় ওর পেছনের ঠ্যাং ধরে ওকে চিৎ করে ফেলা একেবারেই অসম্ভব। শুয়োরটার ছোট ছোট চোখ ধবক ধবক ক'রে জ্বলছে। কী না জানি সে করে বসেছে। নাথুরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। কখন দুটো বেজে গেছে। সেই সন্ধ্যে থেকে এত চেষ্টাতেও যে কাজ সারা গেল না, ভোর হওয়ার আগে মাত্র এইটুকু সময়ের মধ্যে কী করে সে তা চুকিয়ে ফেলবে? জমাদারের ঠ্যালা গাড়ি এখন যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। কাজ হাসিল না হলে, মুরাদ আলীকে বিশ্বাস নেই, দোস্ত থেকে দুশমন হতে তার একটুও দেরি হবেনা। ছালচামড়া আর সে রেখে দেবে না। ঝুপড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে নাথুকে। তাকে লোক দিয়ে পেটাবে। উত্তম-ফুত্তম ক'রে মারবে। নাথুর হাত-পা ক্রমশ ফুলে উঠতে লাগল। ও মনে মনে জানত, যদি শুয়োরের পেছনের ঠ্যাং সে চেপে ধরে, তাহলে শুয়োরটা নাথুকে ছিঁড়ে খাবে, কিংবা লাফিয়ে হাতের বাইরে চলে যাবে।

হঠাৎ নাথু ক্ষেপে উঠল। ঠিক কী কারণে তার সারা শরীর জ্বলে উঠল সেটা স্পষ্ট নয়। 'আজ ওরই একদিন কী আমারই একদিন' বলে ঝট করে ফিরে এসে কুলুঙ্গির নিচে রাখা বড় শিলটা তুলে নিয়ে নাথু ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দুহাত দিয়ে মাথার ওপর শিলটা বাগিয়ে ধরে কিছুক্ষণ ঠায় সে দাঁড়িয়ে রইল। শুয়োরের থুতনি তখনও তার সামনের পায়ের ওপর রাখা। একটা খরমুজার খোসা শুঁকতে ও ব্যস্ত। ওর লাল চোখদুটো পিটপিট করছিল। পিঠের পেছনে ওর পুঁচকে ল্যাজটা সমানে হেলছিল দুলছিল। শুয়োরটা যদি নড়াচড়া না করে আর শিলটা যদি সিধে ওর গায়ে গিয়ে লাগে, তাহলে ওর কোথাও না কোথাও চোট পড়বেই, আর তাতে ওর অঙ্গহানি না হয়েই পারে না। আর যদি ওর একটা ঠ্যাংও ভাঙে, তাই বা মন্দ কী? আগের মত ও আর চলতে ফিরতে পারবে না।

এরপর নাথু শিলটা দুহাতে মাথা-সই তুলে শুয়োরটার দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারল। কুলুঙ্গিতে রাখা পিদিমের শিষ থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। আর দেয়ালে তার ছায়া নেচে উঠল। শিলটা শুয়োরের ঠিকই লেগেছিল। কিন্তু নাথু ঠিক বুঝতে পারেনি কোনখানে লেগেছে। শুয়োরটা জোরে ককিয়ে উঠেছিল। আর শিলটা খটাস করে গিয়ে মেঝের ওপর পড়েছিল। নাথু শিলটা ছুঁড়েই পিছিয়ে এসেছিল, তারপর শুয়োরটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে দেখেছিল। দেখে সে আশ্চর্য হল, শুয়োরটার আধবোঁজা চোখ পিটপিট করছে আর তার থুতনি তখনও সামনের পায়ে ঠেকে আছে। শুয়োরটা হঠাৎ ঘোঁতঘোঁত করে পেছনের দেয়াল থেকে সরে এসে ঘরের মাঝ বরাবর আসতে আরম্ভ করল। ডাইনে বাঁয়ে শুয়োরটা টাল খেয়ে পড়ছিল। নাথু একপাশে সরে গিয়ে উঠোনের দরজার দিকে যাওয়ার

রাস্তায় খাড়া হয়ে দাঁড়াল। শুয়োরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা কালো ঢিবি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। শিলটা ওর ব্রহ্মতালুতে লাগায় ওর বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ফলে. ও চোখে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিল না। নাথু ভয় পেয়ে গেল। শুয়োরটা নিশ্চয় তার দিকে এগিয়ে আসছে, এবার নিশ্চয় এসে তাকে ছিঁড়ে খাবে। দেখে মনে হচ্ছিল, শিলটা ওকে কাবু করতে পারেনি।

নাথু ঝট্‌ করে দরজা খুলে কুঠুরির বাইরে চলে গেল।

বাইরে এসে আপন মনে বিড় বিড় করে বলল, 'কী মুশকিলেই না পড়া গেছে।' তারপর উঠোনে পাঁচিলের কাছে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা হাওয়ায় এসে নাথু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘরের দমবন্ধ আবহাওয়ায় আর কটু গন্ধে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। তার ঘামে ভেজা শরীরে বাতাসের হালকা ছোঁয়া লেগে মনে অপরিসীম আনন্দের উদয় হল। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল সে যেন নবজন্ম লাভ করেছে। তার শিথিল মৃতপ্রায় ধড়ে সে যেন প্রাণ ফিরে পেল। 'এ-কাজ করে আমি পাবোটা কী। সলেতরি শুয়োর পেল কি না পেল তাতে আমার বয়ে গেল। কাল আমি মুরাদ আলীর সামনে তার পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে মাপ চাইব, বলব আমার সাধ্যে কুলোচ্ছে না, হুজুর। আমার দ্বারা এ-কাজ হবে না। বললে তাতে কী ক্ষতিটা হবে আমার? দুদিন মুখ হাঁড়ি করে থাকবে। পরে তার হাতেপায়ে ধরে সব মিটমাট করে নেব।

পাঁচিলের পেছনে নাথু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে মেঘভাঙ্গা চাঁদ। চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া জ্যোৎস্নায় আশপাশের সারা এলাকা তার কছে অচেনা আর রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। সামনে পড়ে থাকা গোরুর গাড়ির কাঁচা রাস্তা সেই সময় শুনশান। নিস্তব্ধ আর শান্ত। সারা দিনমান সেখানে শোনা যেত উত্তরের গ্রামাঞ্চল থেকে আসা গোরুর গাড়ির খটর খটর শব্দ আর গোরুর গলার ঘন্টার টুংটাং আওয়াজ। তার চাকায় রাস্তায় গভীর গাড্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। আর মাটি পেষাই হয়ে এমন রেণু রেণু হয়ে গিয়েছিল যে, তাতে পা পড়লে হাঁটু পর্যন্ত ডেবে যেত। রাস্তার ওপারের খাড়া ঢাল নিচের মাঠে গিয়ে পড়েছিল। সেখানে ছোট ছোট ঝোপঝাড়, কুলগাছ আর কাঁটাওয়ালা ফণিমনসার ঝাড়। —সবকিছুর গায়ে ধুলোর আস্তরণ। মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু জ্যোৎস্নায় নিকোনো। মাঠ পেরিয়ে যে ভাগাড়, তার পেছনে দুটো খুপরিতে এক ডোম থাকত। এই সময় খাপে খাপে সেঁটে গিয়ে মনে হচ্ছিল সেটা যেন খাঁ খাঁ করছে। কোনো খুপরিতেই আলোর চিহ্ন ছিল না। রাত্রে সেই ডোম মদ খেয়ে চেঁচাত আর নেশার ঘোরে বকবক করত। মাঠ পেরিয়ে এখানেও তার রেশ এসে পেঁছুত। কিন্তু সে এখন বোধহয় মড়ার মত পড়ে আছে। নাথুর হঠাৎ তার বউয়ের কথা মনে পড়ল। এই সময় সে হয়ত চামার-বস্তিতে আরামে শুয়ে আছে। এই ঝামেলায় না পড়লে নাথুও এই সময় তার পাশে থাকতে পারত। তার টলটলে তুলতুলে দেহটা নাথুর কোলের মধ্যে ধরা থাকত। নিজের যুবতী স্ত্রীকে বাহুডোরে পাবার দুরন্ত বাসনা তাকে নাড়িয়ে দিল। না জানি কতক্ষণ সে নাথুর আসাপথ চেয়ে বসে ছিল।

বউকে কিছুই না বলে কয়ে নাথু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। একটা সন্ধ্যে বউয়ের কাছছাড়া হয়ে নাথুও উতলা হয়ে পড়ল।

মেঠোপথ ডান হাতে কিছুটা এগিয়ে নিচে নেমে গেছে। এইসময় চাঁদের আলোয় রাস্তাটা ঝকঝক তকতক করছিল। তার পাড়ে একটু দূরে পাতকুয়ো, কপিকল আর দড়ি—সেও দেখতে মন্দ লাগছিল না। কিছুদূর যাবার পরই নির্জনতা কাটিয়ে সেই মেঠোপথ শহরমুখো পাকা সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে। চারদিক নৈঃশব্দ্যে ছেয়ে আছে। দূরে বাঁদিকে পিগারির নিচে যে বাড়িটা ছিল সেটা জ্যোৎস্না চাপা পড়ে কালো কৌটোর মতো দেখাচ্ছে। আদিগন্ত পড়ে-থাকা খালি জমিতে ইতস্তত কাঁটাঝোপ আর ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট গাছ। দূরে, অনেক দূরে ছিল মিলিটারি ছাউনির আলাদা আলাদা ব্যারাক। সেখানে পৌঁছুতে লেগে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নাথুর শরীরটা তখন অবশ হয়ে পড়েছে। তার ইচ্ছে হল, এখানে এই পাঁচিলের গায় মাথা ঠেকিয়ে সে একটু চোখ মটকে নেয়। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে তার মনে হচ্ছিল, এ যেন একটা আলাদা জগৎ। স্বচ্ছ শীতল হাওয়া, চারপাশে ছড়িয়ে থাকা চাঁদের আলো—এমন পরিবেশে নিজের এই অবস্থা দেখে তার কান্না পেয়ে গেল। বাইরে এসে নিজের হাতে ধরা ছুরিটা তার কাছে খুব বেমানান মনে হল। ওর ইচ্ছে করল সবকিছু ফেলে পালিয়ে যেতে। ঘরের মধ্যে একবারও সে আর উঁকি দিয়ে দেখতে চায় না। চায় পালাতে। শুয়োর চরানোর লোকটা নিশ্চয়ই কাল এখান দিয়ে যাবে। ময়লার ডাই দেখে ও ঠিক বুঝে ফেলবে শুয়োরটা ঘরের মধ্যে আছে। তখন শুয়োরটাকে হেঁকে-ডেকে ও ঠিক বার করে নিয়ে যাবে।

ফের নাথু তার বউয়ের চিন্তায় মুষড়ে পড়ল। সে যদি এখন নিজের বউয়ের কাছে গিয়ে ধীরে সস্নেহে কথা বলে, একমাত্র তাহলেই তার ক্ষুব্ধ ব্যাকুল মনে শান্তি ফিরে আসতে পারে। 'হায়, কখন যে সে এই ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে, কখন যে সে চামার-বস্তিতে তার বউয়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

হঠাৎ দূরে শেখের বাগানের ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজতেই নাথুর থরহরি কম্প উপস্থিত হল। নিজের হাতের দিকে তার নজর গেল। হাত দিয়ে ছুরিটা এখনও সে ধরে আছে। নাথু এক দারুণ আথান্তরে পড়ল—এবার কী হবে? এতক্ষণ সে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছে? শুয়োরটাতো এখনও মরেনি! জমাদার ঠ্যালা গাড়ি নিয়ে এসে পড়ল ব'লে। নাথু তাকে কী বলবে? কীই বা জবাবদিহি করবে! আকাশে হালকা হলুদের ছোপ লেগেছে। এক্ষুনি ভোরের আলো ফুটবে। এখনও সে তার কাজ হাসিল করতে পারেনি। নিজের অবস্থা-গতিকে তার কান্না পেয়ে গেল।

ঘাবড়ে গিয়ে সে কুঠুরির দিকে এগিয়ে গেল দরজাটা আস্তে ঠেলে ঘরের ভেতরে সে উঁকি দিল। দরজাটা ফাঁক করতেই একটা পচা দুর্গন্ধ ভক্ করে তার নাকে এসে লাগল। প্রদীপের আলোয় নাথু দেখল শুয়োরটা ঘরের ঠিক মাঝখানে

দাঁড়িয়ে। ঘুরে ঘুরে ও থকে গিয়েছে। ওর পা আর চলছে না। নাথুর মন বলল, শুয়োরটাকে এবার বোধহয় মেরে ফেলা তেমন কঠিন হবে না। নাথু আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কুলুঙ্গির নিচে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একদৃষ্টে শুয়োরটাকে দেখতে লাগল।

নাথু ভেতরে ঢুকতেই শুয়োরটা নাক উঁচু করল। নাথুর মনে হল যেন ওর মুখ একটু বেশী রকম লাল দেখাচ্ছে আর ওর চোখদুটো কুঁচকে গেছে। শুয়োরটার দিকে ছোঁড়া শিলটা ওর পেছনে কিছুটা দূরে পড়ে রয়েছে। পিদিমের টিমটিমে শিষ আবার চমকে উঠল। আর সেই অস্থির আলোয় নাথুর মনে হল, শুয়োরটা যেন একটু নড়ল। তারপর যেন চলতে আরম্ভ করল। চোখ বড় বড় করে নাথু দেখতে লাগল। শুয়োরটা সত্যিই নড়েছিল। সত্যিই ওর ভারী থুম্বো শরীরটা স্থির গতিতে নাথুর দিকে এগিয়ে আসছে। দু-এক পা কোনোমতে ডাইনে বাঁয়ে টলে টলে চলার পর ওর মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। নাথুও তার ছুরিটা উঁচিয়ে ধরে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। শুয়োরটা আরো দুতিন পা সামনে এগিয়ে এল। ওর মুখটা নিজের পায়ের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ল। আর নাথুর কাছ অবধি পেঁছুবার আগেই কাত হয়ে পড়ে গেল। পড়বার পর ওর ঠ্যাঙে একবার একটা জোর খিঁচুনি ধরতে দেখা গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর পা দুটো শূন্যে উঠে স্থির হয়ে রইল। শুয়োরটা ততক্ষণে মরে গেছে। নাথু তার ছুরিটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। তবু তার চোখের নজর কিন্তু তখনও শুয়োরের দিকে। ঠিক তখন দূরে কোনো প্রতিবেশীর ঘরের মোরগ পাখা ঝটপটিয়ে ডেকে উঠল। সেইসময় দূরে মেঠো রাস্তায় ঠ্যালা গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা গেল। নাথু তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দুই

প্রভাতফেরী আরম্ভ হওয়ার সময় শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এসে জুটত। কিছুক্ষণ পরে প্রভাতফেরী অলিগলি আর হাটবাজারের ভেতর দিয়ে এগোলে. রাস্তার ধারের বাসিন্দারা ভুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে, হাই তুলতে তুলতে এসে তাতে যোগ দিত।

হাওয়ায় তখনও রুখুশুখু ভাব। রাত্তিরে ঘরের ভেতর শুলেও শেষরাতে গায়ে কম্বল দিতে হত। বেশী বয়সের যারা প্রভাতফেরীতে এসে জুটত, তাদের মাথায় থাকত কানঢাকা টুপি।

শেখেদের বাগানের ঘড়িতে চারটে বাজল। কংগ্রেস কমিটির দপ্তরের সামনের রাস্তায় মোটে জন দুইতিন লোক অন্য সদস্যেরা এক্ষুণি এসে পড়বে বলে অপেক্ষা করছিল। গোয়েন্দা পুলিশের দুজন সেপাই সাদা-পোশাকে একটু দূরে তখন থেকেই এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সেই সময় দূরের অন্ধকারে একটা আলো নজরে পড়ল। একজন লোক হাতে হারিকেন নিয়ে বড়বাজারের মোড় ঘুরে এদিকে আসছে। হারিকেনের আলোয় লোকটার কেবল পা-জামা দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধড় বাদ দিয়ে কেবল দুটো ঠ্যাং এগিয়ে আসছে।

দূর থেকে পাজামাটা চিনতে পেরে আজীজ ব'লে উঠল, 'যাক, বক্সীজী এসে গেছেন।'

বক্সীজী সবাইকে বলতেন, চারটে মানে চারটে, তার আগেও নয়, পরেও নয়। সেই তিনি কিনা আজ লেট।

জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী বক্সীজী। বয়েস হয়েছে। শ্লেষ্মার রুগী। শরীর কাহিল হলেও ওকে আসতেই হবে। উনি না এলে বাকিরা সবাই ডুব মারবে। প্রভাতফেরী বার করার লোকই পাওয়া যাবে না।

বক্সীজী কাছাকাছি আসতেই আজীজ ছুটে আসতে আসতে গান ধরল ঃ

'মুল্লা মিঞা মিশালচী, তিনোঁ এক সমান।
লোগোঁ নুঁ দস্সন চাননা, আপ হনো জান।'
('মোল্লা মিঞা মশালচী—তিনে নেই ফারাক।
নিজেরা সব অন্ধকাণা, পরকে বলে, 'দ্যাখ।')

বক্সীজী কাছাকাছি পৌঁছে নিজের সাফাই গেয়ে বললেন ঃ 'রাত্তিরে শুতে দেরি হয়েছিল। তাই সকালে ঘুম ভাঙেনি,' সবাইকে সেলাম-আদাব করার পর ছুটতে ছুটতে বললেন :

'রামদাস মাস্টার আসেনি ?'

আজীজ তার জবাবে বলল।

'ওর গাই দোয়া হোক, তারপর তো আসবে।'

'যখন মাইনে বাড়ানোর গরজ ছিল, তখন তো বললে রাত এগারোটাতেও আসত। এখন মাইনে বেড়ে গেছে, আর সময়মত আসবার কী দায় ?'

দূরে অন্ধকারের ভেতর নয়া-মহল্লার ওদিক থেকে এক দীর্ঘাকৃতি লোক আপাদমস্তক সাদা পোশাক চড়িয়ে ঢাল পেরিয়ে আসছেন দেখা গেল।

'এই যে, এসে গেছেন সত্যের মহাজন। মেহতাজী তোমাকে সত্যিই লীডার লীডার দেখাচ্ছে।'

মেহতাজী এসেই অন্য সকলের খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। অজিত সিং এসে পৌঁছেছে কিনা, দেশরাজ, শংকর, রামদাস মাস্টার—এরা সব কোথায় ? তারপর বক্সীজীর দিকে ফিরে বললেন :

'আমি আগেই বলেছিলাম চারটেতে প্রভাতফেরী ডাকা ঠিক নয়।' বক্সীজী জবাব দিলেনঃ 'চারটের সময় দিলে, তবেই পাঁচটা নাগাদ প্রভাতফেরী বেরোতে পারে। আর যদি পাঁচটা বলো তাহলে রোদ উঠে গেলেও সবাইকে একত্র করতে পারবে না। নিজেই এল দেরি করে। এখন এসে বলছে অমুক সময়ে ডাকা উচিত নয়, তমুক সময়ে ডাকা উচিত নয়' বলতে বলতে বক্সীজী চাদরের নিচে ফতুয়ার পকেটে

হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করে আনলেন। আজীজ আবার ফোড়ন কেটে মেহতাজীকে বলল :

'মেহতাজী, দূর থেকে সত্যি আপনাকে লীডার লীডার লাগছে।'

মেহতাজী গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে মৃদু হেসে আজীজের কাঁধে আলতোভাবে হাত রেখে বললেন :

'সেদিন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। শুনলাম একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে, 'ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন উনি জওহরলাল নেহেরু নাকি ?' বলে মেহতাজী দুহাতে নিজের গান্ধী টুপিটা একটু একটু দাবিয়ে হেলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'অনেক লোকেই এই ভুলটা করে।'

আপনিই বা কিসে কম, মেহতাজী ? আপনার নিজের একটা ব্যক্তিত্ব আছে।

মেহতাজী রোয়াব ক'রে বললেন, 'আমি ওঁর চেয়ে মাথায় কিছুটা লম্বা।'

কাশ্মীরীলাল বলল, 'চান-টান সেরে বেরিয়েছেন তো, মেহতাজী ?'

'বেশ বললে ! এ একটা প্রশ্ন হল ? আমি বরাবরই স্নান ক'রে বেরোই, কী শীত কী গ্রীষ্ম। আর প্রভাতফেরীতে তো, কাশ্মীরীলাল, স্নান না করে কারো আসাই উচিত না। এখানে তুই এসেছিস তোর নিজের কথাই বল্। তুই দাঁত মেজে বেরিয়েছিস, না কি না-মেজে ?

এই সময় দূরের ঢাল থেকে ফের আওয়াজ ভেসে এল।

'ঘাস...বিচালি...ঘাস। ঘাস...বিচালি—'

'নাও জার্নাইলও এসে গেল।' বক্সীজীর এ-কথায় সবাই হেসে উঠল।

বাতির আলো সবার আগে ওর ছেঁড়া জুতোর ওপর পড়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল না ওটা ওর চটি ছিল, না জুতো ছিল। জুতোর ইঞ্চি ছয়েক ওপর ওর খাঁকি পাতলুনের পা। তার ওপর খাঁকি কোট। তাতে জার্নাইল যত পেরেছে গান্ধী আর নেহেরুর ব্যাজ গুঁজেছে। তার পাকানো বুড়ো শরীরে দোমড়ানো কোঁচকানো খাঁকি কোট লটকে আছে। তার ওপর খসখসে খোঁচা দাড়ি। আর সব কিছু ছাড়িয়ে মুগা রঙের পাগড়ি।

জার্নাইল এমনই একজন মানুষ,আন্দোলন হোক না হোক যে জেলে যেত, মিটিং থাক না থাম শহরময় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। আর প্রায় দিনই কোথাও না কোথাও পরের হাতে বেচারাকে মার খেতে হত। একটা ছোট বেত বগলদাবা ক'রে সবসময় এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। ঢ্যাড়া-পেটানো কোনো টাঙ্গা বের হলে সেই টাঙ্গায় যদি তিনজন সওয়ার থাকে, তাহলে তার একজন জার্নাইল না হয়ে যায় না। জলসা শুরু হলে গোড়াতেই জার্নাইল বক্তৃতা দিত, ওর ফাঁপা, ধরা গলা সামনের সারি পেরিয়ে অন্যদের কান পর্যন্ত পৌঁছুত না।

জার্নাইল আসতেই কাশ্মীরীলাল ফোড়ন কাটল :

'ওহে জার্নাইল, কাল মিটিং থেকে কেটে পড়েছিলে কেন ?'

গলা চিনে, ঘাড় ঘুরিয়ে জার্নাইল তার ছোট ছোট চোখ দিয়ে কাশ্মীরীলালকে দেখে বগলের মধ্যে বেতটা চেপে ধরতে ধরতে বলল :

'এই সাত-সকালে আমি তোমার মতন লোকের কাছে মুখ খুলতে চাই না। দূরে আছো, দূরেই থাকো।'

বক্সীজী কাশ্মীরীলালকে থামালেন :

'এটা কি ছ্যাবলামো করার সময়? ব্যস্, তুমি চুপ ক'রে যাও।'

জার্নাইল চটে গিয়েছিল।

'আমি তোমার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম।

আমি সব জানি। ঘাড় কুঁজো ময়রার দোকানে তোমাকে আমি ছানার মুড়কি খেতে দেখেছি।'

বক্সীজী তাকে বাপধন বাছাধন ক'রে বললেন, 'থাক থাক জার্নাইল, ঢের হয়েছে। আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে কাজ নেই।'

এমন সময় ঢোল্লা ঘেরের পা-জামা ফরফর করতে করতে শংকরলাল এসে হাজির হল।

অন্ধকার চলে গিয়ে রাত ক্রমশ ফরসা হয়ে আসছে। ডানহাতে ব্যাংকের উঁচু দেয়াল থেকে অন্ধকারের যেন একটা পরত খসে পড়ল। রাস্তার ওপারে আর্য বিদ্যালয়ের বাড়িটাতে মিষ্টির দোকানের উনুন থেকে তখন গলগল ক'রে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে। পাশের গলি থেকে ভোরের ভ্রমণবিলাসীরা মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিতে দিতে, ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। কোথাও কোথাও কোনো কোনো মহিলাকে মাথা আর মুখ দোপাট্টায় ঢেকে গুরুদ্বারের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে।

বক্সীজী হাতের লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন।

ঢোলসহরতকারী শংকর বলল, 'কী? আমি আসতে না আসতেই বক্সীজী বুঝি আলো নিভিয়ে ফেললেন?'

বক্সীজী বললেন, 'কী রে, তুই আমার চেহারা দেখবি, না মেহতাজীর?' তেল পুড়ে যাচ্ছে। এ তো আর, বাপু, কংগ্রেস কমিটির আলো নয়। এ আমার নিজের লণ্ঠন। কংগ্রেস কমিটি থেকে তেলের বরাদ্দ এনে দাও তাহলে দিনরাত জ্বালিয়ে রেখে দেব।'

এই শুনে কাশ্মীরীলালের পেছনে দাঁড়ানো শংকর মিচ্‌মিচ্ করে বলল, 'সিগারেটের জন্যে যদি আপনার বরাদ্দের দরকার না পড়ে, তাহলে কেরোসিন তেলের জন্যেই বা পড়বে কেন?'

কথাটা কানে বিষ ঢেলে দিলেও বক্সীজীকে বিনা বাক্যব্যয়ে হজম করে যেতে হল। এসব লোকের কথার পিঠে কথা বলতে গেলে পরিণামে নিজেরই অপমান ডেকে আনা হবে।

'আপনিই তো মালিক, বক্সীজী। আপনাকে কে আর বরাদ্দ করবে? আপনি না বললে একটা চিড়িয়াও ডানা ঝাপটাতে পারে না।' এই ব'লে শংকর মেহতাজীর দিকে ফিরে বলল, 'জয়হিন্দ, মেহতাজী!'

'জয়হিন্দ !'

'আমি আপনাকে দেখতেই পাইনি।'

'তুমি আর আমাকে দেখবে কেমন ক'রে, শঙ্কর। তোমারই তো এখন পোয়া বারো।'

'আজ আপনি আপনার ফোলিও ব্যাগ আনেন নি ?'

প্রভাতফেরীতে আবার ব্যাগ কী হবে ?

'তা কেন ! হর জায়গাতেই তো ব্যাগের দরকার পড়তে পারে। বীমার দালালের তো যে কোনো জয়গাতেই মক্কেল জুটে যেতে পারে !'

মেহতাজী চুপ ক'রে রইলেন। কংগ্রেসের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে উনি বীমার দালালিও করে থাকেন।

বক্সীজী বললেন, 'শঙ্কর, এবার ক্ষ্যামা দে। তোর তিন গুণ বয়েস মেহতাজীর। বড়দের সম্মান রেখে কথা বলতে হয়।'

'বারে কী বলেছি আমি ? আমি তো সেফ জিজ্ঞেস করেছি ব্যাগ এনেছেন কিনা। আমি তো একথা জিজ্ঞেস করিনি যে, শেঠজীর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমার কাজটা পেলেন কিনা ?'

যে কথা শংকরের মুখ দিয়ে একবার বেরিয়ে গেছে, তা কি আর ফেরানো যায় ? অবশ্য সচরাচর শংকর এমন ভঙ্গিতে কথা বলে না। সে খুব ঠোঁটকাটা লোক। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে। তার ওপর পঞ্চাশ হাজারের প্রসঙ্গটা তুলে শঙ্কর মোক্ষম ঘা দিয়েছে। শুনে মেহতাজী এমন থ' হয়ে গিয়েছিলেন যে মুখ দিয়ে কথা সরেনি। মেহতাজী যেমন-তেমন লোক নন। সাকুল্যে ষোল বছর জেলে কাটিয়ে এসে জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনি এখন প্রধান। তাঁর গায়ে থাকে সবচেয়ে ধবধবে খদ্দর। ওঁকে এইভাবে ঠেস দিয়ে কথা বলাটা বেকুবের কাজ হয়েছে। তবে অনেকদিন থেকে একটা কানাঘুঁষো চলছিল—ঠিকাদার শেঠীর কাছ থেকে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বীমার কেস পাওয়ার কথা। আর তার বিনিময়ে মেহতাজী শেঠীকে ইলেকশানে কংগ্রেসের টিকিট পাইয়ে দেবেন।

'খ্যাঁক খ্যাঁক করা ওর স্বভাব, মেহতাজী। ওর কথা—ব্যস, এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বার করে দিন।'

'আমি তো এ বলিনি যে, মেহতাজী কথা দিয়েছেন টিকিট দেবেন। টিকিট দেওয়ার ক্ষমতা তো প্রদেশ কমিটির। জেলা কমিটি সুপারিশ করবে। ভেতরে ভেতরে যদি প্রধান আর সচিব বোঝাপড়া করে নেন তো আলাদা কথা। তবে সে আমি হতে দেব না। প্রধান আর সচিব দুজনেই এখানে আছেন, শুনে নিন। বড় বড় ঠিকাদাররা যদি টিকিট পায় তো বুঝবেন কংগ্রেস শিঙে ফুঁকেছে।'

মেহতাজী ওখান থেকে পিছিয়ে গিয়ে কাশ্মীরীলালের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বক্সীজী আরও একটা সিগারেট ধরালেন।

শংকর আর মেহতাজীতে বস্তুতপক্ষে বনিবনা হত না। বনিবনা না হওয়ার কারণ ছিল। লাহোরে একবার সম্মেলন হয়েছিল। তাতে নেহেরুজী যোগ

দিয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে জেলা কমিটি থেকে কিছু প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল মেহতাজী প্রতিনিধিদের সেই তালিকায় শংকরের নাম দেননি। শংকর এ সত্ত্বেও লাহোরে গিয়ে পেঁছেছিল, সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সম্মেলন উপলক্ষে বিশাল আকারের এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল। তাতে নেহেরুজীও উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক প্রতিনিধির কাছ থেকে এই ভোজসভার জন্যে আট আনা করে নেওয়া হয়েছিল। মেহতাজী তাঁর জেলার প্রতিনিধিদের চাঁদা কংগ্রেসের তহবিল থেকে দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রেও শংকরের চাঁদা তা থেকে দিতে উনি রাজি হননি। শংকর বেজায় ক্ষেপে গিয়েছিল। মেহতাজী তাকে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও ভোজসভায় সে হাজির হয়েছিল। আর ঠিক মেহতাজীর সামনের সারিতে ব'সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত নাকে মুখে খাবার গুঁজেছিল। হাতময় আর মুখময় এঁটো নিয়ে ডালতরকারির পরিবেশনকারীদের ওপর সে চোটপাট করেছিল। মেহতাজী শেষে থাকতে পারেন নি :

'খেতেই যখন বসেছিস, শংকর—তো মানুষের মতো করে খা। আমাদের জেলা কংগ্রেসের তুই নাম ডুবিয়ে দিচ্ছিস।'

'এখন একদম ট্যাঁ ফোঁ করবেন না, মেহতাজী। এ আমি কংগ্রেসের পয়সায় খাচ্ছি না। নিজের গাঁটের পয়সায় খাচ্ছি। নগদ পয়সায়। ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা হবে। আপনার মতো ঢের ঢের লোক আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছিস রে? সারাক্ষণ যে কেবল ফ্যাচফ্যাচ করছিস। ফিরে গিয়ে তুই আমার কী করবি?'

লাহোর থেকে ফিরে শংকর মেহতাজীর সঙ্গে আড়ে-হাতে লেগেছিল। প্রদেশ কংগ্রেসের আসন্ন নির্বাচনে প্রত্যেক জেলা কমিটি থেকে চারজন করে সদস্য পাঠানোর কথা ছিল। মেহতাজী অন্য তিনজন সদস্যের সঙ্গে চতুর্থ সদস্য হিসেবে কোহলীর নামও জুড়ে দিয়েছিলেন। শংকর বাগড়া না দিলে কোহলী জেলা কমিটি থেকে নির্ঘাত নির্বাচিত হয়ে যেত। স্ক্রুটিনী কমিটির যখন সভা চলছিল তখন শংকর উঠে দাঁড়াল।

'মাপ করবেন, আমি একটা সওয়াল তুলতে চাই।'

মেহতাজীর মাথায় রক্ত উঠে গেল।

'এটা স্ক্রুটিনি কমিটির মিটিং। কারো কিছু জানার থাকলে পরে আমার কাছ থেকে জেনে নিও।'

'আপনাকে নয়, আমি প্রশ্ন করছি স্ক্রুটিনি কমিটিকে।' বলে এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে রইল যে তার ফলে স্ক্রুটিনি কমিটির প্রধান তার সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হলেন।

প্রধান জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলতে চাও?'

'আমি জানতে চাই কংগ্রেস সদস্য হওয়ার কী নিয়ম?'

মেহতাজী ব'লে উঠলেন, 'ফালতু কথা বলার এটা জায়গা নয়। কাজের কথা বলো।'

'দেখুন মেহতাজী, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না। আপনি চুপ করে থাকুন।'

'আহা, বলতে দাও। বলতে দাও। হ্যাঁ, বলো ভাই শংকর, তোমার কী বলার আছে, বলো। কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার নিয়ম ?'

'নিয়ম বলতে, বছরে চার আনা চাঁদা দেওয়া, হাতে-কাটা আর হাতে-বোনা খাদিবস্ত্র পরা, চরকা কাটা। ঠিক আছে ?'

'ঠিক আছে।'

'আমি কোহলী সাহেবকে অনুরোধ করব, উনি যেন শুধু এক মিনিটের জন্যে উঠে দাঁড়ান।' সভাসুদ্ধ লোক সব চুপ।

'গোস্তাকি মাপ করবেন। এখানে সব সদস্যেরই স্ক্রুটিনি কমিটির কাছে প্রশ্ন করবার অধিকার আছে।'

মেহতাজী গাঁইগুঁই করতে লাগলেন।

'মেহতা সাহেব, আপনি এই কমিটির প্রধান নন। আপনার কুটকচালিতে কোনো কাজ হবে না। হ্যাঁ, বলছিলাম—কোহলী সাহেব, আপনি একটু উঠে দাঁড়ান।'

কোহলী উঠলেন।

'আপনি খদ্দর পরেন তো ?'

'কী নাটক শুরু করলে ? তার চেয়ে সোজাসুজি বলোই না কী জানতে চাও !'

'আপনার কশি দেখান। মানে, ইজেরের কশি।'

'কেন ? তোমার মতলবটা কী ?'

'একজন সদস্যকে অপমান করা হচ্ছে। এসব কী মস্করা ?'

'মস্করা নয়, মেহতা সাহেব। আপনি চুপ ক'রে থাকুন। কমিটির প্রধানের অনুমতি ছাড়া আপনি কথা বলতে পারেন না। কী কোহলি সাহেব, আমি বললাম না কশিটা দেখাতে ? ইজেরের কশি ?'

'যদি না দেখাই—'

'আপনাকে দেখাতেই হবে। ওটা দেখালে তবেই যা আমি প্রমাণ করতে চাইছি তা প্রমাণ হবে।'

'দেখিয়েই দাও, ভাই। নইলে ঐ খেঁকী লোকটা সব কাজ পণ্ড ক'রে দেবে। যত সব লোফার এসে কংগ্রেসে ঢুকেছে।'

'কী বললেন, মেহতাজী ? আমি লোফার হলে আপনি তো একটা পাষণ্ড। আমাকে বেশি ঘাঁটাবেন না। সাদা কী, কালো কী—সব আমার জানা আছে। তারপর, কোহলী সাহেব !'

'তুমি কি চাও আমি সবার সামনে ইজেরের কশি খুলে ফেলি ?'

'খুলতে তো বলছি না। দেখাতে বলছি।'

'দেখিয়ে দাও না, ভাই। ল্যাঠা চুকে যাক।'

কোহলী তখন নিরুপায় হয়ে আচকানটা উঠিয়ে নিচে খদ্দরের জামার তলায়

দেখে হুজেরটা দেখালেন। শঙ্কর এক লাফে সামনে গিয়ে কাশটা ধ'রে ফেলল।

'ভদ্দরলোকেরা, সব দেখে নিন। এই কাঁশ হাতে-কাটা খাদিতে বোনা নয়। দামী রেশমী সুতোয় কলে বোনা। আপনারা সবাই ছুঁয়ে পরখ ক'রে দেখতে পারেন।'

'তো তাতে হয়েছে কী?'

'কংগ্রেস সদস্য হয়ে রেশমী কাশ ব্যবহার করবে? আর তাকেই কিনা আপনারা প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য করে পাঠাচ্ছেন? কংগ্রেসের নিয়মনীতি কি সব চুলোয় গেছে?'

স্ক্রুটিনি কমিটির মেম্বাররা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা কোহলীর নাম না কেটে পারল না। সেইদিন থেকেই শংকরের সঙ্গে হল মেহতাজীর দা-কুমড়ো সম্পর্ক।

বক্সীজীর ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। না রামদাস মাস্টার, না দেশরাজ —কারো টিকির দেখা নেই। গান গাইবে কে? প্রভাতফেরীতে অন্তত একজন গান গাইবার লোক তো চাই। কেউ না এলে তখন হয়ত নিজেকেই গান ধরতে হবে। কিন্তু জেলা কমিটির মাইনে-করা লোকেরাই বা কেন সময়মত আসবে না?

'দেখবেন, মেহতাজী! আমরা ঠিক সময়েই প্রভাতফেরী বার করব। আর তিনটে গলি পেরোলেই দেখবেন রামদাস মাস্টার হন্তদন্ত হয়ে আসছে। এসে বলবে, বাছুরটা দুধ খেয়ে ফেলেছিল, আমার কী দোষ? এই রকমই ওদের কাজ কারবার।' এরপর অন্য সদস্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'কাশ্মীরীলাল, আর নয়। এবার শুরু করে দাও।'

কাশ্মীরীলাল খুব মজা পেত লোকের পেছনে লাগতে। ফট্ ক'রে জার্নাইলের দিকে ফিরে সে ব'লে উঠল:

'জার্নাইল, এবার শুরু করে দাও তোমার বোলচাল। প্রভাতফেরী বার হবার আগেই যেন শেষ হয়।'

এই ইন্ধনটুকুর জন্যেই জার্নাইল অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বেত দোলাতে দোলাতে ঘাস-বিচালি-ঘাস করতে করতে রাস্তার ধারের একটা পাথরের ওপর ঠেলে উঠল।

'কী, হচ্ছেটা কী, কাশ্মিরীলাল? সব কিছুরই একটা সময় অসময় আছে।' বক্সীজী তেতে উঠে বললেন, 'প্রভাতফেরী হোক তোমরা চাও না। তা সেটা সাফ সাফ ব'লে দিলেই তো পারো।' বলে তিনি জার্নাইলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে জার্নাইল বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে—

'ভদ্রমহোদয়েরা...'

'ভদ্রমহোদয়-ফহোদয় কেউ কোথাও নেই।' বক্সীজী হাত উঁচিয়ে বললেন, 'কেউ টেনে নামিয়ে আনো তো ওকে। ভোরবেলায় এ কী তামাসা শুরু করেছে!'

'কেউ আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।' পাথরের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে জার্নাইল বলতে শুরু ক'রে দিল:

'ভদ্রমহোদয়েরা…'

তার সেই খ্যাসখেসে গলায় জার্নাইল বলে চলল।

জার্নাইলের বয়েস পঞ্চাশের কিছু বেশিই হবে। কিন্তু দীর্ঘকাল জেলে থেকে শরীরটা দড়ি পাকিয়ে গেছে। শহরের অন্য কংগ্রেসীরা যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হত, সেখানে ওর কপালে জুটত সি-ক্লাস। ফলে, সমানে অসুখে পড়ত আর খোরাক হিসেবে পেত বালিভর্তি রুটি। জোয়ান বয়েসে লাহোর-কংগ্রেসের সময় শহর থেকে ভলান্টিয়ার হয়ে সে লাহোরে গিয়েছিল। যেদিন পূর্ণ স্বরাজের দাবি তোলা হয়, নেহরুজীর সঙ্গে ইরাবতীর ধারে সেদিন ধেই ধেই করে কী নাচাই না সে নেচেছিল। সেই যে সেদিন ভলান্টিয়ারের উর্দি চড়িয়েছিল, সেই মার্কামারা পোশাক আজও তার রয়ে গেছে। যখন তার দিন ভালো যায়, তখন ঐ পোশাকেই লাগিয়ে নেয় কখনও একটা হুইসেল, কখনও বা একটা তেরঙ্গা ব্যাজ। সময় যখন খারাপ যায়, তখন তার পোশাক ধোয়াও হয় না। জার্নাইলের এমনই কপাল যে ওর কোথাও কোনো কাজ জোটে নি। পরে আর কাজের কোনো চেষ্টাও করে নি। তখন থেকেই পনেরো টাকা মাসোহারায় সে কংগ্রেসের প্রচারের ধ্বজা বয়ে চলেছে। বক্সীজী যখনই তাকে চুপ করিয়ে দিতে চান, তখনই সে ভাষণ দিতে শুরু করে। জার্নাইলের মনে ছিল দুরন্ত জেদ, তারই জোরে জীবনের সমস্ত দুঃখ ক্লেশ হাসিমুখে সে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে। না-ঘরকা, না-ঘাটকা। না বউ, না বাচ্চা। না কাজ, না অকাজ। সপ্তাহে দু-তিনবার কোথাও না কোথাও থেকে সে মার খেয়ে ফিরত। পুলিশের লাঠির সামনে যখন সবাই 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচার নীতিতে পালাত, সেখানে জার্নাইল ডেঁটে থেকে তার ছোট্ট বুক চিতিয়ে শেষকালে নিজের হাড়গোড় ভেঙে ফিরত।

এবার মেহতাজী চিৎকার করে বললেন, 'কাশ্মীরীলাল, ওকে টেনে নামাওতো। সাত-সকালে তামাশা দেখাতে শুরু করেছে।' কিন্তু জার্নাইল তেমনি গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ভদ্রমহোদয়েরা দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে জেলা কংগ্রেসের প্রধান দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ইরাবতীর তীরে একদিন যে শপথ নিয়েছিলাম, আমৃত্যু আমরা তা রক্ষা করব। আমি আপনাদের বেশি সময় নেব না, শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আজও মায়ের পেটে এমন কেউ জন্মায়নি যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। মেহতাজী কি ভুঁইফোড় ক্ষেতের মূলো? ওঁর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা ওঁকেও যেমন দেখে নেব, তেমনি ওঁর পোঁ-ধরা—কাশ্মীরীলাল, শঙ্করলাল, জীৎ সিং—এইসব বেইমানদেরও এক হাত নেব…'

জোর হাসি শুরু হয়ে গেল।

এর নাটের গুরু ছিল যে কাশ্মীরীলাল, স্বয়ং সেই আবার বক্সীজীর কানে মন্ত্র দিচ্ছিল: 'উঁহু, ওভাবে ওকে নামানো যাবে না। সে চেষ্টা যদি করেন তো ওর

রোখ আরো বেড়ে যাবে।' বক্সীজী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাশ্মীরীলালের দিকে তাকালেন।

'আপনি ভাববেন না। হাততালি দিলেই ও নেমে আসবে। দু'তিনবার হাততালি দিলেই আপনাআপনি ওর বক্তৃতা থেমে যাবে।'—এই বলে কাশ্মীরীলাল হাততালি দিল; বাকি লোকেরাও হাততালি দিতে লাগল।

'বাঃ, বা-ভাই, জোর বলেছ।'

'ভদ্রমহোদয়েরা. আমি আপনাদের বেশি সময় নেব না। আপনারা যে ধৈর্য আর উৎসাহের সঙ্গে আমাদের কাটা-ছেঁড়া ভাষায় বক্তব্য শুনলেন, তার জন্যে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্থান স্বাধীন হবে। কংগ্রেস নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য চরিতার্থ করবে। ইরাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে আমি যে শপথ···'। 'চমৎকার! চমৎকার!' কাশ্মীরী-লাল আবার জোরসে হাততালি দিল।

'ভদ্রমহোদয়েরা, আমার ধন্যবাদ জানবেন। আবার একদিন আপনাদের সামনে এসে হাজির হব। এবার আপনারা আমার গলায় গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলুন··· ইনক্লাব।'

দুচারজনের গলায় শোনা গেল।

'জিন্দাবাদ।'

'কী হল? ভাত খাও না? জোরসে আওয়াজ দাও—ইনক্লাব।'

চিৎকার করে আওয়াজ উঠল:

'জিন্দাবাদ'।

তখন জার্নাইল বেত বগলদাবা ক'রে পাথরের চাঁইয়ের ওপর থেকে নেমে এল।

'জিন্দাবাদ'! একটা আওয়াজ ঢালের দিক থেকেও ভেসে এল। সেইসঙ্গে রামদাস মাস্টার হাঁপাতে হাঁপাতে সকালের আলো-আঁধারিতে উদয় হল।

বক্সীজী রেগে মেগে বললেন, 'এতক্ষণে আসার সময় হল?'

জবাবটা দিল কাশ্মীরলাল:

'বাছুরটা দুধ খেয়ে ফেলেছিল। তাই দেরি হয়ে গেল······।'

সবাই হাসতে লাগল। রামদাস মাস্টার গম্ভীর গলায় বলল:

'আজ প্রভাতফেরী হবে না।'

'কেন?'

'আজ জনসেবার কাজ হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

'জনসেবার কাজ! কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে?'

'কাল রাত্তিরে গোঁসাইজী আমাকে বলেছিলেন যে, আজ ইমামদীনের পাড়ায় পেছনের দিকের গলি সাফ করা হবে।'

'দেরি করে এসে এখন নানা বাহানা দেখাচ্ছ।'

'কেন? আমি তো ঝাড়ু-কোদালও সেখানে পোঁছে দিয়ে এসেছি। কিছু দিয়ে

এসেছি কাল রাত্তিরে, কিছু আজ সকালে'। তারপর নিজেই গুনে গুনে বলতে লাগল, 'পাঁচটা কোদাল, বারোটা ঝাঁটা, তিনটে গাঁইতি আর পাঁচটা কড়াই কাল রাত্তিরেই আমি পেঁছে দিয়ে এসেছি। শেরখাঁর বাড়িতে সব মাল রাখা আছে।'

'আমাদের তো কেউ কিছু বলেনি!'

'সেইজন্যেই তো আমি ছুটে এলাম। যখন গোড়ায় আমি এখানে এসেছিলাম তখন কেউ ছিল না।'

'পেছনের নর্দমা পরিষ্কার হবে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' কাশ্মীরীলাল প্রশ্ন করল। 'ওখানে তো কোনো নর্দমাই নেই?'

'আছে, আছে। থাকবে না কেন? কাঁচা-নালা আছে। বাঁধানো নয়'।

'কাঁচা-নালা যদি হয়, তাহলে তাতে যে কত বছরের পাঁক জমা হয়ে আছে কে জানে! কে ওই নালা সাফ করবে?'

কাশ্মীরীলাল ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'আমি করব। যতসব বেইমানের দল।'

'একেক সময়ে একেক রকমের সিদ্ধান্ত। গোঁসাইজী যদি সিদ্ধান্তই করে থাকেন তো আমাদের বললেন না কেন?'

অন্ধকার কেটে যাচ্ছিল। প্রভাতফেরীর জন্যে জড়ো হওয়া লোকজন উসখুস করতে লাগল।

'চলো, এখান থেকে তো বেরোই'—এই ব'লে বিক্লীজী তাঁর হাতের নেভানো লণ্ঠনটা তুলে সামনে এলেন। 'এখান থেকে আমরা গান গাইতে গাইতে যাব। কই শুরু করো, রামদাস।'

জার্নাইল 'ঘাস-বিচালি-ঘাস' করতে করতে আগে আগে চলতে লাগল। কাশ্মীরী-লাল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা তুলে নিল। যে গানটা দিয়ে বরাবর প্রভাতফেরী শুরু করা হয়, অথচ যে গানটা কখনই ঠিক জমে না—সেই পুরনো গানটা রামদাস মাস্টার তার বেসুরো গলায় তারস্বরে গাইতে শুরু করে দিল।

জরা বী লগন আজাদী দী
লাগ গয়ী জিন্হাঁ দে মান দে বিচ।'

(স্বাধীনতার এতটুকু প্রেমেও যার মন মজেছে...)

পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দলের সবাই ধুয়ো ধরল। এরপর রামদাস আরো দুটি ছত্র গেয়ে উঠল,

'ওহ্ মজনুঁ বণ ফিরদে নে
হর সেহরা হর বণ দে বিচ।'
(মজনুর মত ঘুরে সে বেড়ায়
বনে রাস্তায় মরু সাহারায়।)

প্রভাতফেরীর দল কুতুবদীনের গলিতে ঢুকে দাঁড়াল।

তিন

গলিতে পা দিয়ে নাথু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাস্তায় অন্ধকার কেটে গেলেও গলিতে তখনও অন্ধকার রয়েছে। নাথু যত তাড়াতাড়ি পারে গলির পর গলির জট ছাড়িয়ে নিজের ডেরায় পৌঁছুতে চাইছিল। ওই দুর্গন্ধময় ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় এসে নাথু বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচল। যে অবস্থায় সে রাত কাটিয়েছে, তার তুলনায় এই আধ-জাগা গলিও তার কাছে অনেক শান্তির বলে মনে হল।

বাঁদিক থেকে মেয়েদের মৃদুমন্দ কথা আর চুড়ির ঝুনঝুন আওয়াজ ভেসে আসছিল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাথু দেখল, কলের সামনে দুতিনজন মেয়ে সামনে ঘড়া রেখে বসে গল্প করছে। কলে তখনও জল আসেনি। সেটাও নাথুর ভালো লাগল। আরও কিছুটা এগোবার পর ওর পায়ে কিসের একটা ঠোক্কর লাগল। নাথুর মনে হল ওর পা লেগে কোনো একটা জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। নাথু বুঝতে পারল কী ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীর অবশ হয়ে গেল। কোনো স্ত্রীলোক একজনের ঘরের সামনে 'তুক' ক'রে গেছে। একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো কিছু কাঁকর, আটার লেচিতে বানানো পুতুল, তাতে গোঁজা কিছু কাঠি—এই দিয়ে কোনো অভাগী তার নিজের বালাই অন্যের ঘরে চালান করার অভিপ্রায়ে 'বাণ' মেরে গেছে। নাথু এটা তার পক্ষে বেজায় দুর্লক্ষণ বলে মনে করল। ওইভাবে রাত কাটানোর পর বাণ-মারা জিনিসে পা পড়ে যাওয়ায় ওর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। পরক্ষণেই নাথু নিজেকে সামলে নিল। সাধারণত এসব জিনিস করা হয় যাতে নিজের সন্তানের গ্রহদোষ কেটে যায়। নাথুর ক্ষেত্রে তা খাটবে না। কেননা নাথু নিঃসন্তান। কাজেই নির্ভাবনায় সে এগোতে লাগল।

এ গলিটা ছিল নাথুর নখদর্পণে। যেখান দিয়ে সে এ গলিতে ঢুকেছে, তার কিছুটা অবধি মুসলমানদের বাস। দু-একজন ধোপা থাকে। আর থাকে গলির বাইরে যারা রাস্তার ধারে মাংস বিক্রি করে, সেইরকম কিছু কসাই। মহম্মদ হামামওয়ালাও এখানেই থাকত। খানিকটা এগিয়ে হিন্দু আর শিখদের বাস। সেই ঘরগুলো পেরিয়ে গলির শেষ প্রান্তে মুসলমান শেখদের আস্তানা।

একটা ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ভেতর থেকে কোনো বুড়োর গলা পাওয়া গেল। 'ইয়া আল্লা, খুল দী, খৈর খুল দা হলা (হে আল্লা, মঙ্গল করো, হাল ফেরাও)।' বুড়ো জেগে উঠে বিশ্বসুদ্ধ লোকের ভালো চাইছে। এরপর ওর কানে এল আড়ামোড়া ভেঙে গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠার শব্দ। লোকের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে।

কিছুটা দূর গিয়ে নাথুর ডান-পা একটা হড়হড়ে কিছুতে পড়ায় আরেকটু হলেই সে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গোবরের ঝাঁঝালো গন্ধ তার নাকে এল। পা সরিয়ে নিতেই গোবরের ভাঙা হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে গেল। আরেকটু

হলেই ওর মুখ দিয়ে গালাগালি বেরিয়ে আসছিল, এখন হুঁশ হয়ে, তার বদলে নাথুর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটে উঠল। গোবরে পা পড়ে যাওয়ায় তার সব ফাঁড়া যেন কেটে গেল। কদিন ধরেই গরমের তাত বাড়ছিল, তবু এ পর্যন্ত একফোঁটা বৃষ্টিও আশমান থেকে পড়েনি। যখন বৃষ্টি পড়তে এরকমের দেরি হয়, তখন পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেরা ভাঙা মাটির সরায় গোবর আর গরুঘোড়ার চোনা মিশিয়ে কোনো হাড়কিপ্টে লোকের ঘরের দরজার সামনে রেখে দিয়ে আসে। এতে নাকি জল্দি জল্দি বৃষ্টি আসে।

একটা বাড়ির সামনে একজন লোক গলিতে বাঁধা গোরুর সামনে দাঁড়িয়ে জাব মাখছিল। পাশের কোনো ঘর থেকে পেয়ালার ঠুনঠুন আওয়াজ ভেসে আসছিল। চা তৈরি হচ্ছে। এই সময় সামনে দিয়ে এক মহিলা দোপাট্টায় মুখ মাথা জড়িয়ে গুণ গুণ করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গেল। তার হাতে ধরা ছিল একটা বাটি। নাথু মনে মনে বলল, মেয়েটি নিশ্চয় মন্দিরে বা গুরুদ্বারে প্রণাম সারতে যাচ্ছে। খুব সহজ স্বাভাবিক ঢঙে শুরু হয়ে যাচ্ছিল নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। সেইসময় গলির মোড় থেকে একতারা বাজিয়ে কোনো ফকিরের গানের টুকরো নাথুর কানে ভেসে এল। এ আওয়াজ আগেও সে শুনেছিল, কিন্তু ফকিরকে সে দেখেনি। প্রায়ই ভোরের দিকে এই ফকির একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে শহরের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াত। বিশেষ করে রমজানের মাসে। তখন মুসলমানরা ভোর রাত্তিরে উঠে রোজা খুলত। কাছাকাছি গিয়ে নাথু ফকিরকে দেখল। পেল্লায় লম্বা। বুড়ো হলেও বেশ চিকন-চাকন চেহারা। ছোট একটু নূর, কিস্তি টুপি, গায়ে লম্বা আলখাল্লা, কাঁধে ঝুলছে একটা বড় ঝোলা। নাথু দাঁড়িয়ে পড়ল। ও চাইছিল ফকিরের গান ওর কানে যায়,

'তৈঁনু গাফলা জাগ ন আয়ি চিড়িয়াঁ বোল রহিয়া'
(ঘুমোস অবোধ, শুনিস না কি
পাখিরা করে ডাকাডাকি ?)

ফকির গান গাইতে গাইতে আসছিল। একতারার এই হালকা সুর প্রায়ই নাথুর স্বপ্নে দেখা দিত, শুয়ে শুয়েও তার মন ভরে উঠত। এখনও সেই সুর তার ভার মিষ্টি লাগল। নাথু পকেট থেকে একটা পয়সা বার করে ফকিরের হাতে দিল।

'আল্লা তোমায় রক্ষা করুন। তোমার ঘর ভরে থাক', ফকির আশীর্বাদ করলেন।

নাথু এগিয়ে গেল।

গলিটা পেরোতেই ও একটু আলোর দেখা পেল। ওইখান থেকেই টাঙ্গার গাড়োয়ানদের পাড়া শুরু। রাস্তা অবধি পৌঁছবার পরেও দৃশ্যের তেমন অদল-বদল হয়নি। কেবল আলোটাই যা একটু স্পষ্ট হয়েছে। রাস্তার ধারে দু-তিনটে টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির সামনের যে অংশটা ঘোড়ার সঙ্গে জোতা হয়, তার বোম দুটো ওপর দিকে ওঠানো থাকায়, মনে হচ্ছিল তারা যেন আকাশের দিকে দুহাত তুলে সকলের জন্যে দোয়া চাইছে। লম্বা দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো এক গাড়োয়ান তার ঘোড়াকে দলাই-মলাই করছিল। পাশে ব'সে দুজন স্ত্রীলোক তখনই মাটির

দেয়ালে ঘুঁটে দিতে শুরু করেছিল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা ঘোড়া একা সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ভোরবেলায় নিস্তব্ধ আবহাওয়ার নানাদিকে নানাভাবে জীবনের গতি লঘুচ্ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছিল।

নাথুর মনে হল ও যেন টহল দিতে বেরিয়েছে। ও চাইছিল না কেউ ওকে চিনে ফেলুক। সেইসঙ্গে মনের ছটফটে ভাব অনেকখানি দূর হয়েছে। আরও যেন স্বচ্ছন্দে সে এখন একপাড়া থেকে আরেক পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে পারছে।

হঠাৎ ওর কথাটা মনে এল। ঠ্যালা গাড়িটা এতক্ষণে কতদূর পৌঁছুল? গাড়িটা কোন্ দিক দিয়ে যাচ্ছে? খুবই আবোল-তাবোল প্রশ্ন। তবুও মনে হতেই, জোর কদমে ও পা ফেলতে শুরু করল। দূরের ছাউনিতে পৌঁছে গেল নাকি? হয়ত সলের্তারির পশুর হাসপাতালের সামনে এখন গিয়ে পৌঁছেছে। নাথুর মুখ থেকে খিস্তি বেরিয়ে এল। কেন, দিনের আলোয় শুয়োর মারা যেত না? আজই হঠাৎ সলের্তারি সাহেবের মরা শুয়োরের কী এমন দরকার পড়ল? নিশ্চয়ই কোথাও শুয়োরের মাংস বিক্রি করার জন্যে তাকে দিয়ে শুয়োরটাকে মারা হয়েছে। রাতের কথা মনে পড়ে গিয়ে নাথু আবার শিউরে উঠল। কিভাবে যে ওর রাতটা কেটেছে। ঘাম, শুয়োরের গন্ধ, বন্ধ ঘর, শুয়োরের হুংকার, শুয়োর তার থুতনি দিয়ে তার পায়ে তিনবার গুঁতো মেরেছে, নাথুর পা থেকে ছাল তুলে নিয়েছে। শুয়োর মারতে গিয়ে নাথু নিজেই প্রায় আধমরা হওয়ার যোগাড় হয়েছিল। চুলোয় যাক মুরাদ আলী! নাথুর যেখানে মন চাইবে যাবে। নাথু পকেটে হাত দিয়ে করকরে নোটের আওয়াজ শুনে নিল। আমার কী? পয়সা নিয়েছি কাজ করে দিয়েছি। ব্যস্!

চৌমাথার কাছে পৌঁছে নাথু ডানদিকে মোড় নিল। সেইসময় দূরে শেখেদের বাগানের ঘড়ির আওয়াজ শোনা গেল। মনে হয় চারটের ঘণ্টা বাজল। এখন ঘণ্টাটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। দিনের বেলায় কখনই শোনা যায় না। শহরের হট্টগোলে চাপা পড়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে, যেন আকাশ বেয়ে আওয়াজটা তার কানে আসছে। কিছুক্ষণ পরে দূরে শহরের মাঝখানে উঁচু টিলার ওপরে শিব-মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। শব্দগুলো ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। এদিকে সেদিকে ঘরের দরজা খুলে যাচ্ছে, কিছু লোক কাশতে কাশতে রাস্তায় হাতে ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে প্রাতর্ভ্রমণে যাচ্ছে। এক ছাগলওয়ালা তার তিন-চারটে ছাগল নিয়ে দুধ বেচতে বেরিয়ে পড়েছে। নাথুর পা আবার এলিয়ে এল। সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুরতে ওর খুব ভালো লাগছে।

এতক্ষণে ও গাড়োয়ানদের পাড়া পেরিয়ে ইমামদীনের মহল্লার বাইরে কমিটির বড় ময়দানের রেলিঙের পাশ বরাবর হাঁটতে শুরু করল। রেলিং পেরিয়ে ডান-দিকটা নিচে নেমে গেছে। তারপর ঢাল শেষ হয়ে শুরু হয়েছে বিরাট বড় ময়দান। এই মাঠে বরাবরই কিছু-না-কিছু হয়। শীতকালে ফি রবিবার এখানে কুত্তার লড়াই হয়। লোকে বাজি ধরে। চোট-লাগা কুকুর মাঠ ছেড়ে পালাতে গেলে চারদিকের লোকের ভিড় তাকে ঘেরাও করে রাখে। এখানে এই মাঠে হত ঘোড়ার

পিঠে উঠে সড়কিবাজি। হাজার হাজার লোক ভিড় করে দেখত। এখানেই বাইরে থেকে সার্কাসের দল এসে তাঁবু ফেলত। আসত তারাবাঈয়ের সার্কাস, পরশুরামের সার্কাস। এখানেই দ্রিম দ্রিম করে বেজে উঠত বৈশাখী উৎসবের ঢোল। কুস্তি হত। হালে এখানে হতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক সভা-সমিতি। এবার তো ঘন ঘন মিটিং হয়েছিল। এই মাঠে হত মুসলিম লীগের জমায়েত। সেইসঙ্গে বেলচা পার্টির। তবে কংগ্রেসের মিটিং হত এখান থেকে দূরে সবজী-মণ্ডীর সামনের ময়দানে, মাথার ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে।

নাথু পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রেলিঙে' বসে জোরে জোরে টানতে আরম্ভ করল।

ঠিক সেই সময় ইমামদীনের মহল্লার পেছনের মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ ভেসে এল। ভোরবেলার আরেক পোঁচ অন্ধকার ততক্ষণে কেটে গেছে। তাই আশপাশের ঘরগুলো বেশ পরিষ্কার চোখে পড়ছে। নাথু রেলিং থেকে নেমে এল। তারপর বিড়িটা নিভিয়ে ফের ইমামদীনের গলির দিকে যাত্রা করল। যেতে যেতে তার মনে হল, এই কমিটির মাঠের কাছেপিঠে কোথাও মুরাদ আলী থাকে। ঠিক কোথায় থাকে তা সে জানে না। তবে মুরাদ আলীকে দু-একবার এই রাস্তায় সে দেখেছে। এমনিতে তো মুরাদআলী শহরময় ঘুরে বেড়াত। কখনও এ-মহল্লায়, কখনও ও-মহল্লায় সরু ছড়িটা হাতে নিয়ে তাকে ঘুরতে দেখা যেত। ওর ঘন কালো গোঁফের ফাঁক দিয়ে কখনও দাঁত দেখা যেত না। হাসার সময়ও নয়। কেবল গাল দুটো ছেতরে যেত। আর তার গোলগাল চেহারার মধ্যে দুটি গুল্লি-গুল্লি চোখ সাপের চোখের মত চক্‌মক করে উঠত। বলা যায় না, হঠাৎ কোথাও ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মুরাদ আলী ক্ষেপে যাবে। মুরাদ আলী নাথুকে বলেছিল মরা শুয়োরটাকে ঠ্যালা গাড়িতে তুলে দিয়ে সে যেন এই ঘরেই মুরাদ আলীর জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু নাথু সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। শুয়োর মারার পয়সা তো নাথু পেয়েই গেছে। তাহলে কেন আর ওই নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে সে পড়ে থাকতে যাবে?

নাথু একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকল। তারপর কিছুদূর গিয়ে উত্তরমুখো এক আঁকাবাঁকা গলিতে গিয়ে পড়ল। কিছুটা যাবার পর ওর কানে ভেসে এল সমবেত কণ্ঠে গাওয়া একটা গানের সুর। একটু আগে যেরকম ফকিরের গলার গান শুনেছিল, কতকটা সেইরকম। আরও কয়েক পা এগোবার পর সামনের গলির মোড় থেকে সেই আওয়াজ আরও স্পষ্ট, আরও জোরালো হল। নাথু বুঝতে পেরেছিল এটা কোনো প্রভাতফেরীর দলবল হবে। এই সময়টাতে শহরে যেন মিটিং-মিছিলের ধুম পড়ে গিয়েছিল। নাথুর মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বাতাসে ভেসে আসছিল শ্লোগান। অনেকদিন থেকেই সেসব সে শুনে আসছিল। বুঝতে পারছিল, গানের এই দলটা কংগ্রেসওয়ালাদের—কেননা তাদের সামনে ছিল তেরঙ্গা পতাকা। গানের দলটা কাছাকাছি আসতেই নাথু ঝট ক'রে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

পড়ল। গাইতে গাইতে দলবল ওর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। নাথু দেখল আট-দশজন লোক, দু-একজনের মাথায় সাদা গান্ধীটুপি, কারো কারো ফেজ; দু-একজন সর্দারজীও তাতে সামিল। ছেলেবুড়ো সবাই আছে। নাথুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন চিৎকার করে স্লোগান দিল :

'দেশের ডাক…'

'বন্দেমাতরম…'

'বলো, ভারতমাতা কী—জয়।'

'মহাত্মা গান্ধী কী—জয়।'

এরপর ক্ষণিকের নীরবতা ভেঙে কিছুটা দূরে যেখানে দুটো গলি এক জায়গায় মিশেছে, সেখান থেকে আরও একটা স্লোগান শোনা গেল :

'পাকিস্তান—জিন্দাবাদ।'

'পাকিস্তান—জিন্দাবাদ।'

'কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ।

'কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ।'

নাথু ঝট্ ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। তিনজন লোক গলির মোড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসে স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছে। নাথুর মনে হল, গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা যেন গানের দলের রাস্তা আটকে দিতে চাইছে। তিন জনের মধ্যে একজনের মাথায় ছিল রুমী টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ঐ লোকটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো গানের দলটাকে যেন যুদ্ধং-দেহি ভাব দেখিয়ে বলছিল :

'কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন। ওর সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

গানের দলের পক্ষ থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক তার জবাব দিয়ে বললেন :

'কংগ্রেস বিলকুল সবার সংগঠন। কী হিন্দুর, কী মুসলমানের, কী শিখের। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, মেহবুব সাহেব—আগে আপনিও তো আমাদেরই একজন ছিলেন!'

এরপর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে রুমী টুপি-পরা লোকটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। গানের দলের কিছু লোকের মুখে হাসি ফুটল। রুমী টুপি-পরা লোকটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল :

'এসব হিন্দুদের ফন্দি, বক্সীজী! আমার সব জানা আছে। আপনি যাই বলুন, কংগ্রেস হিন্দুর সংগঠন। কংগ্রেস যেমন হিন্দুদের, তেমনি মুসলিম লীগ মুসলমানদের সংগঠন। কংগ্রেস কখনই মুসলমানদের দিশারী হতে পারে না।'

দুটো দলই পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। লোকজনেরা কথাবার্তাও বলছিল, আবার চোটপাটও করছিল।

বয়োবৃদ্ধ মানুষটি বলছিলেন :

'এই দেখ, শিখ আছে। হিন্দু আছে। মুসলমানও আছে। এই দেখ, সামনে দাঁড়িয়ে আজিজ, এই যে হাকিমজী—

'আজিজ আর হাকিম—ওরা হল হিন্দুদের পা-চাটা কুত্তা। হিন্দুদের ওপর আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। আমরা ঘৃণা করি তাদের কুকুরদের।' এ কথাটা সে এমন মুখ ঝামটা দিয়ে বলল যে, সেটা শুনে কংগ্রেস মণ্ডলীর ঐ দুই মুসলমান কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।

বুড়ো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'মৌলানা আজাদ হিন্দু, না মুসলমান? উনি তো কংগ্রেসেরই প্রেসিডেন্ট।'

'মৌলানা আজাদ হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পা-চাটা কুত্তা। গান্ধীর পেছনে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘোরে। এই কুত্তারা যেমন আপনার পিছন পিছন ল্যাজ নেড়ে বেড়ায়।'

বৃদ্ধ তখন খুব ধৈর্যের সঙ্গে বললেন:

'স্বাধীনতা সবার জন্যে। সারা হিন্দুস্থানের জন্যে।'

'হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা হবে হিন্দুদেরই জন্যে। স্বাধীন পাকিস্তানেই মুসলমানরা স্বাধীন হবে।'

ঠিক তখনই গানের দলের ভেতর থেকে ময়লা কোঁকড়ানো-মোকড়ানো কাপড়-পরা বেত বগলদাবায় করা রোগাপটকা একজন সর্দার চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'পাকিস্তান হবে আমার লাশের ওপর।'

শুনে কংগ্রেসের লোকেরা হাসতে লাগল।

'এই চুপ'—কে একজন তাকে থামিয়ে দিতে চাইল। ওর খ্যাসখেঁসে গলা-শুনে নাথুরও কেমন যেন মনে হল লোকটা আবোলতাবোল বকল। লোকজনদের হাসতে দেখে নাথু ধরে নিল ওর মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে।

কিন্তু লোকটা সমানে বলে যাচ্ছিল: 'গান্ধীজী ফরমান দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান ওঁর মৃতদেহের ওপর হবে। আমিও পাকিস্তান হতে দেব না।'

লোকজনেরা আবার হেসে উঠল।

'থুঃ করে ফেলে দাও তোমার রাগ, জেনারেল।'

বক্সীজী বললেন, 'থাক, থাক, জেনারেল। কোনো কোনো সময় আসে যখন চুপ করেই থাকতে হয়।'

তাতে জার্নাইল আরও ক্ষেপে গেল।

'কারো সাধ্যি নেই আমায় চুপ করায়। আমি নেতাজী সুভাষ বোসের ফৌজের লোক। আমি সব্বাইকে চিনি। আপনাকেও চিনতে বাকি নেই…'

লোকে হাসতে লাগল।

কিন্তু যেই গানের দল এগিয়ে যেতে গেল, অমনি রুমী টুপি-পরা লোকটা রাস্তা আটকে দিল:

'আপনারা এদিক দিয়ে যাবেন না বলছি, এটা মুসলমানপাড়া।'

বৃদ্ধ বলল: 'কেন? আপনারা যে সারা শহরে পাকিস্তানের আওয়াজ দিয়ে বেড়ান, কেউ আপনাদের আটকায়? আর আমরা তো সেফ স্বদেশপ্রেমের গান গাইছি।'

এই কথায় রুমী টুপি-পরা লোকটা একটু নরম হল, তাও বলল :

'আপনারা যেতে চান যান, কিন্তু এই দুই কুত্তাকে আমরা আমাদের পাড়ায় ঢুকতে দেব না।' বলে আবার সে তার দুটো হাত এমনভাবে দুপাশে বাড়িয়ে দিল, যেন সে গলির রাস্তাটা আবার বন্ধ করে দিচ্ছে।

ঠিক সেই সময় নাথুর চোখে পড়ল রুমী টুপি-পরা লোকটার একটু পেছনে দাঁড়িয়ে মুরাদ আলি। ওকে দেখেই নাথুর সারা শরীরে যেন ঝিম ধরে গেল। এ কোথা থেকে এসে উদয় হল? নাথু দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে গানের দলবলের পেছনে চলে গেল। মুরাদ আলি তাকে দেখে ফেলে নি তো? গানের দলের পেছনে গিয়ে সত্যিই সে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে এমন কি মুরাদ আলিও তার নজরে পড়ছিল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর নাথু ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখল। মুরাদ আলি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে ওদের যুক্তি-তর্কগুলো শুনছে।

নাথু গুটি গুটি পায়ে পিছিয়ে আসতে লাগল। যতক্ষণ এরা তর্কে ফেঁসে থাকবে মুরাদ আলিও সম্ভবত স্থানুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই মওকায় এখান থেকে নাথুকে সরে পড়তে হবে। মুরাদ আলি যদি তাকে দেখে ফেলে থাকে, তাহলে নির্ঘাৎ তার ডেরায় চলে গিয়ে নাথুর কাজের কৈফিয়ৎ চাইবে। কিছুদূর পিছু হটে এসে, হঠাৎ পিছন ফিরে নাথু হনহনিয়ে চলতে শুরু করে দিল। চটপট গলির মোড় ঘুরে নাথু চোখের আড়ালে এসে দ্রুত পায়ে ছুটতে শুরু করে দিল।

চার

টিলার ওপর পেঁছে দুজনে যে যার ঘোড়া থামাল। সামনে দূরবিস্তৃত গিরি-পথ পাহাড়তলীতে গিয়ে ঠেকেছে। দূর দিগন্তে যেন সাতরঙা ধুলো উড়ছে। বিশাল ময়দান। থেকে থেকে ছোট ছোট পাহাড়। তার মাথায় টলটলে নীল আকাশ, যার স্বচ্ছ বুকে চিলেরা সাঁতার কাটছে। বাঁদিকের উঁচু পাহাড়টা নীলচে আলোয় মোড়া। পাহাড়ের খাড়াই পশ্চিমে টাল খেতে খেতে এসে প্রান্তরটাকে ছুঁয়েছে। ডানদিকের প্রান্তে কুয়াশা জড়ানো লাল-লাল পাহাড়গুলো চোখে পড়ে।

সূর্যোদয়ের সময়কার এই দৃশ্য দেখবার জন্যেই রিচার্ড তার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসেছে। রিচার্ড একবার লীজার দিকে ফিরে দেখল। এই দৃশ্য দেখে লীজার কী ভাবান্তর হয়, রিচার্ড তা দেখতে চায়। এই মনোরম দৃশ্যটি লীজার সামনে এমন ভাবে সে ধরে দিতে চাইছিল, যেন এতদিন একটা যৌতুকের মতই সে এটাকে যত্ন করে তুলে রেখেছিল।

ভোরের মিষ্টিমধুর হাওয়ায় লীজার সোনালি চুল তির তির করে উড়ছিল। গুরুনীল চোখে একটা বিশেষ ধরনের টলটলে ভাব আর চেকনাই ছিল। কেবল

চোখের নিচে হালকা একটু ডুমো-ডুমো ভাব। খুব বেশি বীয়ার খাওয়া আর খুব বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে এই কালি-পড়া ভাব দেখা দেয়।

লীজা খুশি হবে, এই ভেবেই রিচার্ড ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। এবার প্রায় মাস ছয়েক কাটিয়ে লীজা বিলেত থেকে ফিরেছে। রিচার্ড চায় না পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। নতুন জায়গায় এসে লীজা জ্বালাতন-পোড়াতন হয় রিচার্ড তা চায় না। এ শহর লীজার যদি পছন্দ না হয়, তাহলে এখানে থাকা তাদের দুজনের পক্ষেই হবে নরকবাস। সারাদিন আপিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে শুরু হয়ে যাবে দুজনের মন কষাকষি। রিচার্ড মনস্থির ক'রে নিয়েছিল সকালটা সে লীজার সান্নিধ্যে কাটাবে। সেইজন্যে লীজা আসার পর থেকে গত এক সপ্তাহ ধরে তাকে নিয়ে আজ ঠাণ্ডী-সড়ক কাল টোপী-পার্ক করে বেড়িয়েছে। কখনও বা লীজাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে শহরের বাইরে এসেছে। নিজের দিক থেকে লীজাও প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে যাতে রিচার্ডের রুচির সে শরিক হতে পারে, যাতে এখানে মন টিঁকিয়ে থাকতে পারে। জেলার ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে লীজা একা-একাও ছাউনি-সদরে ঘুরতে পারত, তাকে দেখামাত্র লোকে দাঁড়িয়ে উঠে কুর্ণিশ ঠুকত, বলামাত্র লোকে ছুটে গিয়ে ওর হুকুম তামিল করত। কিন্তু কাঁহাতক আর একা-একা ঘোরা যায়। ডেপুটি কমিশনারের সময়ের ওপর তো আর লীজার কোনো হাত নেই। ফলে, দুজনের মনে মনে একটা খটকাও ছিল— কতদিন এভাবে তারা চালাতে পারবে? ইচ্ছে থাকলেও শেষ পর্যন্ত কি তারা বনাতে পারবে?

'বড় সুন্দর,' লীজা বলে উঠল : 'সামনে ওটা কোন্ পাহাড়? এখান থেকেই কি হিমালয় পর্বতমালার শুরু?'

রিচার্ড গদগদ হয়ে বলল, হ্যাঁ, তা বলতে পারো। আর এই যে গিরিপথ দেখছ, এটা এগোতে এগোতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একশো মাইল দূরে চলে গেছে।'

'কি রকম খাঁ খাঁ করা নির্জন গিরিপথ!' লীজা বিড় বিড় করে বলল।

'না, লীজা! এই গিরিপথে ভিড় করে আছে অনেক ইতিহাস। হিন্দুস্থানে যারাই চড়াও হয়েছে, তারা সবাই এসেছে এই পথ দিয়ে। তা সে মধ্য-এশিয়া থেকেই আসুক আর মঙ্গোলিয়া থেকেই আসুক।' বলতে বলতে রিচার্ডের উৎসাহ বেড়ে গেল : 'আলেকজান্ডারও তো এই রাস্তা দিয়েই হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। সামনে গিয়ে এই রাস্তা দুভাগ হয়েছে। একটা রাস্তা গেছে তিব্বতে, আরেকটা আফগানিস্থানে। এই রাস্তা ধরে যেমন বণিকের দল, তেমনি বৌদ্ধধর্মের প্রচারকেরাও দূরে দূরে দেশে পাড়ি দিতেন। অনেক ইতিহাসময় এই এলাকা। গত এক মাস টানা আমি এখানে ঘুরেছি। ইতিহাসের লোকদের কাছে এ জায়গার মূল্য অসামান্য। এর জায়গায় জায়গায় আছে পুরনো দালানের ভগ্নাবশেষ, আছে কেল্লা, বুদ্ধ-বিহার, সরাই...'

লীজা হেসে বলল, 'রিচার্ড, তুমি এমন ভাবে বলছ শুনলে মনে হবে এইটাই তোমার দেশ।'

'দেশটা আমার নয় লীজা—কিন্তু ইতিহাসের বিষয়টা তো আমারই।' রিচার্ড মৃদু হাসল। তারপর ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে পাহাড়ের দিকে নিশানা করে বলল: 'ঐ পাহাড়টা দেখছ, তার সতেরো মাইল দূরে রয়েছে তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ। তক্ষশিলা তো জানো?'

'হ্যাঁ, নামটা শোনা।'

'এককালে ওখানে বিরাট বড় এক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।'

লীজা ঠোঁট টিপে হাসল। ও বুঝেছে রিচার্ড এবার গড় গড় করে গিরিপথের গোটা ইতিহাস বলে যাবে। রিচার্ডের এই উৎসাহ লীজার ভালো লাগল। রিচার্ড শুকনো পাথরের বিষয়েও মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কথা বলতে পারে, শিশুর মত ওর অগাধ কৌতূহল, ডেপুটি কমিশনার হওয়া সত্ত্বেও ওর একটা আপনভোলা ভাব আছে। ভগবানের ইচ্ছেয়, লীজারও হয়ত এসব কথায় আগ্রহের উদ্রেক হতে পারে।

'এখানে একটা মিউজিয়াম, আছে। দেখলে তোমার ভালো লাগবে। হালে এখান থেকে আমি একটা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি নিয়ে এসেছি।'

'কেন, মূর্তি আগেই বা তোমার কী কম ছিল যে, আরও একটা জুটিয়ে আনতে হল?'

'ওর কাছাকাছি এখন খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। বিস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে। ওখানকার কিউরেটার তারই একটা আমাকে দিয়েছেন উপহার হিসেবে।

লীজার মনশ্চক্ষে রিচার্ডের বাংলোর বড় ঘরটা ভেসে উঠল। সেখানে রিচার্ড থরে থরে রকমারি মূর্তি আর ভারতীয় লোকশিল্পের নানান নিদর্শন সাজিয়ে রেখেছে। আর আলমারি গুলো বইতে সব ঠাসা। কেনিয়ায় থাকার সময় থেকেই ওর মাথায় এই সব পোকা। সেখানে ও যোগাড় করত আফ্রিকার লোকশিল্পের নিদর্শন, যত রাজ্যের তীরধনুক, মৃৎপাত্র, পাখির পালক, টোটেম। আর এখানে এসে শুরু করেছে মূর্তি সংগ্রহ।

লীজা ফের আশপাশের দৃশ্য দেখায় মন দিল। বাঁ হাতে নিচের দিকে ছোট ছোট গাছের ঘন জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে টিলার ওপর এসে পৌঁছুল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে টিলার ওপর আসতেই তার চোখের সামনে পুরো দৃশ্যপট অবারিত হল। ডানদিকে ছোট ছোট টিলা, তারপর বিস্তীর্ণ প্রান্তর দূরে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

লীজা টিলার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলল, 'এখানকার মাটি কেমন? রং কি লাল?' তারপর রিচার্ডের দিকে ফিরে বলে উঠল: 'সড়ক কোন্ দিকে? আমরা কি আবার জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই ফিরব?' লীজা মজা করার ভাব নিয়ে বলল, 'সেই সড়কটা দেখাও না, যেখান দিয়ে আলেকজান্ডার হিন্দুস্থানে এসেছিলেন।'

'সেকালে কি আর পাকা রাস্তা ছিল, লীজা। ছিল একটা সেকেলে রাস্তা—প্রায় চার শো বছরের পুরনো—সেটা ঐ টিলার পেছন দিয়ে চলে গেছে।'

রিচার্ডের দিকে লীজা তাকাল। মোটা ফ্রেমের চশমার নিচের দিকে রিচার্ডের মুখটা ওর কাছে ভারি মায়াময় ব'লে বোধ হল। ওর মন চাইছিল এই এলাকার প্রত্নতত্ত্বের চর্চা ছেড়ে রিচার্ড ওর সঙ্গে একটু প্রেম-ভালবাসার কথা বলুক। কিন্তু রিচার্ড তখন তোড়ে কথা বলে চলেছে।

'এ তল্লাটের লোকেরাও খুব পুরনো আমলের, শত শত বছরের বাসিন্দা।' তারপর লীজার দিকে ফিরে বলল: 'তুমি এখানকার লোকদের একটু লক্ষ্য করে দেখেছ? মানুষগুলো এক ছাঁদের—মুখের ছাঁচ যেন সবার এক, এক রকমের নাক ঠোঁট, চ্যাটালো লম্বা ধরনের মাথা, কটা রঙের চোখ—এখানে সবারই কটা চোখ—এটা তুমি খেয়াল করেছ, লীজা?'

'একই ছাঁদের হয় কী করে, রিচার্ড? এদিকে তুমি যে বললে, এই রাস্তা দিয়ে রকমারি মানুষ এসেছে?'

'না, না লীজা! এটাই তো লোকে ভুলে যায়'—রিচার্ডের গলায় আবেগ এসে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন সে তার কোনো বদ্ধমূল ধারণা সপ্রমাণ করতে চলেছে। 'মধ্য এশিয়া থেকে সবার আগে যারা এখানে এসেছিল, শত শত বছর পরে তাদেরই উত্তরপুরুষেরা অন্যান্য দেশ থেকে এখানে এসেছে। জাত সবারই এক। এইসব লোক, যাদের বলা হয় আর্য, কয়েক হাজার বছর আগে তারা এখানে এসেছিল। আর যাদের বলা হয় মুসলমান, যারা এক হাজার বছর আগে এখানে এসেছিল—এরা সবাই একই ধাঁচের মানুষ। সবাই মূলে একই জাতির লোক ছিল।'

'এসব কথা এখানকার লোকদেরও জানা আছে নিশ্চয়।'

'এখানকার লোকজনেরা কিছুই জানে না। এরা সেইটুকুই জানে যেটুকু আমরা এদের বলি।' তারপরে একটু চুপ করে থেকে রিচার্ড বলল, 'এরা এদের নিজেদের ইতিহাস জানে না। এটা কেবল আছে ওদের নাড়ির মধ্যে।'

লীজার হাঁই পেয়ে যাচ্ছিল। রিচার্ডের মাথায় যখন কিছু চাপে, তখন ওর আর কিছুতে খেয়াল থাকে না। রিচার্ড যতই ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়, লীজা ততই পিছোতে থাকে। রিচার্ড কখনও বইয়ের পোকা, কখনও সে ডি-সি, পরক্ষণে সে ছুটছে ইতিহাসের পেছনে। লীজাকে সে যথেষ্টই চায়। কিন্তু তার মুশকিল. লীজাকে দেবার মত তার সময়ই নাই। বাড়িতে আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রিচার্ড বইয়ের ভেতর ডুবে যায়। ফলে লীজা যখন বিরক্ত হত তখন তার সেই বিরক্তির সীমা-পরিসীমা থাকত না। রাগে তার আপাদমস্তক জ্বলে উঠত। নেটিভদের সে বিষবৎ দেখতে থাকত। আর শেষপর্যন্ত তার নার্ভাস ব্রেকডাউন হত। তখন ছমাস-একবছরের জন্যে বিলেতে চলে যেত।

'এখানে কোনো পিকনিকের জায়গাও আছে না কি?' রিচার্ডকে থামিয়ে দিয়ে লীজা জিজ্ঞেস করল।

শুনে রিচার্ড একটু ভ্যাবাচাকা খেলেও প্রশ্নটা তার কাছে তেমন অবান্তর মনে হয়নি।

'প্রচুর আছে', বলে হাতের বেত তুলে বাঁদিকের উঁচু পাহাড়টা দেখিয়ে বলল:

'পাহাড়ের তলার দিকে আছে ঝরনা আর বড় বড় গাছে ঘেরা ঘন ঝোপঝাড়। জলের ধারা নিচে অবধি নেমে ফোয়ারার মত ফিনকি দেয়। জায়গাটা ভারি সুন্দর। হিন্দুরা ঝরনার চারপাশে পাথর বসিয়ে সেখানে একটা পুকুর বানিয়ে নিয়েছে। এক্কেকটা ঝরনার একেকটা নাম দিয়েছে। কোনোটা রাম, কোনোটা সীতা কিংবা নিজেদের পুরাণ থেকে নেওয়া কোনো নাম।' বলতে বলতে রিচার্ডের ঠোঁটে ফুটে উঠল মুচকি হাসি। কেননা বলে ফেলে ওর মনে হল এসব নাম লীজার কাছে খুবই খটোমটো আর অচেনা বোধ হবে। তারপর বলে চলল: 'অনেক জায়গা আছে যেখানে পীরের দরগায় লোকে পিদিম দেয়। আছে পুরনো দুর্গ, আছে মন্দির…।' তারপর বেত দিয়ে পাহাড়ের কোলে ঘনবিন্যস্ত আরও একটা গাছতলার ঝোপের দিকে ইশারা করে বলল, 'ঐখানে কিছুটা ডাইনে গিয়ে আরেকটা ভারি সুন্দর পিকনিকের জায়গা আছে। সেখানে আছে এক পীরের কবর, কোনো মুসলমান পীরের কবর। সেখানে বসন্তকালে মস্ত মেলা বসে। দূর-দূর প্রান্ত থেকে এসে হাজির হয় নাচওয়ালী, গানওয়ালীর দল। পনেরো দিন ধরে মেলা চলে। লোকে দিনের বেলায় জুয়ো খেলে, রাত্তিরে নাচগান হয়। তোমাকে একবার নিয়ে যাব।'

'মেলা এখন হচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে; তবে এখন যাওয়াটা ঠিক নয়।'

'কেন?'

'এখন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা মন-কষাকষির ভাব রয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার ভয় আছে।'

লীজা হিন্দুমুসলমানের এরকম একটা অবস্থার কথা শুনেছিল বটে তবে তার খুঁটিনাটি ও কিছুই জানত না।

'আমি তো কে হিন্দু, কে মুসলমান সেটাই আজও চিনতে পারি না। রিচার্ড তুমি দেখে চিনতে পারো কে হিন্দু, কে মুসলমান?'

'হ্যাঁ, আমি পারি।'

'আমাদের বাসার খানসামা হিন্দু না মুসলমান?'

'মুসলমান।'

'কেমন করে তুমি জানলে?'

'ওর নাম থেকে। তাছাড়া ওর নূর দেখে। আর ওর পোশাকের ধরন দেখে। ও নমাজ পড়ে। এমন কি ওর খাওয়াদাওয়ার ধাঁচও আলাদা।

'সব কিছু তুমি জানো, রিচার্ড?'

'কিছু কিছু জানি।'

'তুমি কত কিছু জানো, রিচার্ড। অনেক কিছুই তোমার জানা আছে, আমি কিছুই জানি না। আমাকেও তুমি বুঝিয়ে দিও, রিচার্ড। আমাকেও এসব বুঝতে হবে। আর ওই যে তোমার সেক্রেটারি, যে সেদিন স্টেশনে এসেছিল, সাদা সাদা দাঁত। ও কী? হিন্দু, না মুসলমান?'

'ও হিন্দু।'

'কী করে জানলে?'

'ওর নাম থেকে।'

'নাম থেকেই তুমি ধরতে পারো?'

'খুব অনায়াসে, লীজা। মুসলমান হলে নামের শেষে থাকে আলী, দীন, আহম্মদ—এই রকমের সব শব্দ। আর হিন্দুদের নামের শেষে থাকে লালচাঁদ, রাম এইধরনের শব্দ। রোশনলাল হলে হিন্দু, রোশনদীন হলে মুসলমান। ইকবালচাঁদ হলে হিন্দু। আর যে ইকবাল আহম্মদ, সে মুসলমান।'

লীজা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'অতশত জানা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না।'

তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা পাগড়িপরা লোক, যার মুখে ইয়া লম্বা দাড়ি—ও লোকটা কী?

'ও শিখ।'

'লীজা হেসে ফেলে বলে, 'ওকে চেনা শক্ত নয়।'

রিচার্ড বলল, 'শিখ হলেই তার নামের শেষে সিং থাকবে।'

ওরা দুজনে এবার টিলা থেকে নেমে আসছিল। হাওয়ায় একটু একটু গরম ভাব। ততক্ষণে সূর্য উঠে যাওয়ায় চারদিকের বাতাবরণ থেকে রহস্যের পাতলা পর্দা সরে যাচ্ছিল।

'এই এলাকায় ঘুরে বেড়ানোয় খুব মজা আছে। তোমার ভালো লাগবে, লীজা। শনিবার হলেই আমরা কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ব।'

রিচার্ডের ঘোড়া আগে আগে যাচ্ছিল। ওরা নুড়ি পাথরের বাঁধানো শুকনো নালা পার হচ্ছিল।

'সামনের শনিবার কোথায় যাবে ঠিক করেছ?···নিশ্চয় তক্ষশিলা?'

লীজার বলার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে বলে রিচার্ডের বোধ হল। রিচার্ডের কাছে তক্ষশিলা একটা ভারি সুন্দর স্মরণীয় জায়গা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও সেখানে ঘুরে বেড়াত। বার বার গিয়েও ওর আশ মিটত না। কিন্তু লীজা? ঐ ভগ্নস্তূপের মধ্যে ঘুরতে লীজার কি ভালো লাগবে?

'এখন কিছুদিন যাওয়া যাবে না, লীজা। শহরে এখন কিছুটা উত্তেজনার আবহাওয়া রয়েছে। অবস্থাটা একটু ভালো হলেই আমরা যাব। এই সপ্তাহের শেষে তো···' রিচার্ড ঠিক করতে পারছিল না কী বলবে। এ সপ্তাহের শেষাশেষি কী দাঁড়াবে, লীজাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা—ওর নিজের কাছেই সেসব খুব স্পষ্ট ছিল না;

'যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়া যাবে'— মিনমিন করে বলল। তারপর আরও নিচে পৌঁছে রিচার্ড ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

ছোট-হাজিরার আগে রিচার্ড আর লীজা ওদের বাংলোর অগুনতি কামরা পার হয়ে হলঘরে এসে দাঁড়ালো। এপ্রিল মাস পড়লে বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানলা

দরজায় এমনভাবে পর্দা টেনে দেওয়া হত, যাতে ঘর ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধকারে তাই দিনমানেও ঘরে বিজলী বাতির আলোর দরকার হত। চারদিকের দেয়ালে আলমারিগুলো বইপত্রে ঠাসা। মধ্যে-মধ্যে দেয়ালের গায় কাঠের উঁচু উঁচু তক্তার ওপর বসানো বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের ঊর্ধ্বকায় অনেক মূর্তি। চেষ্টা করা হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি মূর্তির ওপর আলাদা আলাদা ভাবে আলো এসে পড়ে। সুইচ টিপলেই এমন সব কোণ থেকে আলো পড়ত যে, তাতে মূর্তিগুলোর রূপ আরও খোলতাই হয়ে উঠত। এছাড়াও দেয়ালের গায়ে ছিল ভারতীয় চিত্রকলার অনেক নিদর্শন। ফায়ার প্লেসের ওপর রকমারি পুতুল আর ছিল তাম্রপত্রে লেখা একটি গ্রন্থ। ফায়ার প্লেসের সামনে শিলালিপি সম্বলিত একটি পাথরের চাঁই একটা কাঠের খুঁটির সাহায্যে দাঁড় করানো ছিল। তার কাছেই তিনকাণা কালো কাঠের একটা লম্বা নিচু তেপায়া। রিচার্ড সেখানে পাইপ ধরিয়ে পড়াশুনো করত। সেখানেই স্টোভের ওপর খানসামা জলের কেটলি আর চায়ের সাজ সরঞ্জাম রেখে যেত। রিচার্ড নিজে হাতে চা করে খেতে ভালবাসত। তেপায়ার ওপর আধখোলা বই আর পত্র পত্রিকার সঙ্গে থাকত তার পাইপস্ট্যাণ্ড। তাতে সাত-আটটা তরোবেতরো পাইপ। তেপায়ার ওপর গোল-শেডের ঝুলন্ত ল্যাম্প। পড়ার সময় বাতি জ্বাললে তার আলো শুধু তেপায়ার এই তিন মুড়োতেই এসে আটকা পড়ত। ঘরের আর সমস্তই অন্ধকারে ঢাকা থাকত।

লীজার কোমরে হাত দিয়ে রিচার্ড বুদ্ধের মূর্তিগুলো একটি একটি করে দেখাচ্ছিল সেইসব মূর্তি, যা লীজা চলে যাওয়ার পর সে সংগ্রহ করেছিল।

রিচার্ড বলছিল, 'বাংলোর বাইরে গেলে আমি থাকি হিন্দুস্থানের কোনো এক শহরে। বাংলোয় ফিরে এলে স্যার। হিন্দুস্থান আমার হাতের মুঠোয় চলে আসে।

চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, মুখে পাইপ, কনুইয়ে ঝোলানো কষিদার পুরনো কোট, তার নিচে ঢিলে পাতলুন। এই চেহারায় রিচার্ড যখন এঘর-ওঘর করে, তাকে মিউজিয়ামের কিউরেটারের মত দেখায়।

রিচার্ড একটি বুদ্ধ মূর্তির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বুদ্ধমূর্তির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার মুখের ক্ষমাসুন্দর হাসি। যা তার ঠোঁটের আশেপাশে লেগে থাকে। বুদ্ধমূর্তিকে এমন এক আলোয় রাখতে হয় যাতে ঐ হাসিটুকু ফুটে উঠতে পারে। 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি—এই বলে রিচার্ড সামনে রাখা বুদ্ধ মূর্তিটা সামান্য ডানদিকে ঘুরিয়ে আলোর সুইচ টিপে দিল। তাতে বুদ্ধের ঠিক ওপর দিক থেকে বাতির আলো জ্বলে উঠল।

রিচার্ড ডগমগ হয়ে বলে উঠল, 'দেখেছ লীজা, দেখেছ?' লীজারও মনে হল বুদ্ধের মুখে যেন হঠাৎ একটা স্মিত হাসি খেলে গেল—সৌম্য, স্নিগ্ধ কিছুটা ব্যঞ্জনাময় হাসি।

'হাসিটা শুধু ঠোটের কোণে লুকিয়ে থাকে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ থেকে

হালকা করে আলো ফেললেই হাসিটা ফুটে বেরিয়ে আসে। এখন এই কোণটা যদি ঘুরিয়ে দিই হাসিটার অনেককিছুই উবে যাবে… ।'

লীজা পাশ ফিরে রিচার্ডের দিকে তাকালো। আজব লোক এরা, পাথর আর ভগ্নস্তূপ থেকে কত যে রস নিংড়ে নিয়ে এরা কথা বলে। এতকিছু জানা থাকলেও কোনো স্ত্রীই এতটা ডগমগ হয়ে কথা বলবে না, এতটা বুঁদ হয়ে যাবে না।

'বুদ্ধমূর্তির এটাই বড় বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধের ঠোঁটে খেলতে থাকে একটা হালকা হাসি,' ব'লে রিচার্ড ঝুঁকে প'ড়ে লীজার চুলে চুমো খেল।

সব কামরাতেই রকম রকম আলো। যেখানে যেখানে বসবার ব্যবস্থা আছে সেখান থেকেই কলিংবেলের তার রসুইঘর পর্যন্ত কিংবা বাইরের বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে।

এই ঘরে রিচার্ডকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে, সে হল জেলার সর্বেসর্বা। এ ঘরে সে ভারতীয় ইতিহাসের একজন মর্মগ্রাহী, ভারতীয় শিল্পের একজন বড় রকমের বোদ্ধা। তবে হ্যাঁ, ও যখন প্রশাসকের চেয়ারে বসে, তখন পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ। সে তখন লন্ডন থেকে নির্ধারিত হয়ে আসা নীতিনিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এক কাজকে অন্য কাজের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা, এক চিন্তাকে অন্য চিন্তা থেকে পৃথক করে রাখা ওর প্রতি মুহূর্তের, ওর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল। এক ধরনের কাজ সেরে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাজে খুব অনায়াসে নিজেকে সে ঢেলে দিতে পারত। নিজের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগাকে রিচার্ড সরকারী কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত। সে পারত দুটোকে দুই আলাদা দৃষ্টিতে দেখতে। সে একটা বিশেষ অনুশাসনের গণ্ডীতে জীবনকে বেঁধে নিয়েছিল। সপ্তাহে তিনদিন রিচার্ড কাছারিতে যেত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মোকদ্দমার শুনানীতে বসত। যখন জজের চেয়ারে বসত তখন ভুলে যেত সে হাকিমের পক্ষের লোক, ভুলে যেত নেটিভদের মামলা শুনছে। সে সময় ও বসত ন্যায়ের আসনে, ভারতীয় পেনাল কোডের ধারাগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করত। এক ক্ষেত্রের বিচার আর ভাবনা অন্য ক্ষেত্রে এনে কখনই ও জট পাকিয়ে ফেলত না, ফলে ওকে মানসিক কষ্টে পড়তে হত না, দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হতে হত না। বিশ্বাস বলতে ওর কী ছিল? ধারণা বলতেই বা কী? এসব বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা খুব কঠিন। মনে হয় রিচার্ড নিজেও তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না। যখন সে ধোঁকায় পড়ত, তখন সে নিজের কী অনুভূতি, নিজের কী বুদ্ধিবিচার—তা নিজের রোজনামচায় লিখে রাখত। প্রশাসনের ক্ষেত্রে ওর নিজের মতামতকে ও আমল দিত না, বরং সেটাকে অবান্তর বলে মনে করত, বিচার হবে আমার আচার-বিচার, আমার মূল্যবোধ অনুযায়ী—এটা মেকি আদর্শবাদ। সিভিল সার্ভিসে নাম লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন অফিসার সেই মেকি আদর্শবাদ থেকে নিজের নাম কাটিয়ে দেয়। তবে রিচার্ডের নিজের কী ভূমিকা ছিল? প্রশাসনে ওর যোগ দেওয়ার পেছনে কী ছিল? ওর মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কার্যকর করার যোগ্যতা ছিল বৈকি।

ওর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম দৃষ্টি, বোঝবার ক্ষমতা—যার জোরে সে অবস্থাটা কী তা ধরতে পারত; প্রকৃত ঘটনা যথার্থভাবে বুঝতে পারত। এই সাবধানতার পেছনে ছিল সেই জিনিস, যার জোরে সে চুপচাপ বৃটিশ সরকারের নীতিতে মাপসই আমলাদের পোশাক থাপে থাপে গায়ে এঁটে নিতে পারত। তার নিজের কী মূল্যবোধ ছিল সে প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না। বৃত্তি নির্বাচনের বেলায় নিজের নৈতিকতার কথাকেই বা কে কবে মনে আনে? তখন সে শুধু ভাবে কিসে নিজের ভালো হবে।

এ ওর কোমরে হাত দিয়ে ওরা ডাইনিংরুমের দিকে এগোল। সবচেয়ে এই ঘরটাই লীজা পছন্দ করত। আবলুশ কাঠের কালো গোল টেবিলের মাঝখানে রাখা পেতলের একটা গোল রেকাবে ভর্তি হয়ে থাকে বাছা বাছা লাল গোলাপ। ছাদে লটকানো জালিদার শেডের আলো খাড়াখাড়িভাবে নেমে আসে থালার ঠিক ওপর। আলোর বৃত্তটা পড়ে সোজাসুজি রেকাবের ওপর। জালিদার শেড থেকে ফোঁটা ফোঁটা আলো চীনেমাটির সুন্দর সুন্দর প্লেট আর তার চারপাশে রাখা লাল রঙের ন্যাপকিনের ওপর পড়ে। রিচার্ডের এই ধরনের গৃহসজ্জাই পছন্দ। লীজা জানত, রিচার্ডের সঙ্গে ঘর করতে গেলে ওর খেয়ালখুশি অনুসারেই তার নিজেকে ঢেলে সাজতে হবে।

টেবিলে প্রাতরাশে বসবার আগে রিচার্ড দোরগোড়ায় এসে কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী হল, ভাবছ কী?' বলে লীজা তার কাঁধে মাথা রাখল।

'ভাবছি কোন্‌খান থেকে শুরু করব।'

'তুমি এখানকার লোকদের কথা জানতে চাইছিলে না? এখানকার অবস্থা সম্পর্কে... ?'

'আমি কিছু জানতে চাই নি। আমি শুধু জানতে চাই কখন তুমি আপিস থেকে ফিরবে।'

এই বলে লীজা হাত বাড়িয়ে রিচার্ডের বুকে সুড়সুড়ি দিল। রিচার্ড ঝুঁকে পড়ে ওর ঠোঁটে চুমো খেল।

'এখন থেকেই বেজার হচ্ছ?'

নতুন করে ওর মনে হল, দিগন্তে বর্ষার একখণ্ড মেঘ এসে হাজির হয়েছে। সেই মেঘ বেড়ে বেড়ে আরও মসীকৃষ্ণ হয়ে এক নিমেষে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

রিচার্ড আরও জোরে লীজাকে কোলের মধ্যে টেনে নিল। এরকমের দাম্পত্য-লীলা রিচার্ড যে খুব একটা উপভোগ করতে পারছিল এমন নয়। এই ভেবে মনে মনে ও সিঁটিয়ে যাচ্ছিল যে, এবার কিভাবে ও লীজার সঙ্গে দিন কাটাবে। লীজার চুলে, মাথায়, চোখে ঠোঁট বোলাতে থাকলেও রিচার্ডের শরীরে কোনো উত্তেজনা বোধ হল না। রাত্রে যে উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে তার দেহ লীজার দেহের সঙ্গে লেপ্টে থাকে, এই সময় তার সেই দেহটাই ভোঁতা আর থলথলে বলে বোধ হল।

লীজাকে ভোলাবার জন্যে সে শুধু এক রকম দায়সারাভাবেই প্রেমের অভিনয় করে চলেছে।

এই সময় টেবিলের পেছনকার অন্ধকার থেকে গুটি গুটি পায়ে খানসামা এগিয়ে এল। আলোর বৃত্তে এসে পড়তেই ওর সাদা উর্দির কোমরে বাঁধা লাল পেটি ঝক্‌মক্‌ করে উঠল। পা টিপে টিপে সে নিঃশব্দে প্রাতরাশ সাজাতে লাগল।

রিচার্ড আর লীজা আগের মতই পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে রইল। গোড়ায় গোড়ায় খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সোহাগ করবার সময় খানসামা বা চাকরবাকরদের কেউ কোনো কাজে হঠাৎ এসে পড়লে লীজা ধাঁ করে সরে যেত আর রিচার্ড তার কোলের মধ্যে ওকে ঠেসে ধরত। আর খানসামার কাজ খানসামা করে যেত। লজ্জার চোটে লীজা চোখ বন্ধ করে রাখত, যাতে খানসামার উপস্থিতির কথা তার মনে না পড়ে। পরে সে আস্তে আস্তে বুঝে গেছে যে, খানসামা একজন নেটিভ বৈ তো নয়, আর তাছাড়া ও তো নেহাৎ একজন খানসামা। ওর উপস্থিতিতে এখন আর লীজার কিছু আসে যায় না।

'এবার লীজা, কোনো-না-কোনো কাজে তোমাকে মন লাগাতেই হবে।'

'কোন্‌ কাজে?'

'কতই তো কাজ আছে। ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রীকে জেলার প্রথমা হিসেবে গণ্য করা হয়। তুমি যে কাজেই হাত লাগাবে অন্য অফিসারদের বউরা তোমার সহায় হবে।'

'ওসব আমি বিলক্ষণ জানি। রেড-ক্রশের জন্যে চাঁদা তোলো, ফুলের হাট বসাও, বাচ্চাদের জন্যে ফীড বানাও, জওয়ানদের জন্যে জুতোকাপড় যোগাড় করো, এই তো?'

'আরও একটা সংস্থা আছে যেটা এখানে আমরা খুলতে চাই, যা জানোয়ারদের দেখাশুনো আর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এখনও পর্যন্ত এ ধরনের কোনো সংগঠন এখানে হয় নি। ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় যেসব উটকো কুকুর ঘুরে বেড়ায় তাদের সরানো, ঘোড়ার গাড়িতে যেসব বুড়ো-ল্যাংড়া ঘোড়াদের জোতা হয়…।'

'ওদের কী করবে?'

'মেরে ফেলা দরকার। ওদের দিয়ে কাজ করানো মানে ওদের ওপর নিষ্ঠুরতা করা। রাস্তার কুকুররা রোগব্যাধি ছড়ায়, পাগল হলে মানুষকে কামড়ায়। এর মধ্যে মনের মতন যে কোনো কাজ নিজে পছন্দ করে নাও।'

তুমি করবে ডেপুটিগিরি আর আমি কিনা কুকুর মেরে বেড়াব? আমার ভারি দায় পড়েছে। লীজা বলে, 'বটে আমার সঙ্গে রগড় করছ? সমস্ত সময় দেখি আমার সঙ্গে তামাসা করো।'

'মোটেই তামাসা নয়। কোনো-না-কোনো কাজ তুমি ভালবেসে করো, সেটাই আমি চাই।'

'আমার মন লাগবে তোমার কাজে। সকালে তুমি যা বলছিলে, সেইসব কথা আমি শুনতে চাই।… হিন্দুস্থানের মানুষজনদের সম্বন্ধে।'

রিচার্ড মুখ টিপে হাসল।

'বেশ, তবে শোনো। এদেশের লোকগুলো ভারি রগচটা। একটু উস্‌কে দিলেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। ধর্মের নাম করে খুনখারাপি, প্রত্যেকেই যে যার সে তার, আর…আর সবারই পছন্দ সাদা চামড়ার স্ত্রীলোক…!'

কথার শেষটুকু শুনে লীজার আবার মনে হল রিচার্ড তার সঙ্গে মস্করা করছে। লীজার চোখে রিচার্ড ছিল বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য মানুষ। অবশ্য ওর এও মনে হত যে, রিচার্ড তাকে উজবুক বলে মনে করে। ওর কথাবার্তায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ভাব থাকে। গুরুতর বিষয়ে বলতে গিয়েও হঠাৎ এক-আধটা এমন বাক্য জুড়ে দেয় যাতে মনে হয় ও ইয়ার্কি করছে। এ থেকেই লীজার ধোঁকা লাগে—যখন রিচার্ড গুরুগম্ভীরভাবে কিছু জানায় হয়ত তার মধ্যেও এমন কিছু থাকে যা রিচার্ড শুধু পরিহাসচ্ছলেই বলে।

লীজা অভিমানের সুরে বলে, 'একটা কথাও আমাকে তুমি গুরুত্ব দিয়ে বলো না।'

'অত ভারিক্কি চালে বলার কী মানে হয়?' রিচার্ড চিন্তায় ডুবে গিয়ে বলল, 'শোনো, লীজা! মনে হচ্ছে, এখানে একটা কোনো গোলমাল হবে!'

লীজা চোখ তুলে রিচার্ডের মুখের ওপর রাখল।

'কি রকমের গোলমাল? আবার যুদ্ধ বাঁধবে?'

'না, তা নয়। তবে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষি বাড়ছে। একটা কোনো অঘটন না ঘটলে বাঁচি।'

'এরা আপনা আপনির মধ্যে লড়াই করবে? লন্ডনে থাকতে তুমি যে বলেছিলে এরা সব তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'আমাদের বিরুদ্ধেও লড়ছে, আবার নিজেরা নিজেরাও লড়ছে?'

'বলছ কী তুমি? ফের মস্করা করছ।

রিচার্ড মুচ্‌কি হেসে বলল, 'ধর্মের নামে লড়ছে নিজেদের মধ্যে, আর দেশের নামে লড়ছে আমাদের বিরুদ্ধে।'

'বেশি চালাকি করো না, রিচার্ড। আমি সব বুঝি। দেশের নামে এরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, আর তোমরা ধর্মের ধুয়ো তুলে ওদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়িয়ে দিচ্ছ। কী, ঠিক বলি নি?'

আমরা লড়াচ্ছি না, লীজা। ওরা নিজেরাই লড়ছে।'

'তোমরা তো এদের লড়াই বন্ধ করতেও পারো। যত যাই হোক, এরা তো একই জাতির লোক।'

রিচার্ড ওর বউকে আদর করে ভোলাতে চায়। ঝুঁকে পড়ে তার গালে চুমো খায়। বলে:

'ডার্লিং, যারা সরকার চালায় তারা এটা দেখে না যে, প্রজাদের মধ্যে কোথায় একা কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তারা কে কতটা আলাদা, সেটা দেখতেই সরকারপক্ষ ভালবাসে।'

এরই মধ্যে খানসামা জলখাবারের ট্রে নিয়ে চলে আসে। ওকে দেখতে পেয়ে

লীজা বলে ওঠে : 'এ হিন্দু, না মুসলমান ?'

রিচার্ড বলে, 'তুমি বলো দেখি।'

খানসামা ট্রের জিনিসগুলো একটা একটা করে নামিয়ে রাখল। তারপর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। লীজা অনেকক্ষণ ধরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

'ও হিন্দু।'

'ভুল করলে।'

'কেন, ভুল কেন ?'

'ফের ভালো করে দেখ।'

খেয়াল করে দেখার পর লীজা বলল, 'ও শিখ। ওর দাড়ি আছে। মাথায় পাগড়ি।'

রিচার্ড আবার হেসে উঠল। খানসামা তখনও পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। ওর মুখের কোনো মাংসপেশী এতটুকু নড়ছে না।

'এর দাড়ি কাঁচি দিয়ে ছাঁটা। শিখেরা দাড়িতে কাঁচি ছোঁয়াতে পারে না। ওদের ধর্মে বারণ আছে।'

লীজা বলল, 'এটা তো আগে বলো নি।'

'আরও তো কত কিছু বলা হয় নি।'

'যেমন ?'

'যেমন, পাঁচটা লক্ষণ দেখে শিখ চেনা যায়। চুল বাদেও আরও চারটি চিহ্ন। হিন্দুদের মাথায় থাকে টিকি। তেমনি মুসলমানদেরও কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। খাদ্যপানীয় থেকেও আঁচ করা যায়। গোমাংস হিন্দুরা খায় না। আর মুসলমানদে কাছের হারাম শুয়োরের মাংস। এক কোপে কাটা ঝটকার মাংস শিখেরা খায়। জবাই করে হালাল করা মাংস মুসলমানরা খায়…'

'তুমি চাও না এইসব বিষয় আমি শিখে নিই। একসঙ্গে এত কথা কেউ মনে রাখতে পারে ?' তারপর খানসামার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে লীজা বলে, 'এসব জেনে নেবার পর আমি কি দেখলেই বলে দিতে পারব—এ হিন্দু, ও মুসলমান ? একটা কোনো চিহ্ন ছাড়া দেখে কেউ বাতলাতে পারবে ?' তারপর লীজা হেসে বলল, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি—এদের নিজেদেরই বলবার ক্ষমতা নেই—কে হিন্দু আর কে মুসলমান। আর রিচার্ড, তুমিও ঠিক বলছ না। তোমারও ধরবার ক্ষমতা নেই।'

লীজা এবার খানসামার দিকে ফিরে বলল, 'খানসামা, তুমি মুসলমান ?'

'জী, মুসলমান। মেমসাহেব!'

'তুমি হিন্দুদের মারবে ?

শুনে হকচকিয়ে গিয়ে খানসামা একবার মেমসাহেবের দিকে, আরেকবার মুচকি মুচকি হাসতে-থাকা সাহেবের দিকে চাইল। তারপর এগিয়ে আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে একটা খণ্ডা সাহেবের দিকে বাড়িয়ে পেছনের অন্ধকারে সরে গিয়ে দাঁড়াল। খণ্ডার মধ্যে ছিল একটা কাগজ। সাহেব সেটা তুলে নিয়ে খুলে পড়লেন। তারপর ভাঁজ করে খণ্ডার ওপর রেখে দিলেন।

'কী জিনিস, রিচার্ড ?'

'শহর-সংক্রান্ত রিপোর্ট, লীজা।' আস্তে আস্তে কথাটা শেষ করে রিচার্ড ফের তার চিন্তায় ডুবে গেল।

'কী ধরনের রিপোর্ট, রিচার্ড ?'

'শহরের হালচাল সম্পর্কিত। তুমি তো জানো, রোজ সকালবেলায় তিন-চারটি মহকুমা থেকে আমার কাছে রিপোর্ট আসে—পুলিশ সুপার, হেল্থ্ অফিসার, সিভিল সাপ্লাইয়ের অফিসার—এদের কাছ থেকে। কিছু মনে করো না,...বলে রিচার্ড খাবার-ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

লীজা কিছুক্ষণ থতমত খেয়ে বসে থাকল। রিচার্ডের তখনও কফি খাওয়া হয়নি। লীজা কফি খেয়ে নেবে, না রিচার্ডের জন্যে বসবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এমন সময় অল্পক্ষণের মধ্যেই রিচার্ড ফিরে এল।

'ওটা কার রিপোর্ট ছিল, রিচার্ড ?'

'পুলিশ সুপারের।' বলার পর রিচার্ড লীজাকে আশ্বস্ত করল এই বলে—কোনো হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়, রোজকার মামুলি রিপোর্ট।'

কিন্তু লীজার মনে হল, রিচার্ড কিছু একটা লুকোচ্ছে।

'কিছু একটা আছে, রিচার্ড। আমার কাছে চেপে যাচ্ছো।'

'লুকোবার আছে কী, লীজা, যে তোমার কাছে লুকোব ? শহরের হাল নিয়ে তোমারই বা কী, আমারই বা কী—কেন আমি চাপতে যাব ?'

'তবু একটা কিছু আছে। এস্-পি কী লিখেছে,...কী ?'

'এইটুকুই শুধু লিখেছে যে, শহরের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দুস্থানের নানা জায়গাতেই এই তেতে-ওঠার ভাব ফুটে উঠছে।'

'এখন কী করবে তুমি, রিচার্ড ?'

'আমার করতে চাইবার কী আছে, লীজা ? শাসন করার কাজ আমার, শাসন করব। আর কী ?'

লীজা মুখ তুলে তাকাল।

'আবার তুমি ঠাট্টা শুরু করলে, রিচার্ড ?'

'ঠাট্টা করছি না আমি। যদি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়, আমি কী করতে পারি ?'

'ওদের ঝগড়া মিটেয়ে দেবে না ?'

রিচার্ড হেসে কফিতে চুমুক দিয়ে সহজভাবে বলল :

'আমি ওদের বলব, ধর্মের ব্যাপারটা তোমাদের নিজেদের। তার জট তোমরা নিজেরা খুলবে। সে ব্যাপারে সরকার তোমাদের সব রকম ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'ওদের এটাও তোমাদের বলতে হবে যে, তোমরা একই জাতির মানুষ, নিজেদের মধ্যে লড়াই করাটা ঠিক নয়। এই কথাই তো আমাকে তুমি বুঝিয়েছিলে, রিচার্ড !'

রিচার্ড কিছুটা ঠাট্টার ভাব নিয়ে বলল, 'আলবৎ বলব, লীজা।'

দুজনেই চুপচাপ বসে কফিতে চুমুক দিতে লাগল। এরপর হঠাৎ লীজার মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠল ঃ

'তোমার কোনো আপদ বিপদের ভয় নেই তো, রিচার্ড ?'

'না, লীজা। প্রজারা যদি নিজেরা নিজেরা লড়ে মরে শাসকদের ভয়টা কী ?'

কথাটা লীজার হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় ওর চোখে রিচার্ডের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব উথলে উঠল।

'তুমি ঠিক বলেছ। কত কী খবর রাখো। সত্যি, কম বিজ্ঞ মানুষ নও তুমি। আমি এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জ্যাকসনের স্ত্রী একবার আমায় বলেছিল এদেশী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে জ্যাকসন রিভলবার হাতে নিয়ে একা তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিল। জ্যাকসনের স্ত্রী ছিল গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে। দেখে সে তো ভয়েই মরে। কোথা থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না। তুমি একবার ভাবো রিচার্ড—হাজারটা লোক আর সেখানে জ্যাকসন একা। কী না ঘটতে পারত !'

'তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, লীজা।' বলে লীজার একটু গাল টিপে দিয়ে রিচার্ড বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

প্রভাতফেরীর লোকজন যখন গলি পেরিয়ে ইমামদীনের মহল্লায় পেঁাছুল তখন অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করেছে। রাস্তায় শেরখানের ঘর থেকে ঝাঁটা, কোদাল, কড়াই আর ঝাড়পোঁছের অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে তারা এগিয়ে চলল। সকালের আলোয় তাদের এলিয়ে-পড়া ক্লান্ত, ফ্যাকাসে চেহারা স্পষ্টভাবে চোখে পড়তে লাগল। মেহতাজী ছাড়া প্রায় আর সবারই জামাকাপড় ছিল ময়লা, কোঁচকানো। বক্সীজীর মাথার গান্ধী টুপি একদিকে এমনভাবে চেপে বসেছিল যেন একটা ভারী বোঝা এইমাত্র মাথায় এসে ছিটকে পড়ছে। শংকর, রামদাস মাস্টার আর আজীজের ঘাড়ের ওপর তোলা ঝাঁটা, দেশরাজ আর শেরখানের হাতে কড়াই। জার্নাইল একটা লম্বা বাঁশ উঠিয়ে নিয়েছিল। দিনের আলোয় ঝাঁটা হাতে নিয়ে রামদাস মাস্টারের সলজ্জ সসংকোচ ভাব ফুটে উঠেছে।

'ব্রাহ্মণের হাতে ঝাঁটা উঠিয়েছ, হে গান্ধী মহারাজ ! কম কথা ? হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের হাতে ঝাঁটা তুলে দিয়েছে !' এই বলে মিটমিট করে হাসল। ঝাঁটাটা সে পিঠের আড়াল করে রেখেছিল। ওর কথা শুনে আশপাশের কেউ কিছু না বলায় রামদাস মাস্টার চেঁচিয়ে বক্সীজীকে ডেকে বলল :

'নর্দমা পরিষ্কারের মধ্যে আমি নেই। আগেই বলে দিলাম।'

'কী তোমার এমন পাখনা গজিয়েছে ?'

'নালা সাফ করবার কি এখন আমার বয়েস আছে ?'

'কেন, গান্ধীজী নিজে হাতে পায়খানা সাফ করতে পারেন আর তুমি নালা সাফ করতে পারবে না ?'

'আমি নিচু হতে পারি না, নিচু হলে মাজা ব্যথা করে। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমার পেটে পাথরি হয়েছে।'

'যখন গরুর জাবনা মাখো তখন বুঝি পাথরির কষ্ট থাকে না। জনসেবার কাজ করতে গেলেই যত তোমার পাথরি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।'

সেই সময় শংকর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল :

'মাস্টারজী, আমার কাজ প্রচারের। সত্যি বলতে কি, কার অত ঠেকা পড়েছে যে নালা সাফ করবে। বেশ! আমি নালা সাফ করছি, তুমি কড়াইতে করে ময়লা ওঠাও।'

প্রভাতফেরীর লোকেরা কিছুদূর গিয়ে একটা গলির মধ্যে পড়ল।

'এ কোন্‌খান দিয়ে যাচ্ছ তোমরা?'

পেছন থেকে হঠাৎ গোঁসাইজী চেঁচিয়ে বললেন। মিছিলের সামনে থাকা দেশরাজ ডানদিকে মোড় নিয়েছিল। তার দেখাদেখি দলের সবাই সেদিকে এগোতে লাগল।

বক্সীজী হাঁ-হাঁ করে উঠে বললেন, 'বারণ করো ওদের, বারণ করো! সকালবেলায় ওদের নমাজ পড়ার সময়। এ সময় মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার দরকারটা কী?'

'ও কাশ্মীরী!' বক্সীজী চেঁচিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা সব ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এদিককার মসজিদের সামনে দিয়ে যেতে কে বলেছে তোমাদের? সবসময় তোমরা নিজেদের মর্জি মতন চলো।'

কাশ্মীরী দাঁড়িয়ে গেল।

'শেরখান আর দেশরাজ ওদিকে চলে গিয়েছিল। ওদের দেখাদেখি আমিও গিয়েছিলাম। ঠিক আছে বক্সীজী, মসজিদের সামনে গিয়ে আমরা গান বন্ধ করে দেব।'

'না, না গিয়ে কাজ নেই। দেখছ না, গতিক তেমন সুবিধের নয়? তোমরা ওখান থেকে ফিরে এসে পেছনের গলি দিয়ে সোজা চকের দিকে যাও। তারপর বড় রাস্তা পেরিয়ে ইমামদীনের মহল্লায় চলে যাবে।

দলের লোকজন ফিরে এসে বাঁ দিকের সরু গলিটা পেরিয়ে কিছুক্ষণ পর ইমামদীনের মহল্লার কাছে গিয়ে পৌঁছুল। এটা প্রভাতফেরীর রাস্তায় পড়ে না। বলতে কি, শহরতলীর পুরনো বস্তিগুলোতে প্রচারের কাজে কংগ্রেস বিশেষ যেত না। কমিটির মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাও তাদের পক্ষে দূর হত। কমিটির ময়দানের ধারে পূর্বদিকের একপ্রান্তে ইমামদীনের মহল্লা।

চৌমাথার পাশে একটা জায়গায় প্রভাতফেরীর লোকজনেরা এসে দাঁড়াল। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা হাতে কাশ্মীরীলাল মাথাটা তুলে তারস্বরে আওয়াজ দিল :

'ইনক্লাব!'

সবাই সোৎসাহে তাতে সাড়া দিল :

'জিন্দাবাদ।'

'বোলো ভারতমাতা কী…জয় !'

শ্লোগান শুনে পাড়ার বাচ্চারা ছুটতে ছুটতে ঘরের বাইরে এল। বাড়ির বউরা চটের পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিতে লাগল। লাল ঝুঁটিওয়ালা এক মোরগ লাফিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে একটু থেমে তারপর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে 'কোঁকড় কো…কোঁকড় কো' শব্দে ডেকে উঠল। মনে হল, সে যেন সারা পাড়ার হয়ে শ্লোগানে সাড়া দিচ্ছে।

'তোমার চেয়ে তো এই মোরগও ঢের ভালো, কাশ্মীরী! দেখলে, কি রকম জোড়সে শ্লোগানে সাড়া দিল ?' শেরখান বলল।

শংকর ফোড়ন কেটে বলল, 'কেন? কাশ্মীরী কম কিসে? কাশ্মীরী হল কংগ্রেসের মোরগ।'

'তুইও কাশ্মীরী মাথায় লাল টুপি লাগিয়ে নে। শুনুন বক্সীজী, ওর মাথায় একটা লাল টুপি চড়িয়ে দিন, ওকে অবিকল কুঁকড়োর মতো দেখাবে…'

শহুরে তামাসার এই ধরন। মওকা পেলেই বন্ধুরা এইভাবে পরস্পরের পেছনে লাগবে।

'হয়েছে, ঢের হয়েছে। এবারে সব কাজ শুরু করো।' বক্সীজী চৌমাথায় লণ্ঠন রাখতে রাখতে বললেন।

অধিকাংশ বাড়িই একহারা একতলা। বিস্তর বাড়ির দরজায় চটের পর্দা ঝুলছে। সামনে খোলা মাঠ পেরিয়ে সমান্তরাল দুটো কাঁচা গলি। একটা গলিতে নর্দমা ছিল বটে, কিন্তু সেটা কাঁচা নর্দমা। অন্য গলিটাতে কখনও নালা খোঁড়াই হয়নি। গলিটা জুড়ে ডাঁই হয়ে ছিল আঁস্তাকুড়ের ময়লা। ঘরের বউরা কেউ একটা কেউ দুটো করে ঘড়া মাথায় চাপিয়ে কল থেকে জল আনতে যাচ্ছে। এক জায়গায় একটা ছেলে মোষের পেটের তলায় বসে গোবর তুলছিল। চকের কাছে মাঠের মধ্যে দুটো বাচ্চা মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের সংগে কথা বলতে বলতে পায়খানা করছিল।

'তোর গু এত পাতলা কেনরে?'

'আমি ছাগলের দুধ খাই। তুই কী খাসরে?,

মাঠের আরেক কোণে খাড়া করা ছিল একটা তন্দুর। সেখানে পোঁছে মনে হচ্ছিল যে, প্রভাতফেরীর লোকগুলো যেন গলির রাস্তা দিয়ে হঠাৎ কোনো গাঁয়ে এসে পড়েছে।

বক্সীজী বললেন, 'কোদাল হাতে নিয়ে এবার সব কাজে লেগে যাও।'

মেহতা আর রামদাস মাস্টার কড়াই নিয়ে উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। শংকর আর কাশ্মীরীলাল হাতে কোদাল তুলে নালা সাফ করতে চলে গেল। শেরখান, দেশরাজ আর বক্সীজী ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট দিতে লেগে গেলেন।

আশপাশের লোকেরা বুঝতেই পারছিল না এসব কী হচ্ছে। টাঙ্গা হাঁকানো এক সহিস ঘর থেকে বেরিয়ে ময়দানের ধারে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। বক্সীজীকে ঝাঁট দিতে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ছুটে গেল বক্সীজীর কাছে।

'বাবুজী, কেন আমাদের লজ্জায় ফেলছেন? আমাদের ঘর কেন আপনি এসে ঝাঁট দেবেন? দিন, আমাকে ঝাঁটাটা দিন।'

'তা কেন, এটা আমাদের কাজ।' বক্সীজী জবাব দিলেন।

'হে ধর্মাবতার, তা কখনও হয়? আপনি লেখাপড়া-জানা লোক। আমরা হলাম আপনাদের ঝাড়ুদার। অন্য রকম ভাবলেও পাপ। দিন, আমাকে দিন। কেন আমাদের মিছিমিছি নরকে পাঠাবেন?...'

ওর ব্যবহার বক্সীজীর খুব ভাল লাগল। কংগ্রেসের প্রচারে কাজ হচ্ছে। ওঁর মন বলল, 'জনসেবার এটাই তো লক্ষ্য! নইলে অন্য আর কী?'

কাশ্মীরীলাল আর শংকর কোদাল নিয়ে ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া হড়হড়ে পাঁক বার করে আনছিল। সেই নালা খোঁড়ার পর থেকেই তাতে পচা জল সমানে জমেছে আর এখন তার গর্তে পাঁক জমে জমে ছাতা ধরে নীল হয়ে আছে। যতক্ষণ নালার মধ্যে জমাট হয়ে ছিল, ততক্ষণ গন্ধের বালাই ছিল না। যেই শংকর আর কাশ্মীরীলাল তাতে কোদাল চালিয়ে নালার ধারে ধারে ঢিবি করে পাঁক ফেলতে শুরু করল, অমনি ঝাঝালো দুর্গন্ধে নাকের ভেতরটা ফেটে যাবার উপক্রম হল। আর উদ্বাস্তু মশাগুলো নালা থেকে উড়ে উড়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নর্দমাটা কমসে কম এক ফুটের মতো গভীর ছিল আর উপচে পড়া পাঁকে নালার ওপর পর্যন্ত থিকথিক করছিল।

'হে রাজা, হে বাদশা! কেন আমাদের ওপর জুলুম করছ?

ছাদ-সংলগ্ন পাঁচিলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দাড়িয়ে কলপ-দেওয়া একজন বয়স্ক লোক বলল:

'এখানে যে রোগের ডিপোগুলো তুলে তুলে ফেলে যাচ্ছ, কে তার নিকাশী করবে? নালাতে যেমন ছিল তেমনি থাকতে দিলে তবু অন্তত একজায়গায় থাকত। এখন জায়গায় জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ল। ফলে, আগের চেয়েও ঢের বেশী দুর্গন্ধ ছড়াবে...'

বক্সীজী দূর থেকে এসব দেখছিলেন। এবার কোমর সোজা করে দাঁড়ালেন। উনি শংকর আর কাশ্মীরীলালের ওপর খুব চটলেন। 'এইসব ছোকরাদের মাথায় কখনও কিছু ঢুকবে না। উনি আপন মনে বললেন, 'আরে বাবা, গঠনমূলক কাজের উদ্দেশ্য তো আর এ নয় যে, সত্যি সত্যি তেড়েফুঁড়ে নালা সাফ করতে লেগে যাবে! এর উদ্দেশ্য হল, লোকের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার একটা বোধ জাগানো। আর সেইসংগে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আগ্রহ।'

এরপর বয়স্ক লোকটি যা বলার ব'লে পাঁচিলের আড়ালে চলে গিয়েছিল। আর তখন বক্সীজী আবার উঠোনে ঝাঁটা বুলাতে শুরু করলেন। এরপরই সামনের গলি থেকে আপাদমস্তক সাদায় মোড়ানো এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে তসবী। বোঝা গেল, উনি মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। পরনে সাদা সালোয়ার, গায়ে সাদা কুর্তা, তাতে চড়ানো ওপর-খোলা নতুন ধরনের এক ফতুয়া। মাথায় মুর্শেদী লুংগির শিরপেঁচ। তাঁর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল

মানুষটি খুব ধর্মপ্রাণ। এদের ঝাঁট দিতে দেখে আর নর্দমা পরিষ্কার করতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। এরপর ঝাড়ু হাতে ধুলো মাটি মেখে ভূত সাজা রামদাসকে দেখে বৃদ্ধ বললেন :

'আমাদের ঘাড়ে কৃতজ্ঞতার ঋণের বোঝা চাপাবার জন্যে এসেছ বুঝি?' ওকে দেখে মনে হল সেবার কাজ তাঁর মনে ছাপ ফেলেছে। তিনি বলতে লাগলেন :

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! বাহ্, বাহ্!' এরপর তিনি একবার উঠোনে, একবার গলিতে, একবার নর্দমার কাছে দাঁড়ানো প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকের ওপর তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বেশ কয়েকবার বললেন, 'আহা, বাছারা! আল্লা তোমাদের আনন্দে রাখুন। বড় দিল্ তোমাদের ধন্যবাদ হ্যায়!'

বৃদ্ধকে কথা বলতে দেখে বক্সীজী ঝাঁটা হাতে তাঁর কাছে এসে বললেন, 'দাদাজী আমরা সাফ করার কে? কীই বা আমাদের ক্ষমতা!' বক্সীজীর কথা শুনে বৃদ্ধ প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'গলি সাফ করাটা বড় নয়। এর ভেতরকার প্রেরণাটাই বড়।' তারপরে 'ঈশ্বর! ঈশ্বরই আসল' বলতে বলতে প্রসন্ন মুখে আপাদমস্তক সাদায় মোড়া সেই বৃদ্ধ পাড়া থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মসজিদের দিকে চললেন। বৃদ্ধের মুখে জনসেবার কাজের প্রশংসা শুনে বক্সীজী ভারি খুশি হলেন। তাঁর মনে হল তাঁদের আজকের কাজ সার্থক হল।

শেরখান হেসে বলল : 'ওই মেহতাজী আর আজীজকে দেখ, ওরা দুজনে ঝাঁটা স্পর্শও করে নি। মেহতাজীর আবার কাপড় নোংরা হবার ভয়।'

বক্সীজী সেদিকে ফিরে দেখলেন মেহতা একটা একটা করে কাঁকর বেছে কড়াইতে গুছিয়ে রাখছিলেন। তাঁর হাত একেবারেই ময়লা হয়নি। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে তুলে কড়াইয়ের কাছে এসে আলতো করে ধ'রে কাঁকরগুলো তিনি সাজিয়ে রাখছিলেন। অন্যদিকে রামদাসের গোঁফ আর চুল তখনই মাটিতে আদ্যোপান্ত ঢাকা পড়ে গেছে।

আশপাশে বাচ্চারা ছাড়াও আরও অনেকের ভিড় জমে গিয়েছিল। চটের পর্দার আড়াল থেকে ঘরের মা-বউরা, ছাদের ওপর ইতস্তত দাঁড়ানো পুরুষ মানুষেরা সবাই ওদের কাজ দেখছিল।

জার্নাইল হাতে লম্বা বাঁশ নিয়ে এতক্ষণ চকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে হেঁটে নালা সাফ করার লোকজনদের কাছে এল।

জার্নাইল মিলিটারি কায়দায় জিজ্ঞেস করল, 'নালী খুলতে হবে। বাঁশ লাগাব?'

শুনে আশেপাশের লোকেরা হেসে উঠল।

শংকর মাজা সোজা করতে করতে কাশ্মীরীলালকে বলল, 'এসব জনসেবার কাজ নেহাৎই পণ্ডশ্রম। নর্দমা পরিষ্কার করে কখনও স্বরাজ আসবে না।'

শঙ্কর আর কাশ্মীরী দুজনেই ঘেমে নেয়ে গেছে। নালার পাড়ে তিন জায়গায় তারা কাদার ঢিবি তুলেছে।

বক্সীজী গলির মাঝামাঝি এসে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শঙ্করের

কথা শুনতে পেয়ে বললেন, 'বেশি বকবক করো না, শঙ্কর। মনে হচ্ছে তোমার ঘটে বুদ্ধি ধরছে না। গান্ধীজী হলেন নেহাৎ নাবালক। তাই আমাদের সবাইকে চরকা কাটতে আর জনসেবার কাজ করতে বলেন।'

'করছি, সেবার কাজই তো করছি। তাছাড়া করছিটা কী? তবে এসব কোনো কাজের কাজ নয়।'

বক্সীজী সাতসকালে শঙ্করের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে চাইছিলেন না। কেন না শঙ্কর বড্ড ঠোঁটকাটা। তা সত্ত্বেও তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না।

'একটু বোঝবার চেষ্টা করো, শঙ্কর। এটা আমাদের দেশভক্তির চিহ্ন। এর ভেতর দিয়েই আমরা গরিবদের স্তরেও নেমে আসতে পারি। নইলে তুমি কি পাতলুন পরে গরিবদের মধ্যে কাজ করতে যাবে? যেতে হবে ঝাঁটা হাতে, খদ্দর পরে। তবেই ওরা আমাদের আপন মনে করবে।'

শঙ্কর বলল, 'জনসেবার কাজ শুরু করার পর থেকেই সব আন্দোলন মিইয়ে গিয়েছে। এখন শুধু লাগাও ঝাড়ু আর কাটো চরকা'—বলে শঙ্কর আরো এক কোদাল পাঁক তুলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে জার্নাইল চিৎকার করে বলে উঠল:

'তুমি হলে বেইমান। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে জানি। তুমি কমিউনিস্ট।'

বক্সীজী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন,' ব্যস জেনারেল, ব্যস!' জার্নাইল বলতে শুরু করলে সেও এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। তখন ওকে থামানো দায় হবে।

'শঙ্কর, তুমিও কম যাও না। যখন তখন যা ইচ্ছে তাই বলে দাও, এটা কি বাদ্‌বিতণ্ডা করার জায়গা?' ঠিক সেই সময় একজন লোক কমিটির মাঠের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে, শেরখানের গলি পেরিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকা পাড়ার কিছু লোকের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব বলতে লাগল। লোকটার পরনে ছিল কালো ফতুয়া। তাকে খুব উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। এইভাবে ছুটে আসাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, এখানে এরকমটা হয়েই থাকে। কিন্তু লোকটা যে রকম একটা ভাব দেখিয়ে ছুটে এসেছিল, তা আশপাশের লোকদের একটু যেন অস্বাভাবিক ঠেকছিল। দেখতে দেখতে ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনেরা ওখান থেকে সরে পড়ল। থেকে গেল শুধু ছোট ছোট বাচ্চার দল। মুহূর্তের মধ্যে চটের পর্দার আড়াল থেকে বাড়ির মেয়েরা সব হাওয়া হয়ে গেল। শুধু একটা বাড়ি থেকে একজন মা তীরবেগে বেরিয়ে এসে হেগুড়ে দুটো ছেলের একটাকে নড়া ধরে টানতে টানতে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল।

চারদিক ছেয়ে ফেলে দিল একটা হতবিহ্বল ভাব। কংগ্রেসের কর্মীরা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না হঠাৎ কী এমন ব্যাপার ঘটল।

আপাদমস্তক সাদা, তস্‌বী হাতে নিয়ে 'আল্লিন্‌' 'আল্লিন্‌' করতে করতে হাসি-হাসি মুখে যে বুড়োকে এর আগে এখান দিয়ে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল,

ঐই সময় দেখা গেল তিনি ফিরে আসছেন। মেহতা আর বক্সীজী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আঁচ করার চেষ্টা করছিলেন হঠাৎ এমন কী হল যে, লোকজনেরা সেখান থেকে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। তারা ভাবলেন বুড়োর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাক কী ব্যাপার। এমন সময় হাতে তস্‌বী ঝোলানো আপাদমস্তক সাদা বুড়ো লোকটি তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন:

'মশাইরা, এখান থেকে চলে যান। নিজেদের ভালো চান তো, এক্ষুনি কেটে পড়ুন।' বলতে বলতে গলার স্বর চড়ে গেল, চোয়াল কাঁপতে লাগল। দেখে মনে হল, তাঁর মুখের সব রক্ত শুষে নিয়ে যেন মাথায় উঠে গেছে।

কথাগুলো যেন মেহতা আর বক্সীজীকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছিল। অন্য কর্মীরাও ছুটে পাশে এসে দাঁড়াল।

'চলে যান এখান থেকে।' বৃদ্ধ বলে চললেন, 'আপনাদের যা করার ছিল ব্যস, চুকে বুকে গেছে। আমার কথা আপনাদের কানে ঢুকছে?' তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠল: 'যা শুয়োরের বাচ্চারা, ভাগ এখান থেকে।' গলা ওঁর সপ্তমে। তারপর সেখান থেকে জোর কদমে চলে গেলেন। চারদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। বক্সীজী আর মেহতা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বক্সীজী ভাবলেন শংকর কিংবা কাশ্মীরীলাল—যাদের মুখের কোনো আগড় নেই—এরাই হয়ত কাউকে এমন কিছু বলেছে যেটা পাড়ার লোকেরা খারাপ লেগেছে। কিন্তু এই বুড়ো লোকটা তো এলেন দেখলাম বাইরে থেকে। যাবার সময় গোড়ায় তো আমাদের তারিফ করতে করতে গেলেন। এর মধ্যে এমন কী ঘটল যে, সেই মানুষ এমন খাপ্পা হয়ে গেলেন!

ঠিক তখনই একটা পাথর উড়ে এসে বক্সীজীর কাছে পড়ল। কাশ্মীরীলাল আর শংকর হতভম্ব হয়ে বক্সীজীকে দেখতে লাগল।

রামদাস মাস্টার এসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? কী ব্যাপার?'

বক্সীজী বললেন, 'চলো, এখান থেকে চলে যাই। কেউ এখানে একটা কোনো গোলমাল পাকিয়েছে। এখানে আসাটাই হয়েছে আহাম্মকি। দেশরাজ গেল কোথায়? ঐ তো আমাদের এখানে টেনে এনেছে।'

এদিকে দেশরাজ তখন এখানে নেই। কেউ জানে না, কখন ও সট্‌কে পড়েছে।

'এর মধ্যে শয়তানি আছে। নিশ্চয় কোনো শয়তানি আছে।

দু তিনটে পাথর ফের একের পর এক উড়ে এসে পড়ল। তার একটা সোজা এসে লাগল রামদাসের কাঁধে।

'এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি, চলো। এখানে আর থাকা নয়।'

কর্মীর দল হুড়মুড় করে সেখান থেকে বেরোতে থাকল।

লম্বা বাঁশ হাতে ধ'রে জার্নাইল চেঁচিয়ে উঠল: 'তোমরা সব হলে কাপুরুষ। তোমাদের কাউকে আমার চিনতে বাকি নেই, আমি এখানে জনসেবার কাজ শেষ করব তবে যাব।'

তার উত্তরে বক্সীজী জার্নাইলকে কড়কে দিয়ে মিলিটারি হুকুমের ঢঙে বললেন :

'ঝান্ডা খোয়া না যায়, জেনারেল ! কোথায় ঝান্ডা ?'

সঙ্গে সঙ্গে জার্নাইল অ্যাটেনশন হয়ে গিয়ে তারপর চটি ঘষটাতে ঘষটাতে চরণীতে রাখা ঝান্ডা তুলে আনতে চলে গেল।

তখনই দুটো পাথর একে একে উড়ে এসে, একটা চরণীর ওপর, অন্যটা জার্নাইলের দাঁড়ানোর জায়গাটাতে এসে মাটিতে পড়ল। সেইসঙ্গে তিনটে লোক সামনের গলি পেরিয়ে গলির মোড়টাতে দাঁড়িয়ে গেল। প্রভাতফেরীর লোকেরা চুপচাপ সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। কাশ্মীরীলাল জার্নাইলের হাত থেকে ঝান্ডাটা নিয়ে নিল। মেহতা যে কড়াইতে কাঁকর বোঝাই করেছিলেন, সেটা ওখানেই উল্টে দিয়ে খালি কড়াই নিয়ে মাঠ পার হতে লাগল। বক্সীজীর হাতে লণ্ঠনটা ঝুলছিল, কিন্তু ওঁর ঘাড়টা ছিল নোয়ানো।

রামদাস মাস্টার বক্সীজীকে জিজ্ঞেস করল, 'কোদাল-কড়াই শেরখানের বাড়িতে রেখে দিয়ে যাব ?'

'এখন যেমন হাঁটছ তেমনি হাঁটতে থাকো। এখানে আর থামাথামি নয়।'

কাশ্মীরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, গলির মাথায় তিন জায়গায় পাঁচ-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে।

মাঠের ওপারে কিছু লোক এসে দাঁড়িয়েছিল। এদের দিকে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

মহল্লা থেকে বেরিয়ে কুতুবউদ্দিনের গলিতে ঢোকার পর রুটিওয়ালার দোকানেও ওরা একই দৃশ্য দেখতে পেল।

যে তিনজন লোক রুটিওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল, তারা ওদের দিকে ফিরে চোখ গোল গোল করে তাকাচ্ছিল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

'কোথাও নিশ্চয় কিছু গড়বড় হয়েছে।' বক্সীজী মেহতাকে বললেন।

'কী জানি, কাশ্মীরী কিংবা শংকর হয়ত পাড়ার কোনো বউ ঝিকে দেখে টিটকিরি দিয়েছে ! আপনিই তো কংগ্রেসে যতসব লোফার ঢুকিয়েছেন।'

'আপনার কথার কী ছিরি, মেহতাজী ? কাশ্মীরী তো সারাক্ষণই নর্দমা সাফ করছিল। উঁহু, এর মধ্যে আর কিছু আছে।'

গলির মোড় ঘুরে পোদ্দার পাড়ায় পড়ে দেখা গেল গলির মাথায় তিন চারজন দাঁড়িয়ে।

'কোথায় চলেছেন, বক্সীজী ? ওদিকে যাবেন না।' বক্সীজীর পূর্বপরিচিত একজন লম্বা আকৃতির পোদ্দার সম্প্রদায়ের লোক এগিয়ে এসে বলল।

'ব্যাপারটা কী ?'

'মোট কথা, এদিকে যাবেন না।'

'একটু খুলে বলোই না, কী হয়েছে ?'

কাশ্মীরী, জার্নাইল আর রামদাস মাস্টার ততক্ষণে বক্সীজী আর মেহতার কাছে এসে পৌঁছেছে।

'এদিকে ঐ গলির বাইরে নজর দিন।'

বক্সীজী সামনের দিকে তাকালেন। গলির বাইরে রাস্তার এপারে একটা মসজিদ ছিল। তাকে বলা হত কেল্যো-র মসজিদ।

'কী এখানে?'

'আপনার চোখে কিছু পড়ছে না? মসজিদের দরজার পৈঁঠের নিচে তাকান।'

মসজিদের পৈঁঠের নিচে একটা কালো-কালো কী জিনিস যেন পড়ে।

'কে যেন শুয়োর মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।'

বক্সীজী মেহতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মনে হল বলছেন: 'দেখলে। আমি বলেছিলাম না, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে?'

সবাই ঘুরে সেইদিকে তাকাল। মসজিদের পৈঁঠের ওপর রাখা কালচে রঙের একটা বস্তা। তার ভেতর থেকে দুটো ঠ্যাং বেরিয়ে আছে। মসজিদের সবুজ রঙের দরজাটা বন্ধ।

রামদাস মাস্টার চাপা গলায় বলল, 'ফিরে যাই চলো, এখানে আর থাকা নয়।'

কাশ্মীরীলাল শুয়োরটার দিকে তাকিয়ে 'ওয়াক্-থু' ক'রে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

তারপর বলল, 'বক্সীজী, চলুন এখান থেকে চলে যাই। সামনেই মুসলমান পাড়া।'

মেহতা বিড় বিড় ক'রে বললেন, এ কোনো দুষ্টুলোকের কাজ।'

'আপনি ঠিক জানেন, ওটা শুয়োর?' মেহতার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'কী জানি, অন্য জীবজন্তুও হতে পারে।'

'অন্য জীবজন্তু হলে কি আর মুসলমানরা এত ক্ষেপত?' বক্সীজী খিঁচিয়ে উঠে বললেন।

জার্নাইলও এতক্ষণ তার ঘন ভুরুর মাঝখান থেকে ছোট ছোট চোখ বার করে মসজিদের দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল:

'এ ইংরেজের কাজ।'

ওর নাকের ফুটো দুটো কাঁপছিল। চিৎকার করে ফের বলল: 'ইংরেজের কারসাজি। আমি জানি।'

বক্সীজী ওকে শান্ত করার জন্যে বললেন, 'তা তো বটেই, জেনারেল—এটা ইংরেজেরই শয়তানি। কিন্তু এখন তুমি চুপ করে যাও।'

রামদাস মাস্টার আবার বলে উঠল, 'পেছনের গলি দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক।'

'তোমরা ভীতুর ডিম। এ ইংরেজের বদমায়েশি। আমি ওদের মুখোশ খুলে দেব।'

এই সময় মেহতাজী ঝুঁকে পড়ে বক্সীজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন:

'এই পাগলটাকে কেন সঙ্গে আনেন? ওর জন্যে সবাই মারা পড়বে। ওকে বার করে দিন কংগ্রেস থেকে।'

রাস্তা দিয়ে কোনো মুসলমান গেলেই মসজিদের সিঁড়িতে চোখ পড়লে প্রথমে সে ঘুরে দেখছে ; তারপরই মুখ ফিরিয়ে কি সব বলতে বলতে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ সামনের রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা টগবগ টগবগ করতে করতে ছুটে চলে গেল। এরপর মসজিদের পাশের রাস্তায় দুড়দাড় করে ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। রাস্তার ওপারে বাঁদিকে বসা কশাইরা টাঙানো খাসিগুলোর গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল। মোহয়ালদের গলিতে তখন ঘরের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বক্সীজী ঘুরে দেখলেন। রামদাস মাস্টার সরে পড়েছিল। দূরে গলির মুখটার দিকে ওকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। খানিকটা দূরে আজীজ আর শেরখানও ওর পেছন পেছন যাচ্ছিল। গলির এখানে ওখানে দু-চারজন করে লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

মোহয়াল-গলির চেনা লোকটি বক্সীজীকে বুঝিয়ে বলল, 'আপনারা বরং এখান থেকে চলে যান, বক্সীজী। আপনারা থাকলে শোরগোল বাড়বে।'

বক্সীজী লোকটির দিকে তাকালেন। তারপর কাশ্মীরীলালকে বললেন :

'বাঁশের মাথা থেকে ঝাণ্ডাটা খুলে নিয়ে গুটিয়ে নাও।' এরপর সেই সজ্জন মোহয়ালটিকে বললেন, 'মরা শুয়োরটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলি ? শুয়োরের লাশ ওখানে যত বেশিক্ষণ থাকবে, উত্তেজনা ততই বাড়বে।'

'শুয়োরের লাশ সরাবেন ?' মোহয়াল চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল। 'আমি তো মনে করি, ওদিকে আপনাদের ঘেঁষাই উচিত নয়।'

'আমি এর সঙ্গে একমত।' মেহতাজী বললেন, 'এর মধ্যে আমাদের মাথা গলানো ঠিক নয়। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

'এখান থেকে চলে গেলেও কি ব্যাপার আরও খারাপের দিকে গড়াবে না ? ভাবছে মুসলমানরা নিজে হাতে ঐ লাশ সরাবে ?

'নিজেরা না ছুঁলেও কোনো মেথর মুর্দাফরাশকে ডেকে আনবে। মোট কথা এর মধ্যে আমাদের মাথা না গলানোই ভালো।'

একটা ঘরের দাওয়ায় বক্সীজী তাঁর হাতের লণ্ঠন রেখে মেহতার দিকে ফিরে বললেন ঃ

'মেহতাজী, আপনি বলছেন কী ? আমরা চুপচাপ এখান থেকে বেরিয়ে যাই আর সেই ফাঁকে উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ুক ? যদি চোখের ওপর না দেখতাম তো সে হত অন্য ব্যাপার।' এরপর কাশ্মীরীলাল আর জার্নাইলকে ডেকে বক্সীজী বললেন, 'তোমরা চলে এসো আমার সঙ্গে।' বলে গলি থেকে বেরিয়ে তিনি মসজিদের দিকে রওনা হলেন।

কাশ্মীরী পড়ল মহা ফাঁপরে—সঙ্গে যাবে কি যাবে না। ইমামদীনের মহল্লায় পাথর ছুঁড়েছিল, এখানে কে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। ওর মাথা ঘামে ভিজে উঠল। ঝাণ্ডার বাঁশ দেয়ালের গায় দাঁড় করিয়ে রেখে ও নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর পায়ে কাঁপুনি ধরল। ততক্ষণে জার্নাইল আর বক্সীজী

রাস্তা পার হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাশ্মীরীও ওদের পিছু পিছু গলি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় পেঁছে পেছন ফিরে দেখেন সজ্জন মোহয়ালটি চলে গেছে। দাঁড়িয়ে আছেন কেবল মেহতাজী। ওঁর মনে হল যেন গোটা গলি খাঁ-খাঁ করছে। বাঁদিকে রাস্তার ধারে যে তিন চারটে দোকান ছিল, সব বন্ধ। দূরে ডানদিকে কুয়োর কাছে একসার দোকান ছিল, একটাও খোলা নেই। কিছু লোক কুয়োর পাশে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে এদিক বরাবর তাকিয়ে আছে। ওর চোখে পড়ল এখানে সেখানে ছাদের ওপর লোক দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের বাড়ির সব দরজাই বন্ধ।

'সবার আগে এই শুয়োরের লাশটা এখান থেকে সরাতে হবে, বক্সী বলছিলেন।

কালো রঙের শুয়োর। কেউ তার ওপর ছালা চাপা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ছালার নিচে থেকে শুয়োরের ঠ্যাং, থুতনি আর ভুঁড়ির কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। মেহতা তখনও গলির মধ্যে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। উনি পড়েছিলেন উভয় সঙ্কটের মধ্যে। শুয়োরটাকে ওখান থেকে সরাতে গেলে যেমন বিপদ, সেই সঙ্গে ছিল তার ধবধবে খদ্দরের কাপড়ে দুর্গন্ধ হওয়ার ভয়। বক্সীজী আর জার্নাইল শুয়োরের ঠ্যাং পাকড়ে লাশটাকে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে মসজিদের সিঁড়ি থেকে নামিয়ে আনলেন। তারপর ওটাকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার ওপারে নিয়ে গিয়ে একটা ইঁটের পাঁজার আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন।

'আপাতত ওটা এখানেই থাক, ওরা মসজিদের দরজা খুলুক, এসো এইবেলা মসজিদের সিঁড়িটা ধুয়ে ফেলি।' তারপর বক্সীজী কাশ্মীরীলালকে বললেন, 'কাশ্মীরী, তুমি এবার পেছনের ধাঙড়-বস্তিতে চলে যাও। ওখানে মিউনিসি-প্যালিটির জমাদাররা থাকে। ওদের পাড়ায় জন দুই লোক পেলে নিয়ে এস। তাহলে ওদের ঠ্যালাগাড়িতে আমরা শুয়োরটাকে তুলে দেব। ঠিক সেই সময় কুয়োর দিকটা থেকে কারো ছুটে পালাবার আওয়াজ শোনা গেল। তিনজনেই ঘুরে দাড়িয়ে দেখল, একটা গরু হুড়মুড় করে ছুটে আসছে। তার পেছনে পেছনে মাথায় ফেট্টি বাঁধা একটা লোক হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে তাকে তাড়া করেছে, খালি গায়ে লোকটার বুকের ছাতি দেখা যাচ্ছিল। গলায় ঝুলছিল তাবিজ। গরুটার গায়ের চামাড়া ছিল মসৃণ বাদামী রঙের মোটা মোটা ত্রস্ত চোখ। ল্যাজ উঁচিয়ে আছে ভয়ে। দেখে মনে হচ্ছিল গরুটা রাস্তা হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছিল। দৃশ্যটা দেখে ওরা তিনজনেই হকচকিয়ে গেল, মাথায় ফেট্টি বাঁধা লোকটার মুখ ঢাকা ছিল। গরুটাকে হাঁকাতে হাঁকাতে রাস্তা পার করে নিয়ে গিয়ে ডানহাতের একটা গলিতে নিয়ে ঢোকাল।

বক্সীজী অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন;

'ভয় হচ্ছে, শহরে এবার চিল-শকুন উড়বে। লক্ষণ খুব খারাপ।' এই সময় বক্সীজীর মুখ আরও ফ্যাকাশে লাগল। মুখ আরও থমথমে।

ছয়

সাপ্তাহিক সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে পুণ্যাত্মা বাণপ্রস্থীজী নিয়মমত আজও মন্ত্র পাঠ করছিলেন। এই মন্ত্রপাঠকে তিনি সৎসঙ্গরূপী যজ্ঞের 'অন্তিম আহুতি' বলতেন, বাছা বাছা এইসব মন্ত্রে আর শ্লোকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভাব ধরা পড়ত। বাণপ্রস্থীজী বছরের পর বছরের চেষ্টায় সভাস্থ সবাইকে দিয়ে এইসব মন্ত্র মুখস্থ করিয়ে নিয়েছিলেন। বেদীর ওপর বসে-বসে, চোখ বুজে, হাত জোড় করে, মাথা নুইয়ে তিনি মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন :

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু সা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ।'

সৎসঙ্গের গোটা জমায়েতে একমাত্র বাণপ্রস্থীজীই সংস্কৃত জানতেন, বেদ বেদাঙ্গ সমস্তই ও'র পড়া ছিল। একেবারে নির্ভুল উচ্চারণে উনি মন্ত্র পড়াতেন। শুনে এও মনে হত যে, প্রত্যেকটি শব্দের তিনি মর্মগ্রহণ করতে পারতেন, কথাগুলো যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসছে। উপনিষদের শ্লোকের পর তিনি গীতার দুটি শ্লোক আওড়ালেন :

'আপূর্যমাণম্ অচল প্রতিষ্ঠম্…'

সভার সবাই সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো গুণগুণ করে বলতে লাগল। কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ করতে না পেরে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই বাণপ্রস্থীজীর পড়া শেষ হয়ে গেলেও সভায় কিছুক্ষণ ধরে গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল। সবশেষে হল শান্তিবাচন। তখন হলসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠ একসঙ্গে গুনগুন করে উঠল। কেননা সে মন্ত্র সকলেরই কণ্ঠস্থ ছিল :

'ওঁ দ্যো শান্তি পৃথ্বী, শান্তিরূপঃ
শান্তিরোষধায়ঃ শান্তি বনস্পতিঃ'

সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন শান্তির লৌকিক প্রভাব গোটা বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল, চারিদিকে ব্যাপ্ত হচ্ছিল শান্তি, আর এই মুক্তকণ্ঠে নিঃসারিত শান্তির ধ্বনি যেন ঘরে ঘরে গিয়ে পেঁাচচ্ছিল। 'অন্তিম আহুতি' তে এসে সবাই বড় আনন্দ পায়। মন্ত্রোচ্চারণের পর গাওয়া হত একটি প্রার্থনাগীত। তাতেও বিশ্বচরাচরের শুভ কামনা করা হত, হাতে তালি দিতে দিতে বাণপ্রস্থীজী গাইতেন ;

'সব পর দয়া করো ভগবান
সব পর কৃপা করো ভগবান… ।'

পুণ্যাত্মাজীর ইচ্ছেতেই সৎসঙ্গের সভায় সাবেকী আরতির গান অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, তাতে 'ম্যায় মূরখ, খলকামী' ধরনের যেসব শব্দ থাকত বাণপ্রস্থীজীর বিচারে তাতে মানুষের মনে হীন ভাবনার উদয় হয়। সেই একই

কারণে জনৈক খান্নাজীর লেখা অনেক গানও বাতিল করা হয়েছিল। তাতে 'হম সব হী পুত্ত কপুত্ত তেরে' ইত্যাদি থাকায় বাণপ্রস্থীজীর অনুমোদন পায়নি।

'অন্তিম আহুতি' শেষ হল। এরপরই সভাভঙ্গ হওয়ার কথা। কিন্তু সভাসদেরা তখনও বসে রইলেন। যিনি সভার আহবায়ক তাঁর একটি জরুরী কথা বলার ছিল। আহবায়ক উঠে শুধু বললেন যে, অন্তরঙ্গ-সদস্যরা যেন সভাভঙ্গের পর দয়া করে একটু থেকে যান। একটা জরুরী বিষয়ে আলোচনা হবে। এই জরুরি বিষয়টা নিয়ে গোড়া থেকেই সভাসদদের মনে একটা খটকা লেগেছিল। বাণপ্রস্থীজীর বক্তব্যেও বারবার তার আভাষ পাওয়া গিয়েছিল। এমন কি যখন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজেই এতটা বিচলিত এবং এতটা আবেগবিহবল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, তার ঠোঁট কাঁপছিল। বিশেষ করে, গলা চড়িয়ে যখন তিনি মর্মভেদী স্বরে এই পঙ্ক্তিগুলো পড়ছিলেন,

ফৈলায়ে ঘোর পাপ যহাঁ মুসলমীন
নেঅমত ফলক নে ছীন লী, দৌলত জমীন নে।'

সুতরাং সবাই জানত, অন্তরঙ্গদের সভায় কী বিষয়ে আলোচনা হবে।

আহবায়কের ঘোষণা শেষ হতেই লোকে উঠে পড়তে শুরু করেছিল। এরপরই তারা সভা ছেড়ে চলে গেল। তারা মন্দিরের সাতটা দরজা দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে বারান্দায় এসে যে যার জুতো পরতে লাগল। ওরা কেউ কেউ মন্দিরে ঢোকার আগে ইচ্ছে করেই ডান পায়ের জুতো এক দরজার সামনে, বাঁ-পায়ের জুতো তৃতীয় বা চতুর্থ দরজার সামনে ফেলে রাখত। তাতে আর পরে জুতো হারাবার ভয় থাকত না। সেইজন্যে বারান্দায় কিছুক্ষণের জন্যে ভিড় লেগে থাকত। সভা থেকে উঠে এসে লোকে দু-চারজনে মিলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আজ তাদের সবার কথারই বিষয় ছিল এই শহরের কী হালচাল। বাণপ্রস্থীজী তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণ দেবার পর তখনও বেদীতে বসে ছিলেন। তখনও তাঁর ভেতরের উত্তেজিত ভাব কাটেনি। তাঁর মুখ তখনও যেন জ্বলছে।

সেই সময় উঠোন থেকে একটা দলকে অন্দর-মহলে আসতে দেখা গেল। বারান্দায় দাঁড়ানো জনকয়েক লোক তাদের দেখে চিনতে পারল। ওরা শহরের অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় সংস্থার চাঁই। ওদের পেছন-পেছন পাঁচ-সাতজন বিশিষ্ট শিখকেও ভেতরে আসতে দেখা গেল। ওরা এসেছে স্থানীয় বড় গুরুদ্বার থেকে। অন্তরঙ্গ-সভায় যোগ দেবার জন্যে এদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অন্তরঙ্গ-সভার বৈঠক শুরু হল। যিনি আহবায়ক তাঁর চেহারা রোগাপটকা হলেও লোকটি খুব তেজী। তিনি শহরের বেগতিক অবস্থার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেন। কিছু উড়ো খবরের বিষয়েও তিনি আলোচনা করলেন। মসজিদের সামনে পাওয়া লাশ সম্বন্ধে কিছু বললেন। তিনি এও বললেন যে, জাম্মা-মসজিদে লাঠি, সড়কি এবং রকমারি সব অস্ত্র অনেকদিন আগে থেকেই জমা করা হচ্ছিল। শহরের হালফিল বিবরণ দেবার পর আহবায়ক সবাইকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেচিন্তে নিজের নিজের অভিমত দেন।

গলার আওয়াজ বাণপ্রস্থীজীর। বেদীর ওপর বসে হাত তুলে গেরামভারী গলায় তিনি বললেন ঃ

'এ বিষয়ের আলোচনা অন্য কোথাও বসে করা দরকার।'

এই বলে বাণপ্রস্থীজী সবাইকে একটি ছোট ঘরে ঢোকালেন। ঘরটাতে মন্দিরের মালপত্র রাখা হত। সেইসঙ্গে কিছু চেয়ার বেঞ্চিও ছিল।

সবাই বসবার পর পুণ্যাত্মাজী ধীর গম্ভীর গলায় বললেন :

'আমরা নিজেদের কেমন করে রক্ষা করব সবার আগে সেটা জানতে হবে। সভার প্রত্যেকে নিজের ঘরে রাখবে এক টিন সরষের তেল আর এক বস্তা কাঁচা বা পোড়া কয়লা। ফুটন্ত তেল শত্রুর গায়ে ঢেলে দিতে পারা যায়। জ্বলন্ত কয়লা ছাদ থেকে ছুঁড়ে মারা যেতে পারে...'

সদস্যরা মন দিয়ে শুনছিল। একেবারেই ঘোরপ্যাঁচহীন কথা। কিন্তু বাণপ্রস্থীজীর মুখ দিয়ে বেরোনোয় কিছু লোক একটু চুপসে গেল। সদস্যদের বেশির ভাগই ছিল ব্যবসাদার, বয়সও বেশী। কিছু ছিল চাকরি বাকরি করা লোক। দু-একজন ছিল উকিল। সকলেরই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তবে বাণপ্রস্থীজীর মতন উত্তেজনা তাদের মধ্যে ছিল না। তখনও পর্যন্ত তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি যে, শহরের অবস্থা সত্যিই অতটা খারাপ। এমন যে, এখনই ঘরে তেলের টিন রাখতে হবে। তখনও তারা মনে করছিল ইতস্তত ছুটকো-ছাটকা দু-একটা ঘটনা ঘটবে। ব্যস, তারপর সরকার তা আয়ত্তে এনে ফেলবে, দুষ্টের দমন করবে এবং কোনোরকম ঝকমারি হতে দেবে না।

এরপর এদের একজন আহ্বায়ককে বলে বসলেন :

'যুবকসমাজ মিইয়ে গেছে। তারা হাত গুটিয়ে বসে আছে। দেবব্রতজীকে আপনারা অন্য কাজে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। আমি মনে করি, যুবকের দল এখুনি লাঠিখেলা শুরু করে দিক। আজই দুশো লাঠি অর্ডার দিয়ে এনে ছেলেদের মধ্যে বিলি করে দিন।'

সভায় উপস্থিত ছিলেন দানবীর প্রধানজী। তিনি শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী। মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি বললেন ঃ

'এর খরচা আমি দেব। আপনারা আজই দুশো লাঠি অর্ডার দিয়ে এনে ছেলেছোকরাদের হাতে তুলে দিন।'

অমনি সবাই সাবাশ-সাবাশ বলে উঠল। সভাস্থ সবাই প্রধানজীর বদান্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। সদস্যদের একজনের গলা শোনা গেল :

'আমাদের হিন্দুদের এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যখন তেষ্টায় ছাতি ফাটার দাখিল হয় তখন আমরা কুয়ো খুঁড়তে ছুটি। আজ যখন বেকায়দার অবস্থা, মুসলমানরা জামা মসজিদে যখন অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম বানাচ্ছে—তখন আমরা ছুটছি লাঠির খোঁজে।

অভিযোগের উত্তর দেন আহ্বায়ক মশাই ঃ

'ও নিয়ে কচলানোর কোনো মানে হয় না। যুবক সমাজ রীতিমত তৎপর। তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমাদের ষোল আনা হুঁশ রয়েছে। বানপ্রস্থীজী স্বয়ং গরজ করে একাজে কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন। পঠনপাঠন আর যাগযজ্ঞ ছাড়াও হিন্দুসংগঠনের পুণ্য কাজে ভক্তিভরে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তবে প্রধানজীর প্রস্তাবকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ওঁর উপুড় হস্তের জোরেই আমাদের বিস্তর কাজ হাসিল হতে পারছে। নিজেদের প্রস্তুত করার কাজে আমাদের এতটুকু ঢিলে দিলে চলবে না।'

বহিরাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি ছিলেন। লাঠির আগায় চিবুক রেখে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে তিনি একেক করে দুটো ঠ্যাংই শেষ পর্যন্ত চেয়ারে তুলে দিয়েছিলেন। এবার তিনি সরু তীক্ষ্ন গলায় শুরু করলেন:

'ফাঁক রেখো না, এ সমস্তই ঠিক। তবে আমি বলি কি, ডেপুটি কমিশনারের কাছে যাও। গিয়ে দেখা করো। ঠিক করো, ডি-সির সঙ্গে দেখা না করে কেউ জলস্পর্শ করবে না। দেখো, এ জল অনেক দূর গড়াবে। ডি-সির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝাও যে, হিন্দুদের সামনে সমূহ বিপদ। তাদের পাশে না দাঁড়ালে তারা ধনেপ্রাণে মরবে।'

বাণপ্রস্থীজী বললেন, 'ডি-সির কাছে যাওয়ার দরকার আছে বৈকি। কিন্তু লালাজী, নিজেদের রক্ষা নিজেদের হাতে।'

'মহারাজ, বাচ্চাদের লাঠিখেলা শেখাবে তো বটেই, সেইসঙ্গে বর্শা আর অসি-চালনা বিদ্যেটাও শেখাও, বেটারা আমাদের সব নয়নের মণি হয়ে উঠুক তবু একেবারে গোড়ার কাজ কিন্তু হবে ডি-সির সঙ্গে দেখা করা। ডি-সিকে গিয়ে বলা হোক, যেন তিনি শহরে কোনো হাঙ্গামা হতে না দেন। ডি-সির ক্ষমতা অনেক। ডি-সি যদি মনে করেন চিড়িয়ারও সাধ্যি হবে না ফড়ফড় করার।

আহবায়ক বললেন, 'আজ রবিবার। ডি-সির সঙ্গে দেখা করা যাবে না।'

'আমি বলি কি, ওঁর বাড়িতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে দেখা করো। কিছু লোক এখান থেকেই সোজা ডি-সির বাংলোয় চলে যাক।'

জবাবে এক শিখ ভদ্রলোক বললেন: 'শুনলাম কারা যেন আগেই ডি-সির সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছে।

'কারা তারা?'

'কিছু কংগ্রেসী, কিছু লীগের লোক আর কিছু শহরবাসী।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

'ওতে কচু হবে। হিন্দু আর শিখ মিলে আলাদাভাবে গিয়ে দেখা করতে হবে। গিয়ে বলতে হবে—দেখ, মুসলমানরা কী শুরু করেছে! সঙ্গে মুসলমান নিয়ে গেলে ডি-সিকে কি সেটা বলা সম্ভব? কংগ্রেসীরা হল যত নষ্টের গোড়া। মুসলমানদের ওরাই আশকারা দিয়ে মাথায় চড়িয়েছে।'

শিখদের ভেতর থেকে একজন বললেন, 'ওদের বজ্জাতি যে মাত্রা ছাড়াচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এই তো শুনে এলাম ওরা একটা গরুও কেটেছে। তারপর

সতী-মায়ের ধর্মশালার বাইরে তার কিছু কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে রেখে গেছে। আমি এ খবরের সত্যাসত্য কিছু জানি না। শুধু আমার কানে এসেছে।'

এই সময় বাণপ্রস্থীজীর মুখ রাঙামুলোর মত রাগে লাল হয়ে উঠল। আর তাঁর রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেল। কিন্তু উনি টুঃ শব্দ করলেন না। চুপচাপ উত্তেজনা দমন করে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

আহ্বায়ক উত্তেজিত হয়ে বললেন: 'গোহত্যা হলে এখানে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ কেউ আর রা কাড়ল না। কথাটা সত্যি হলে, এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। মুসলমানেরা না পারে এমন কাজ নেই।

এরপর শহরের হিন্দু আর শিখদের ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা এবং আত্মরক্ষার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পরিকল্পনা নেওয়ার ব্যাপারে গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'মহল্লা কমিটিগুলোর কী হাল এখন?'

'এখানে মহল্লা কমিটি বানানোর খুব ফ্যাচাং আছে। এই শহরটাই বেটপভাবে তৈরি। সব মহল্লাতেই হিন্দুমুসলমান দুয়েরই বাস। মহল্লা কমিটি বানাবে কী, সঙ্গে সঙ্গে সব খবর মুসলমানদের কানে পেঁছে যাবে। ছাব্বিশের দাঙ্গার পর হিন্দুরা কিছুটা সেয়ানা হয়ে এমন দু-তিনটে পাড়া গড়ে তোলে, যেখানে শুধুই হিন্দু আর শিখেদের বাড়ি। যেমন, নয়া মহল্লা কিংবা রাজপুরা। এ ছাড়া আর সব জায়গাতেই মুসলমান সেঁধিয়ে আছে।'

মহল্লা কমিটি নিয়ে বহুক্ষণ ধরে শলাপরামর্শ হল। একটি উপসমিতিও তৈরি হল। তামাম মহল্লা কমিটির সঙ্গে এই উপসমিতি অবিলম্বে যোগাযোগ করবে। বিপদের সময় যোগাযোগ রাখার বিষয়টা নিয়েও আলোচনা হল।

তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপদেশ দিলেন:

'শিবালয়ের ঘণ্টাঘড়িটাও ভালো করে দেখেশুনে নেওয়া হোক।'

'কেন? কী হবে ওতে?'

'আগে থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বিপদের ঘণ্টা রাত্তিরেই বাজানো হয়ে থাকে। অন্তত সে কাজটা তো হবে। এমন না হয় যে, টানতে গিয়ে দড়িটাই ছিঁড়ে গেল। শেষে দেখা গেল, ঘণ্টাও বাজল না।'

শহরের মাঝবরাবর একটা টিলার ওপর ছিল মন্দির। লোকে তাকেই বলত শিবালয়। আশপাশে অনেক দোকান। ঐ টিলার ওপর ঐ মন্দিরের মাথায় কোনো এক আমলে ঘণ্টাঘড়িটা বসানো হয়েছিল।

বৃদ্ধ বলছিলেন, 'সেও কম দিন আগে নয়। উনিশশো সাতাশ কিংবা তারও আগে।'

তাতে একজনের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল:

'না বাজাই ভালো। ভগবান করুন যেন কখনই না বাজে।'

বাণপ্রস্থীজী চটে গিয়ে বলে উঠলেন, 'ঐ রোগেই ঘোড়া মরেছে। কথায় কথায় বিপদের ভয়ে আঁৎকে ওঠা। এই কারণেই ম্লেচ্ছরা আমাদের টিটকিরি দেয়,

আমাদের ছেলেছোকরাদের 'কেওড়া' আর 'বানিয়া' বলে ডাকে।'

লোকে ফের চুপচাপ হয়ে গেল। উপস্থিত সকলেরই মনের ভাব এক রকমের হলেও, কেউই বাণপ্রস্থীজীর মত অতটা উত্তেজিত হয়নি। মুসলমানেরা নষ্টামি করবে, এটা তাদেরও ধারণা। এ সত্ত্বেও তারা কেউই চাইছিল না যে, একটা কোনো গোলমাল বাধুক। কারণ, তাতে হিন্দু-শিখ দুই সম্প্রদায়েরই ধনেপ্রাণে মারা পড়বার ভয় আছে।

অনেকক্ষণ ধরে উপায় আর ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে বিচারবিবেচনা চলল। কিভাবে আত্মরক্ষা করা হবে আর হাঙ্গামা ঠেকানো যাবে তা নিয়েও আলোচনা হল। নানারকমের প্রস্তাব এল: মহল্লা কমিটি বানানো হোক। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে শহরের সমস্ত হিন্দু আর শিখ সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হোক, সরষের তেল ছাড়াও বালি আর জলের বন্দোবস্ত করা হোক। এইসব গুরুতর আলোচনার মধ্যে গানের ধুয়োর মতো বার বার সেই বৃদ্ধ তাঁর কথাগুলো গুঁজে দিচ্ছিলেন:

'আরে ভাই, ডি-সির কাছে যাও। ডি-সির সঙ্গে দেখা না করা অবধি জলস্পর্শ করবে না। এখান থেকে কিছু লোক সটান ডি-সির কাছে চলে যাও। দরকার হয় তো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।...'

শেষে ঠিক হল, সঙ্ঘের আহ্বায়ক সভার পরে থেকে যাবেন। বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে তেল, কয়লা আর লাঠির ব্যাপারে সদস্যদের জ্ঞাত করা হবে। অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পাহারাওয়ালার কাজে গুর্খা নিয়োগ করতে হবে। শিবালয়ের ঘণ্টাঘড়ি মেরামতের জন্যে সনাতন ধর্মসভার সচিবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। যুবক-সমাজকে সজাগ করতে হবে। এরপর অন্তরঙ্গ-সভায় যে বিশিষ্ট লোকেরা যোগ দিয়েছিলেন, ঠিক হল তাঁরা টাঙ্গায় চেপে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে রওনা হবেন। যাবেন না শুধু বাণপ্রস্থীজী। কারণ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ দেওয়াই তাঁর কাজ। সাধুর শুভ্র বেশ পরা বাণপ্রস্থীজীর এই দুনিয়াদারির ঝামেলায় সংসারী লোকদের গায়ে গা ঘষে বেড়ানো সাজে না।

বাড়ি ফিরে দানবীর প্রধানজী জানতে পারলেন যে, তাঁর ছেলে তখনও ঘরে ফেরেনি। তাঁর ভাবনা হল। এখনই সে ঘূর্ণিঝড়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে নি তো!

প্রধানজী যখন বাড়িমুখো ফিরছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর পনেরো বছর বয়সের ছেলে রণবীর আখড়া-পরিচালক দেবব্রত মাস্টারের পেছন পেছন শহরের একের পর এক সরু গলি পার হয়ে চলেছিল। দেবব্রতর ভারী বুটের শব্দ গলির দেয়ালে দেয়ালে টক্কর দিয়ে ফিরছিল। ও'র পেছনে চলতে চলতে রণবীরের মনে উৎসাহের বান ডাকছিল। সেই সঙ্গে শরীরে জাগছিল শিহরণ। আজ ওর পরীক্ষা হবে। তাতে উৎরোলেই ও পাবে দীক্ষা।

শহরের একটা গলিও সিধে নয়। কিছুটা সোজা গলি কয়েক পা যাওয়ার পরই

ট্যারাবাঁকা আরেকটা গলিতে গিয়ে পড়েছে। দুদিক থেকেই একহারা বাড়িগুলো এমনভাবে ঝুঁকে আছে যে, দেখে মনে হয় তার ভারেই বোধহয় গলিগুলো বেঁকেচুরে গেছে। কখনও কখনও মনে হয় বুঝি কানাগলিতে এসে পড়েছি। সামনে বোধহয় রাস্তা বন্ধ। গলির শেষ মুড়োয় পেঁছে দেখা যাবে ডাইনে বাঁয় অমন একশোটা রাস্তার ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। দেবব্রত মাস্টারের বুট জুতোর কাছে কোনো রাস্তাই অপরিচিত নয়।

রণবীরের বয়স কম থাকায় তার দুচোখে ছিল বিস্ময় আর বিশ্বাসের ঝিলিক। তাতে সেই গভীরতা ছিল না যা বিশেষ রকমের পরীক্ষায় জরুরি হয়। গম্ভীরভাব না থাক, তার উৎসাহে কমতি ছিল না। ছিল মাস্টারজীর কথায় প্রাণ দিতে পারার ক্ষমতা, ছিল তার বজ্রকঠিন সংকল্প!

রণবীর যখন আরও ছোট ছিল, তখন মাস্টারজীর মুখে বীরপুরুষদের কাহিনী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। অনেক কষ্টে বাঁচানো রুটির আধখানা বেড়াল খেয়ে ফেলায় রাণা প্রতাপের অসহায়তার সেই প্রথম উপলব্ধি। শহরের আশপাশের পাহাড়গুলোর ওপর চোখ পড়লেই ওর মনে হত সেখানে যেন চৈতক ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে, হয়ত দেখত কোনো খাড়াইয়ের ওপর ঘোড়ার পিঠে বসে শিবাজী দূরে তুরুক সৈন্যদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন, কখনও দেখত ম্লেচ্ছ সর্দারের সঙ্গে শিবাজী কোলাকুলি করছেন। মাস্টারজী তাকে শিখিয়েছিলেন দড়িতে নানা রকমের ফাঁস লাগাবার কায়দা, দেয়াল বেয়ে কিভাবে বাড়ির ছাদে উঠতে হয়, অগ্নিবাণ আর মেঘবাণের কী গুণ।

'শূন্যে ছোঁড়া অগ্নিবাণ সাঁই সাঁই করে ছুটছে, ঘর্ষণের ফলে তার মুখ জ্বল জ্বল করছে আর তা থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুন। এ রকম অগ্নিবাণ ছোঁড়া হয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধে। হাওয়া ভেদ করে যেতে যেতে এক কুরুসেনা ঢাল দিয়ে তা রুখতে গেলে তার ঢাল ফুটো করে দিয়ে অবাধে ছুটে চলে গেল অগ্নিবাণ। অগ্নিবাণের বিশেষত্বই এই যে, এই বাণ কখনও মাটিতে পড়ে না। এই বাণ ঘুরতে থাকে, সমস্ত রণাঙ্গন চরকি দিয়ে ফেরে, চতুর্দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। কোনো যোদ্ধার কিরীট ছুঁয়ে ফেললে তাতে আগুন ধরে যাবে। রথের ছত্রিতে গিয়ে লাগলে তাতেও আগুন জ্বলে উঠবে। যতক্ষণ না চতুর্দিক আগুনে পুড়ে খাক না হয়, ততক্ষণ অগ্নিবাণের ঘোরার শেষ নেই। শত্রুশিবির জ্বালিয়ে দিয়ে বিজয়ী সৈনিকের মতো নিজেকে জাহির করে, সবার চোখ ধাঁধিয়ে, হাওয়া ফালা ফালা করে চিরে অগ্নিবাণ ফিরে আসে। দেখে মনে হয় হাওয়ায় আগুণ ধরাতে ধরাতে যাচ্ছে ...'

মাস্টারজীর কাছেই রণবীর শুনেছে যে, সব কিছুই বেদে আছে। উড়োজাহাজ বানানোর কলাকৌশল, বোমা বানানোর প্রক্রিয়া। ওঁর মুখ থেকেই সে শুনেছে যোগশক্তির কী মাহাত্ম্য। 'কোনো মানুষের মধ্যে যদি যোগশক্তি থাকে, তাহলে তার কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। হিমালয়ের পাদদেশে এক যোগীরাজ যোগসাধনায় বসেছেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। একদিন ওঁর সমাধিস্থ অবস্থায় এক ম্লেচ্ছ

এল ওঁর সমাধিভঙ্গ করতে। ম্লেচ্ছদের গায়ে দুর্গন্ধ থাকে। তার কারণ, ওরা স্নান করে না, পায়খানা করে হাত ধোয় না, পরস্পরের এঁটো খায়, যথাসময়ে জলশৌচ করে না। এই রকমের এক দুর্গন্ধযুক্ত ম্লেচ্ছ যোগীজীর সামনে এসে ঘুর ঘুর করতে লাগল। ওর অপবিত্র ছায়া পড়ার আগেই যোগী চোখ খুললেন। ওঁর চোখ থেকে ঐশ্বরিক এমন জ্যোতি বেরিয়ে এল যে, তাতে সেই ম্লেচ্ছ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।...

রণবীরের চোখে ম্লেচ্ছের ছবি বার বার ভেসে উঠছিল: পাড়ায় রাস্তার ধারে বসে থাকা মুচি ম্লেচ্ছ; বাড়ির সামনের টাঙ্গার গাড়োয়ান ম্লেচ্ছ; আমার সঙ্গে পড়ে হামিদ, সে ম্লেচ্ছ; গলিতে ভিক্ষেয় বসা ফকির, সে ম্লেচ্ছ। পাড়ায় থাকে এক পরিবার, তারাও ম্লেচ্ছ। বোধহয় ওদেরই ভেতর থেকে এক ম্লেচ্ছ হিমালয়ে যোগীরাজের তপস্যা ভাঙতে গিয়েছিল। আট সতীর্থের ভেতর থেকে একা রণবীরকেই আজ দীক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। দেবব্রতজীকে সবাই ভয় পায়। গায়ে খাঁকি রঙের পোশাক, পায়ে ডবল বুট। খরখরে গলায় কথা বলেন —যাকে তাকে যখন তখন পিটিয়ে দেন। কিন্তু এটা ছিল গুপ্ত পরীক্ষা, একমাত্র যারা দীক্ষা পেয়েছে তারাই এর খবর রাখে—দীক্ষিতেরা কখনই এই রহস্য কারো কাছে ফাঁস করে না।

গলিটা যেন খাঁ খাঁ করছে। এক জায়গায় এসে রণবীরের মনে হল যেন কিছু দূরে গিয়েই গলিটা পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারল কারো বাড়ির ভাঙা দেয়ালের ফাঁক থেকে অন্ধকার যেন ঝাঁকিদর্শন দিচ্ছে।

এক জায়গায় এসে দেবব্রতজী থেমে গেলেন। রণবীর এতক্ষণ উৎসাহের চোটে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। যদিও এই নির্জন গলিতে পেঁছে কিছুটা ভড়কে গেল। লম্বা দেয়ালের গায় ছাই-ছাই রঙের একটা দরজা। দরজাটা ভেজানো ছিল। মাস্টারজী হাত বাড়িয়ে ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

সামনে একটা চওড়া উঠোন। সেটা পার হয়ে একটা কুঠুরি। তার দরজায় চটের পর্দা। উঠোনের বাঁদিকে ইঁট-পাথরের স্তূপ। রণবীরের কাছে জায়গাটা বেয়াড়া ধরনের বলে বোধ হল।

উঠোন পেরিয়ে গিয়ে মাস্টারজী দরজায় ঠকঠক শব্দ করলেন। ঘরের ভেতর থেকে কারো গলা খাঁকারি শোনা গেল। তারপরই কারো পায়ের আওয়াজ!

'আমি দেবব্রত।'

দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের বুড়ো গুর্খা দারোয়ান। দরজা খুলে সে হাতজোড় করল।

ঘরের মধ্যে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ঘরের একধারে একটা খাট, তার ওপর একটা আধ-ময়লা শতরঞ্চি বিছানো। ডানদিকে দেয়ালে হেলান দেওয়া একটা লাঠি। তারপাশে উল্টিয়ে রাখা একটা কলুকে। দেয়ালের গজালে টাঙানো দারোয়ানের খাঁকি রঙের লম্বা গরম কোট। আর তারই সঙ্গে ঝুলছে কালো রঙের খাপসুদ্ধ একটা ভোজালি।

এই সময় বাঁদিক থেকে মুরগিদের কোঁকর-কোঁ শোনা গেল। রণবীর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। একটা বড় খাঁচায় বন্ধ পাঁচ-ছ'টা সাদা রঙের মুরগি।

রণবীরের হাত ধরে মাস্টারজী পেছনের উঠোনে নিয়ে এলেন। জায়গাটা একটু চাপা। পাশেই অন্য একটা বাড়ির উঁচু দেয়াল। গুর্খা দারোয়ান এক হাতে একটা মুরগি আর অন্য হাতে একটা ছুরি নিয়ে পেছনে পেছনে এল।

'এইখানে দেয়ালের পাশে বসে পড়ো, রণবীর! বসে এই মুরগিটা কেটে ফ্যালো। দীক্ষার আগে দেখাতে হবে কেমন তোমার মনের জোর।'

রণবীরের হাত ধরে মাস্টারজী তাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন: 'মনসা বাচা কর্মণা—এই তিন রকমের দৃঢ়তা চাই আর্য যুবকদের। হাতে ছুরি নিয়ে ঐদিকটাতে বসে পড়ো।'

রণবীরের মনে হল হঠাৎ যেন চারদিক শুনশান। একটা ভয়ংকর নিঃশব্দতা চারদিক ছেয়ে গেছে। ডানদিকে ভাঙা ইঁটের মধ্যে জায়গায় জায়গায় মুরগির পালক ছড়ানো। ঢিবির কাছে নিচে একটা পাথরের শিল। মুরগির রক্তে সেটা কালো হয়ে আছে।

'এইখানে বসে পড়ো। তোমার ডান পা দিয়ে মুরগির একটা ঠ্যাং চেপে ধরো।' এই বলে রণবীরের হাতে ছুরি গুঁজে দিয়ে মাস্টারজী ঐ মুরগিটার দুটো ডানা ধরে একটার মধ্যে আরেকটা ঠুসে দিলেন। একটি পাখার নিচে আরেকটি পাখা ঠেসে দিয়ে ওপরের ডানাটা মুড়ে আগের ডানার নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। মুরগি কোঁকর-কোঁ করতে থাকলেও তার ডানা ঝটপট করা বন্ধ হয়ে গেল।

'নাও, বাগিয়ে ধরো'—বলে মাস্টারজী রণবীরের পাশে এসে বসে পড়লেন। 'এবার ছুরি চালাও।'

এদিকে তখন রণবীরের মাথা থেকে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। ওর মুখটা বিশ্রী রকমের ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। মাস্টারজী বুঝলেন ওর গা গুলিয়ে উঠেছে।

'রণবীর!' মাস্টারজী চিৎকার করে উঠে বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে সোজা চড় কষিয়ে দিলেন। রণবীর হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেল, ওর ভীষণ মাথা ঘুরতে লাগল। গুর্খা দারোয়ান তখনও ওর পেছনে দাঁড়িয়ে। রণবীরের কান্না পাচ্ছিল আর সেইসঙ্গে একটা বেজায় অস্থিরতা। কিন্তু চড় খেয়ে ওর বমি-বমি ভাব কিছুটা কমে গিয়েছিল। মাস্টারজী ডেঁটে বললেন:

'রণবীর উঠে পড়।'

রণবীর উঠল। তারপর ভারী ত্রস্ত চোখে মাস্টারজীর দিকে তাকাল।

'কাজটা শক্ত নয়। এস, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মাস্টারজী ডান পায়ের বুট জুতো দিয়ে মুরগিটার ঠ্যাং চেপে ধরলেন। মুরগির চোখ আগে থেকেই বুজে আসছিল। মাস্টারজী তার গলাটা বাঁহাতে ধরে ছুরিটা মাত্র একবার ওর গলায় চালিয়ে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। কয়েকটা ফোঁটা মাস্টারজীর বাঁ হাতেও পড়ল। কিন্তু মাস্টারজী মুরগিটাকে ছাড়লেন না। মুরগির মাথাটা আলাদা হয়ে গিয়ে ওঁর বুটজুতোর কাছে পড়েছিল, কিন্তু মাস্টারজী

বাঁহাত দিয়ে মুর্গির গর্দানের নলী নিচের দিকে করে চেপে রইলেন। সাদা নলীটা বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছিল। মাস্টারজী বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটা চেপে ধরে রইলেন। মুর্গির সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মাস্টারজী জোরে নলীটা চেপে ধরে থাকায় কিছুক্ষণ বাদে মুর্গির দেহ স্থির হয়ে গেল। আর শুধু রক্তে মাখা একমুঠো পালক রণবীরের সামনে পড়ে রইল। মাস্টারজী মুর্গিটাকে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মাস্টারজী গুর্খা দারোয়ানকে বললেন, 'যাও, আরেকটা মুর্গি নিয়ে এস।'

মাস্টারজী দেখলেন ওখানে বসে বসেই রণবীর বমি করে ফেলেছে। আর দুহাত দিয়ে নিজের মাথাটা চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে। মাস্টারজীর মনে হল দিই আরেক থাপ্পর কষিয়ে, কিন্তু কিছু না করে মুখ বুজে বসে রইল। কিছু সময় চুপচাপ থেকে তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিচু গলায় বললেন :

'তোমাকে আরেক বার সুযোগ দেওয়া হবে। যে জোয়ান-পুরুষ মুর্গি মারতে পারে না সে কী করে শত্রুকে নিধন করবে?'

কিছুক্ষণ ধরে হাঁফ ছাড়ার পর রণবীর কিছুটা সুস্থ বোধ করল। পেটের মধ্যে গুড়গুড় করার ভাবটাও আস্তে আস্তে চলে গেল।

'তোমাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর পরেও যদি তুমি মুর্গি কাটতে না পারো তো তোমাকে আর দীক্ষা দেব না।'

মাস্টারজী ঘুরে কুঠুরির ভেতর চলে গেলেন।

পাঁচ মিনিট পর দেবব্রতজী কুঠুরির বাইরে এসে দেখলেন যে, দেয়ালের ধারে একটা মুর্গি ছটফট করছে। আর ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রণবীর তার বাঁ হাত হাঁটুর নিচে রেখে বসে আছে। দেখে মাস্টারজী বুঝলেন যে মুর্গিটা রণবীরের হাতে ঠোঁট ফুটিয়ে দিয়েছে। মুর্গিটাকে সে জখম করলেও তার গলা পুরোপুরি কেটে ফেলতে পারেনি। রণবীর অনেক কষ্টে মুর্গিটাকে বাগিয়ে ধরেই জো-সো ভাবে ওর হেলানো ঘাড়ে ছুরি চালিয়ে দিয়েছিল। আর তারপর ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে দেখে তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়েছিল।

মুর্গিটা বারবার মাটি ছেড়ে ওড়বার চেষ্টা করছিল। দুহাত ওপরে ওঠে আর ধপাস করে আবার পড়ে যায়। নিচে যখন পড়ে তখন ওর পাখা আরও ছেৎরে যায়। ওর গর্দান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত জমির একটা দিকে ছিটিয়ে পড়ছিল। মুর্গি আবারও যেই উঠতে যাচ্ছে, সেই আবারও রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠছে।

যাক, রণবীর উৎরে গেছে পরীক্ষায়।

মাস্টারজী বললেন, 'উঠে এস, রণবীর।'

রণবীর উঠে পাশে এলে তিনি ওর পিঠ চাপড়ে দেন। 'সাবাশ, তোমার মধ্যে দৃঢ়তা আছে। সংকল্প-শক্তি আছে। তবে হাতের জোর তেমন নয়। তুমি এবার দীক্ষার অধিকারী হলে' বলতে বলতে মাস্টারজী মাটির দিকে ঝুঁকে পাথরের শিলের ওপর পড়ে থাকা রক্তে আঙুল ডুবিয়ে রণবীরের মাথায় রক্তের টীকা পরিয়ে দিলেন।

তখনও রণবীর আচ্ছন্নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার মাথা তখনও বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। কিন্তু তার এই অর্ধচেতন অবস্থায় মাস্টারজীর কথায় সে তৃপ্তি-বোধ করল।

আর সব কিছুরই যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। ছোকরার দল তেল গরম করবার জন্যে শুধু বড় কড়াই যোগাড় করে উঠতে পারে নি। জানলার তাকের ওপর তিনটি ছুরি, একটা ছোরা, একটা ছোট মতন কৃপাণ একসঙ্গে করে রাখা হয়েছিল। ঘরের এক কোণে যে দশটা লাঠি রাখা ছিল, তার প্রত্যেকটির মাথা পেতলে মোড়ানো আর লাঠির নিচে লাগানো লোহার পেরেক। দেয়ালের গায়ে একসঙ্গে তিনটি তীর-ধনুক টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। বোধরাজ শুয়ে শুয়ে তীর ছুঁড়তে পারত। শব্দভেদী বাণ মারতে পারত। আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে তীর ছুঁড়তে পারত। দোলানো অবস্থায় দড়ি তাক করে বাণ মারতে পারত। তীরের আগায় লাগাবার জন্যে সে ধাতু দিয়ে তেকোণা ফলক বানিয়ে নিয়েছিল। আর সে তার সঙ্গীসাথীদের এর উপযোগিতা বোঝাবার জন্যে বলেছিল, এর ফলায় যদি সেঁকো-বিষ মাখিয়ে নাও তবে এটা হয়ে যাবে বিষবাণ। আর যদি এর মধ্যে গন্ধওয়ালা কর্পূর লাগাও তাহলে পেয়ে যাবে অগ্নিবাণ। যেখানে লাগাও সেখানেই আগুন ধরবে। আর যদি গন্ধকচূর্ণ লাগাও তাহলে যেখানে লাগবে সেখান থেকেই বিষাক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে আসবে।

ধর্মদেব কোথাও থেকে খালি কার্তুজের একটা পেটি তুলে এনে সেটাও দেয়ালে লটকে দিয়েছিল, যাতে সবদিক থেকে দেখলে ঘরটাকে একটা অস্ত্রাগার বলে মনে হয়। রণবীর ঘরের ভেতরের দরজার মাথায় বড় বড় অক্ষরে 'অস্ত্রাগার' শব্দটা লিখে রেখেছিল।

কিন্তু তেলের বিষয়ে বাণপ্রস্থীজী যে ফতোয়া পাঠিয়েছিলেন সেটাকে কাজে পরিণত করা যায়নি। যুবক সঙ্ঘের সদস্যদের কারো বাড়িতেই এতবড় কড়াই ছিল না যাতে একসঙ্গে এক ক্যানেস্তারা তেল ফোটানো যায়। তেলের যে টিনটা যোগাড় করে আনা হয়েছিল সেটা একদিকে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছিল। এর জন্যে সমস্ত যুবকের কাছ থেকে চার আনা করে পয়সা তুলে বাকি পয়সা পরে আদায় করে দেওয়া হবে—দোকানীকে এই আশ্বাস দিয়ে তার ঘর থেকে তেলের টিনটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। তেলের কড়াই মন্দিরেও খোঁজ করে পাওয়া যায়নি। অথচ আগে মচ্ছবে লোক খাওয়ানো হত।

সেই সময় সংগঠনের নেতা বোধরাজ একটা প্রস্তাব দেয় যে, হালুইকরের দোকান থেকে কড়াই আনা যেতে পারে।

'কিন্তু ওর দোকান তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হালুইকর থাকে কোথায়?'

'ও থাকে নয়ামহল্লায়।'

'তোমরা কেউ ওর বাড়ি চেনো?'

বোধরাজ জানত যে সে কোথায় থাকে। কিন্তু দলের নেতা হওয়ায় সে এই সময় এরকমের ছোলেট কাজে নিজের মাথা গলাতে চাইত না।

তখন রণবীর এগিয়ে এসে বলল, 'দোকানের তালা ভেঙে ফেলে দাও।'

শুনে ছোকরাদের গা সির সির করতে লাগল। তবে প্রস্তাবটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল।

দলের নেতা কিছুক্ষণ চোখ ওপরে তুলে কড়িকাঠ গুনলো। দল চালানো একটা ছেলেখেলা ব্যাপার নয়। এর দায়িত্ব খুব। তালা যে ভাঙবে, তার ধরা পড়লে চলবে না। কেউ যেন তাকে দেখে না ফেলে। নেতা হল কমিশনারের অপিসের বাবু মস্তরামের ব্যাটা। স্থানীয় কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। এদের মধ্যে সেই একমাত্র দু-পকেটওয়ালা ফৌজী কামিজ পরে।

'ঠিক আছে, ভাঙো তালা। কিন্তু কাজটা করতে হবে লুকিয়ে। বলো, কে যাবে তালা ভাঙতে?'

রণবীর এগিয়ে এসে বলল, 'আমি ভাঙব।

নেতা একবার রণবীরকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল।

'তুমি মাথায় বেঁটে। ওপরে তালা দেওয়া থাকলে তোমার হাত যাবে না।'

'না, না। তালাগুলো আছে নিচে। আমি দেখেছি। বেশ কয়েকবার দেখেছি।'

রণবীরের বড় বেশি বাক্‌ফাট্টাই। নেতার সেটা ভালো লাগে নি। তবে চোস্ত ছেলে। যেমন চটপটে তেমনি তেড়েফুঁড়ে কাজ করে। তবে ওর একটু রাশ টেনে রাখা দরকার।

নেতা মনে মনে জানত যে, যেখান থেকেই হোক রণবীর ঠিক কড়াই আনবে। কিন্তু বেপরোয়া হয়ে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে, কোথাও হয়ত এমন কোনো ভুল করে বসল যাতে সকলে বিপদে পড়ে যাবে।

নেতা ফতোয়া দিল: 'তুমি আর ধর্মদেব দুজনে মিলে যাও। মনে রেখো, তালা ভেঙে তোমাদের কড়াই আনার কথা কেউ যেন ক্ষুণাক্ষরেও জানতে না পারে। রাস্তা যখন ফাঁকা হয়ে যায় সেই সময় যাবে। তাই বলে দুজনে একসঙ্গে হয়ে নয়। যাবে আলাদা আলাদা ভাবে।'

হালুইকরের দোকানটা ছিল চৌরাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকে। দোকানের পেছনে রণবীর একটা নড়াচড়ার আভাষ পেল। হালুইকরের সাদা পাগড়ি। তার মানে, হালুইকর এসে গেছে। এবার দোকান খুলবে। হালুইকর দোকানের পেছনে রয়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছেটা কী? লোকটা হালুইকরই তো, না আর কেউ? কোনো ম্লেচ্ছ ওর দোকান লুট করতে আসে নি তো? রণবীর খেয়াল করে দেখল। না, হালুইকরই বটে। নিজের দোকানের পেছন দিকের দরজা খুলছে।

রাস্তা ফাঁকা। এমনিতেই এ সময়টাতে রাস্তায় লোক থাকে না। বড় জোর আসে দু-একজন ঝাঁকামুটে, কিংবা দু-একটা টাঙ্গা। এ রাস্তা কেবল সন্ধ্যের ঝোঁকে জমজমাট হয়।

ছোকরা দুজন একেক করে রাস্তা পার হয়।

রণবীর বলল, 'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকো। সেই ফাঁকে আমি কড়াইটা বার করে আনি।'

'তার কোনো দরকারই হবে না। ও আমাদের জাতভাই। হিন্দু। নিজে থেকেই দিয়ে দেবে।'

'আমি ওর কাছ থেকে কড়াই চাইব। তোকে চাইতে হবে না।'

'চল্ রে, চল্। তুই, গাঁড়া, নিজেকে কী ভাবিস রে ?'

পেছনের দিক থেকে ছোকরা দুজন দোকানমুখো এগোল। দোকানের দরজা খোলা। হালুইকরকে বাইরে দেখতে পাওয়া গেল না। নিশ্চয় সে দোকানের মধ্যে সেঁধিয়েছে।

রাস্তার ধারে হওয়া সত্ত্বেও দোকানের ভেতরটা অন্ধকার।

তেল-ঘি আর ময়লায় চটচটে হয়ে থাকা তক্তায় মাছি ভনভন করছে। দোকানের ভেতর থেকে বাসি সিঙাড়ার গন্ধ ভেসে আসছে। রণবীর দোকানের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল।

'কী চাই ? আজ দোকান বন্ধ'—ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

ছোকরা দুজন দোকানের ভেতরে গিয়ে হাজির হল। একপাশে দাঁড়িয়ে হালুইকর টিনের ময়দা বস্তায় ভরছিল। দরজার বাইরে আচমকা লোক দেখে সে সিঁটিয়ে গেল।

তারপর ফিক করে হেসে বলল, 'আরে, এসো-এসো। আজ কিছুই করিনি। ভাবলাম কিছু আটাময়দা নিয়ে গিয়ে রাখি। শহরের হালচাল সুবিধের ঠেকছে না। তোমারাও, বাপু, বাড়ি গিয়ে বসে থাকো। ঘর ছেড়ে নড়ো না।'

রণবীর ধর্মদেবকে হেঁকে বলল :

'নে রে, ওঠা ঐ কড়াই।'

ধর্মদেব পেছনের দেয়ালে ঠেকানো কড়াইয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

'স্বজাতির রক্ষার জন্যে কড়াইটা নিয়ে চললাম। সংকট কেটে গেলে ফেরত দিয়ে যাব।'—এই কথা হালুইকরের মাথায় ঢুকল না।

'বলছ কী ? কে তোমরা ? কড়াই নিয়ে কী করবে ? বিয়ে-টিয়ে আছে ?'

দুজনের কেউই রা কাড়ল না।

রণবীর ফের বলল, 'মধ্যিখানের কড়াইটা ওঠা। যেটা সামনে রয়েছে।'

'আরে, রও রও। আগে বলো তো কী ব্যাপার ? কড়াই কোথায় নিয়ে যাবে ?'

'পরে সব জানতে পারবে। নে, তোল কড়াই।'

'বা রে, এসব হচ্ছেটা কী ? বলা নেই, কওয়া নেই—নিজেদের ইচ্ছেমতো কড়াই উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ ? তোমরা কে, কী জন্যে—আগে বলবে তো ! ইতিমধ্যে রণবীর তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। গলা চড়িয়ে বলল, 'কড়াই দেবে না তাহলে ?' বলে একটা ঝট্‌কা দিল।

হালুইকর কিছু বলবার আগেই ডান গাল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

একবার হাত উঠিয়েই রণবীর তার হাত ঝটপট পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। হালুইকর দুহাতে মুখ চেপে ধরে 'হায়-হায়' করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

'এ যদি দ্বিতীয় কারো কানে যায় তো তোমাকে শেষ করে দেব।'

ধর্মদেব কড়াই তুলে নিয়ে ততক্ষণে পগার পার। রণবীর একটু দেরি করে কিছুক্ষণ বাদেই তাকে এসে ধরে ফেলল। রণবীর ভাবছিল কাউকে মারা শক্ত কাজ নয়। আমি ওকে অনায়াসে খুন করে ফেলতে পারতাম। হাতটা শুধু ওঠানোর ব্যাপার। হ্যাঁ, লড়তে গেলে মুশকিল আছে। বিশেষ করে, তুমি যদি এমন পাল্লায় পড়ো যে তোমাকে ছেড়ে দেবে না। তবে ছুরি বসিয়ে দিয়ে মারাটা কিছুই নয়। সহজ ব্যাপার।

বাড়ির দরজায় এসে ধর্মদেব থামল।

রণবীর এসে পড়লে ধর্মদেব প্রশ্ন করল, 'কেন তুমি ওকে মারলে?'

'কেন ও মামদোবাজি করছিল?'

ধর্মদেব থুথু ফেলার চেষ্টা করেও পারল না। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তো-তো করতে করতে বলল, 'কেউ যদি দেখে ফেলত? আর হালুইকর যদি চিৎকার করত?

'আমি কাউকে ভয় পাই না। ও কী করবে করুক না। চাইলে তুমিও যা খুশি করতে পারো।'

কাউকে কেয়ার না করার ঢঙে কথাটা। বলে রণবীর সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করে দিল।

সাত

'অফিসে দেখা না করে বাড়িতে এসেছেন! নিশ্চয়ই খুব জরুরি কোনো কাজে?' ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে রিচার্ড বলল।

চাপরাশি এসে চিক তুলে দিল। নাগরিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্যেরা একে একে ঘরের ভেতরে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে রিচার্ড ঘরের মধ্যেকার চেয়ার-গুলোর দিকে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে প্রত্যেককে বসবার অনুরোধ জানাতে জানাতে এক পলক সবাইকে দেখে নিল। তারপর টেবিলের পেছনের চেয়ারে বসে পড়ে হাতে পেনসিল উঠিয়ে নিল। চার জনের মাথায় পাগড়ি, একজনের রুমী টুপি আর দুজনের মাথায় গান্ধীটুপি। প্রতিনিধিমণ্ডলীর ধাঁচ দেখেই রিচার্ড বুঝে নিল অনায়াসে এদের সামাল দেওয়া যাবে।

'বলুন, আমি আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

ডি-সির সৌজন্যে সবাই মুগ্ধ হল। এর আগের ডি-সি তো মুখ না ভেটকে কথাই বলত না। তার সঙ্গে দেখা করাও শক্ত ছিল।

ততক্ষণে রিচার্ড মোটামুটি সব সদস্যেরই কার কতটা দৌড় বুঝে নিয়েছে।

পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছিল রাজনৈতিক লোকদের মধ্যে কে কোন্ জন। মাথায় গান্ধীটুপি পরা ঢিমেতেতালা লোকটি বোধহয় বক্সীজী —যিনি ষোল বছর জেলে ছিলেন। আর ঐ এককোণে রুমী-টুপিপরা লোকটি হায়াত খাঁ—মুসলিম মাতব্বর। সঙ্গে মিশন কলেজের মার্কিন প্রিন্সিপাল হারবার্ট সাহেব। এঁরা দেখছি আমার পরিচিত বলে প্রোফেসর রঘুনাথকেও ধরে এনেছেন। বাকিরা সম্ভবত বিভিন্ন সংস্থার লোক।

রিচার্ড বক্সীজীর দিকে ফিরে বলল, 'আমার কাছে খবর এসেছে যে, শহরে নাকি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।'

'সেই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে দেখা করে আমাদের কথা বলতে আসা'—বক্সীজী বললেন। বক্সীজী উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। সকালে যা সব ঘটেছে তাতে ওঁর মেজাজ খিচড়ে গিয়েছিল। তারপর উনি ওঁর প্রথম কর্তব্য হিসেবে গোড়াতেই লীগের যিনি মাথা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু সেখানে তেমন সাড়া না পেয়ে উনি ডি-সির কাছে বিশিষ্ট লোকদের দল বেঁধে নিয়ে যাওয়ার কথা সাব্যস্ত করেন। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে একেকজনকে ধরে পাকড়ে এখানে তাদের নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ডেপুটি কমিশনারের কাছে আসতে তাদের কারও কোনো আপত্তি হয়নি।

'সরকারের পক্ষ থেকে এখুনি এমন ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে এই অবস্থা মিটে যায়। নইলে···এ শহরে চিল শকুন উড়বে।'

আর সব সদস্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও, দলের আর সব সদস্যের মনে দুর্ভাবনা থাকলেও, বক্সীজীর মতন তারা কেউই অতটা উতলা হয়ে পড়েনি। এই সময় প্রফেসরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হলো। প্রফেসর ছিলেন এদেশের এমন একজন বাঘা লোক যাঁর সঙ্গে রিচার্ডের কমবেশী দহরম মহরম ছিল। দুজনেরই ইংরেজী সাহিত্য আর ভারতীয় ইতিহাসে টান ছিল। চোখাচোখি হতেই দুজনে মুখ টিপে হাসল। যেন বলতে চাইল, 'এরা আমাদের দুজনকে মামুলি দুনিয়াদারিতে জোর করে টেনে এনেছে, নইলে আমরা দুজনে তো অন্য জগতের লোক।'

রিচার্ড মাথাটা হেলিয়ে পেনসিলটা টেবিলে ঠুকল।

'সরকারের তো দুর্নামের অন্ত নেই। আমি ইংরেজ অফিসার। ব্রিটিশ সরকারকে তো আপনারা বিশ্বাস করেন না, সরকারের কথা শুনে তো আপনারা উল্টে যাচ্ছেন।' রিচার্ড ঠাট্টার সুরে কথাটা বলে আবার পেনসিল ঠুকতে লাগল।

'কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের হাতেই তো ক্ষমতা আর আপনি স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারেরই প্রতিনিধি। শহরটাকে বাঁচানো আপনারই দায়িত্ব।'

বক্সীজী বললেন। বলবার সময় তাঁর থুতনি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আর উত্তেজনায় তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

রিচার্ড একটু হেসে আস্তে আস্তে ফের বলল, 'ক্ষমতা তো এখন পণ্ডিত নেহরুর হাতে।' তারপর বক্সীজীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা ব্রিটিশ

সরকারের বিরুদ্ধে গেলেও দোষ হয় ব্রিটিশ সরকারের। আর আপনারা এই যে নিজেরা নিজেরা লড়ছেন, আজও দোষ হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের।' রিচার্ডের ঠোঁটে মুচকানো হাসি। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে ফের বলল, 'কিন্তু যাক, বলুন। আমাদের সবাই মিলে এ সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলতে হবে,' বলে রিচার্ড হায়াত বক্স-এর দিকে তাকালো।

হায়াত বক্স বললেন, 'পুলিশ যদি মোতায়েন থাকে তো কোনো ভয় নেই। মসজিদের সামনে যেটা পাওয়া গেছে তার পেছনে হিন্দুদের খুব বড় রকমের বজ্জাতি আছে।'

দানবীর লক্ষ্মীনারায়ণ লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আপনি বলেন কী করে যে এর পেছনে হিন্দুদের বজ্জাতি আছে?' বলতে বলতে তাঁর গলা সপ্তমে চড়ল।

রিচার্ডের কাছে এটা হয়ে গেল আপনা থেকে ঘটনার জট খুলে যাওয়ার ব্যাপার।

রিচার্ড আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'পরস্পরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটা স্পষ্ট যে আপনারা সমস্যাটা মেটাবার জন্যেই আমার কাছে এসেছেন।'

হায়াত বক্স বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, আমারাও চাই না শহরে গোলমাল বাধুক, মারামারি কাটাকাটি হোক।' লক্ষ্মীনারায়ণ দেখলেন উনি একা পড়ে যাচ্ছেন। নিজের স্বধর্ম বন্ধুদের ওপর তিনি চটলেন। তারা যদি সায় দিত, তাহলে একা তাঁকে মুসলমানদের মুণ্ডপাত করতে হত না। দল বেঁধে তাঁরা ডি-সিকে বলতে পারতেন—জুম্মা মসজিদে কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হয়েছে, কিভাবে ওরা গো-হত্যা করেছে। এসব এখানে বললে এরা নাক সিঁটকাবে। উচিত ছিল হিন্দু-শিখ মিলে আলাদাভাবে দল বেঁধে ডি-সির কাছে আসা। তাতে ওঁকে সামনাসামনি সাফসাফ সব খুলে বলা যেত।

বক্সীজী রিচার্ডকে সম্বোধন করে বললেন, 'যদি শহরে পুলিশ মোতায়েন করা যায়, জায়গায় জায়গায় ফৌজী পাহারার ব্যবস্থা হয় তাহলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে পারবে না। অবস্থাটা কব্জা করা যাবে।'

রিচার্ড ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, 'আমি ডেপুটি কমিশনার বৈ নয়, ফৌজী ব্যবস্থার ওপর আমার কোনো হাত নেই। এখানে ছাউনি আছে বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে ফৌজ আমার হুকুমে চলে।'

বক্সীজী বললেন, 'ছাউনিও ব্রিটিশ সরকারের, আর রাষ্ট্রও ব্রিটিশ সরকারের। আপনারা যদি ফৌজ বসিয়ে দেন তাহলে পুরো ব্যাপার কব্জায় এসে যাবে।'

রিচার্ড ঘাড় নেড়ে বলল, 'ফৌজের ওপর আমার যে কোনো হুকুম চলে না, আপনারাও সেটা জানেন। তেমন কোনো এক্তিয়ার ডি-সির নেই।'

যদি ফৌজ না বসাতে পারেন তো শহরে কারফিউ জারি করে দিন। এতে অবস্থা সামলে নেওয়া যাবে। সেইসঙ্গে না হয় পুলিশেরই চৌকি বসিয়ে দিন।

'এরকম একটা ছোট্ট ঘটনায় কারফিউ জারি করলে শহরে আতঙ্ক আরও বেড়ে যাবে না তো! আপনাদের কী মনে হয়'? রিচার্ড এমন ঢঙে কথাটা বলল যেন সে

ওদের কাছ থেকে উপদেশ প্রার্থনা করছে। সেইসঙ্গে তাক থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর পেনসিল দিয়ে খসখস করে কিছু লিখল; এরপর আবার ঘড়ির দিকে তাকাল।

রিচার্ড আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'সরকার তার দিক থেকে যা কিছু করবার অবশ্যই করবে। কিন্তু আপনারা হলেন শহরের গণ্যমান্য লোক। লোকে আপনাদের কথা আগ্রহ করে শুনবে। আপনাদের উচিত সবাই মিলে শান্তিরক্ষার আবেদন জানানো।'

সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজনকে মাথা নাড়তে দেখা গেল—সাহেব ঠিক বলেছেন।

রিচার্ড বলে চলল, 'মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস দুদলেরই নেতা এখানে উপস্থিত। আপনারা সর্দারজীকে সঙ্গে নিন। তারপর সবাই মিলে-মিশে শান্তি-কমিটি বানিয়ে কাজ শুরু করে দিন। সরকার আপনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে...'

বক্সীজী ফের উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'সে তো আমরা করবই তবে এবার অবস্থাটা সুবিধের নয়। মারদাঙ্গা যদি শুরু হয়ে যায় তো সামাল দেওয়া কঠিন হবে। যদি শহরের ওপর দিয়ে একটা হাওয়াই জাহাজও উড়ে যায় তো লোকে মুখে মুখে জেনে যাবে যে সরকার এ বিষয়ে হুঁশিয়ার আছে। গোলমাল ঠেকাবার পক্ষে সেটাই হবে যথেষ্ট।'

রিচার্ড আবার মাথাটা হেলিয়ে দিল। মুচকি হেসে কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে আবার কিছু একটা লিখল।

তারপর একটু থেমে বলল, 'হাওয়াই জাহাজের ডিপার্টমেণ্ট আলাদা, আমার অধীন নয়।'

'করতে চাইলে সব কিছুই আপনার হাতে, সাহেব।'

রিচার্ড ভাবল তার পক্ষে অতটা রেখে-ঢেকে বলাটা ঠিক হচ্ছে না। এ লোকটার বড্ড বাড় বেড়ে যাচ্ছে।

'বাস্তবিক পক্ষে, নালিশ নিয়ে আমার কাছে আপনাদের আসাটাই উচিত হয় নি। আপনাদের উচিত ছিল সটান পণ্ডিত নেহরু কিংবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং-এর কাছে যাওয়া। সরকারের লাগাম তো ওঁদেরই হাতে। এই বলে রিচার্ড হেসে ফেলল। ডি,-সি কে ফেঁাস করে উঠতে দেখে বাকি সবাই চুপ করে গেল। কিন্তু বক্সীজী ফের ঝাঁপিয়ে উঠে বললেন, 'খবর পেলাম এই ঘণ্টাখানেক আগেই আপনার ইংরেজ পুলিশ অফিসার রবার্ট সাহেব এক মুসলমান পরিবারকে জোর করে বাড়ির বার করে দিয়েছেন। এতে এখানকার গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, ওই মুসলমান ভাড়াটের বাড়িওয়ালা হল হিন্দু। আমি মনে করি, শহরের এই অবস্থা বিবেচনা করে এই ধরনের কাজ-কারবার আপাতত বন্ধ রাখা যেত।'

ঘটনাটা রিচার্ডের জানা ছিল। এই পুলিশ অফিসার এক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবার আগে রিচার্ডের পরামর্শ নিয়েছিল। রিচার্ড তাকে বলেছিল, কোর্টের নির্দেশে

কাজ করা রোজকার মামুলি ব্যাপার। সে কাজ স্থগিত রাখার মানে হয় না। কিন্তু রিচার্ড এসব মাতব্বরদের ঘুণাক্ষরেও জানাতে চায় না যে, এ ব্যাপারে সে কিছু জানত। কাগজের ওপর কিছুক্ষণ পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটবার পর রিচার্ড বলল, 'ঠিক আছে, আমি খোঁজ নেব'। বলে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল।

এই সময় এখানকার মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল, বষীয়ান মার্কিন পাদ্রী হারবার্ট অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন: 'শহরের শান্তিরক্ষার প্রশ্নটা তাই বলে রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে রেখে এর বিচার করতে হবে। এটা শহরের সমস্ত লোকের ব্যাপার। সমস্ত নাগরিকের নির্বিশেষে। এক্ষেত্রে কে কোন পার্টির সেটা ভুলে যেতে হবে। এতে সরকারেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। আমরা চাই সকলে মিলে শহরের এই অবস্থাটার সামাল দিতে। এখুনি আসুন আমরা গোটা শহর চষে ফেলি। লোকদের বোঝাই, তাদের হাত জোড় করে বলি—আপনা আপনির মধ্যে যেন আমরা না লড়ি।'

রিচার্ড তৎক্ষণাৎ তাঁর এই বক্তব্য সমর্থন করে আরও জোর দিয়ে বলল, 'আমি বলি কী একটা বাস নিয়ে যান, তাতে লাউডস্পীকার লাগিয়ে নিন। আপনারা ঐ বাসে করে সারা শহর ঘুরে সকলের কাছে আপনাদের কথা পৌঁছে দিন।'

রিচার্ডের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বাইরে বাগানের দিক থেকে নানা ধরনের ভীতসন্ত্রস্ত চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল।

রিচার্ডের চাপরাসি বাইরে বসে ছিল। তাকে একজন বলছিল, পুলের ওপারে একজন হিন্দু খুন হয়েছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে।

শুনে বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের কান খাড়া হয়ে উঠল। ডি.-সি, র বাংলো শহর থেকে অনেকটা দূরে। যদি সত্যি গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তো তাঁদের নিজেদের বাড়ি ফেরাটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই সময় দূরে বাংলো পেরিয়ে কোনো টাঙ্গার হুটপাট করে ছুটে যাওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। রাস্তা দিয়ে কারও দুড়দাড়িয়ে ছুটে পালানোর শব্দ ভেসে এল।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘাবড়ে গিয়ে উঠে পড়ে বললেন, 'শহরে গণ্ডগোল বেধে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

রিচার্ড বলল, 'সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।'

'গোলমাল বেধে গিয়ে থাকলে খুব খারাপ কথা।'

একেক করে দলের প্রত্যেক সদস্য চিক উঠিয়ে ঘরের বাইরে যেতে লাগল। ডি-সিও তাঁদের এগিয়ে দিতে দরজা অবধি এলেন।

'আপনাদের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি'—বলে রিচার্ড ঘরে টেবিলে রাখা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

'আমাদের জন্যে ভাববেন না। তার চেয়েও জরুরি হল শহরে যাতে গণ্ডগোল না বাধে সেটা দেখা। এখনও সময় যায়নি, রিচার্ড সাহেব, শহরে এখুনি কারফিউ জারী করুন।'

রিচার্ড হেসে ঘাড় নাড়ল।

বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকদের যেন শিরেসংক্রান্তির দশা। ফটকের বাইরে এসে যে যার মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। কিছু দূর একসঙ্গে যাবার পর লক্ষ্মীনারায়ণ আর সর্দারজীকে এবার রাস্তা পার হতে হবে। লক্ষ্মীনারায়ণ ঝট করে মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে বগলদাবা করে নিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় লাগালেন।

বাংলোর বাইরের রাস্তায় পড়ে ডান দিকে একটা ঢাল। সেটা সোজা সাঁকোয় গিয়ে মিশেছে। এই সাঁকোটাই শহরকে সেনানিবাস থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

হারবার্ট এসেছিলেন নিজের সাইকেলে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সাইকেল চড়ে চলাফেরা করেন। ঢাল বেয়ে খুব আস্তে আস্তে উনি নামছিলেন। একবার ওঁর মনে হল ওদের জিজ্ঞেস করেন যে, শান্তি কমিটির মিটিংটা ঠিক কবে এবং কোথায় হবে। কিন্তু ওদের ভয়তরাসে ভাব দেখে উনি আর মুখ খুললেন না। আর দাঙ্গা যদি বেধে গিয়ে থাকে, তাহলে কিসের ছাই মিটিং হবে?

হায়াতবক্স ছুট দেন নি বটে, তবে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে অনবরত ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেছন দিকে নজর রাখছিলেন।

হায়াতবক্স নিজেই নিজের মনকে বোঝান: 'আরে, চোখ বুজে গায়ে ফু দিয়ে চলো। এ তো মুসলমান এলাকা।' রাস্তার ওপারে সর্দারজী জোর কদমে আগে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর প্রায় দশ গজ তফাতে পেছনে আসছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। শরীরটা একটু বেশি ভারী হয়ে যাওয়ায় ওঁর চলতে কষ্ট হচ্ছিল; বার বার রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা মুছে নিচ্ছিলেন। বক্সী আর মেহতা গেটের কাছে কিছুক্ষণ ন-যযৌ ন-তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে তাঁরাও ঢাল বরাবর রওনা দিলেন।

মেহতা বললেন, 'এসো, একটা টাঙ্গা নেওয়া যাক। পায়ে হেঁটে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যাবে।' শুনে বক্সী দাঁড়িয়ে গেলেন। পেছন থেকে একটা টাঙ্গা আসছিল। মেহতা ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে থামবার ইশারা করলেন।

অল্প বয়সের শ্যামলা রঙের কচুয়ান ঘোড়ার রাশ টানতে টানতে জিজ্ঞেস করল, 'যাবেন কোথায়?'

'গুমটি পর্যন্ত নিয়ে চলো।'

'দু-টাকা লাগবে।'

'দু-টাকা কী বলছ? ইয়ার্কি পেয়েছ?' পুরনো অভ্যেসবশত বক্সীজী বলে ফেললেন। টাঙ্গা চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

'আরে, উঠেই বসো না, বক্সীজী! দুটো টাকাই না হয় দিলে। এটা কি দরাদরির করার সময়? নাও। উঠে বসো।' বলে মেহতাজী পেছনের সীটে বসে পড়লেন। 'জল্দি জল্দি শহরে পৌঁছুনো চাই।'

টাঙ্গায় ওঁদের উঠতে দেখে লক্ষ্মীনারায়ণও ঘুরে ওঁদের দিকে আসছিলেন। কিন্তু তার আগেই টাঙ্গা ছুটতে শুরু করে দিল। বেচারা লক্ষ্মীনারায়ণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে ওঁদের দিকে চেয়ে থাকলেন।

'হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু এই রকমেরই ব্যবহার করবে। আদ্যিকাল থেকে এমনটাই হয়ে আসছে। বাঃ ভাই! এ না হলে হিন্দু?' ক্রুদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ নিজের মনে এ কথা বলে ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে দিক পরিবর্তন করে আগের জায়গায় ফিরে গেলেন।

এর মধ্যে বাকি তিনজন কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে না ভিড়ে, পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব রেখে ঢাল বেয়ে নামছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের কিছুটা আগে আগে যাচ্ছিলেন হাকিম আবদুলগণি। উনি এককালে ছিলেন কংগ্রেস কমিটির জবরদস্ত পুরনো কর্মকর্তা। তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন সর্দারজী। আর সবার আগে আগে যাচ্ছিলেন হায়াতবক্স। কোট খুলে কাঁধের ওপর ফেলে নিয়েছিলেন হায়াতবক্স।

টাঙ্গায় উঠে বসেই বক্সীজী বলেছিলেন, কিছু লোককে টাঙ্গায় উঠিয়ে নাও।

'কাউকে ওঠাবে না, বক্সীজী! এখান থেকে বাঁ-হাতি রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাও। ওরা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নেবে।' তারপর যুক্তি দেখাবার চেষ্টায় মেহতাজী বললেন, 'কাকে ফেলে কাকে ওঠাবেন?'

বক্সীজীর মনে হল যেন টাঙ্গায় উঠে উনি ভুল ক'রে ফেলেছেন। যেমন মেহতার ওপর তেমনি নিজের ওপরও এই কারণেই তাঁর রাগ হল যে, কেন তিনি মেহতা কিংবা অন্য লোকের কথায় নাচেন। এসেছিলেন সবাই এক সঙ্গে, যাওয়াটাও একসঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি টাঙ্গায় গঁ্যাট হয়ে বসে রইলেন।

হায়াতবক্সের পাশ দিয়ে টাঙ্গায় করে যাওয়ার সময় হায়াতবক্স হেসে বললেন, 'দেখ, কাপুরুষেরা পালাচ্ছে! গোড়ার গালে চুমো খেয়ে পরে ফেলে পালানো?'

বক্সীজীর সঙ্গে ওঁর যে সম্পর্ক তাতে কোনো খাদ নেই। ওঁরা দুজনে একই শহরে ছোট থেকে বড় হয়েছেন, ভিন্ন রাজনীতির লোক হয়েও পরস্পরের পেছনে লাগায় ওঁদের বাধত না। দুজনের মধ্যে ছিল ইয়ার্কির সম্পর্ক।

হায়াতবক্স পেছন ফিরে সর্দার বিষনসিংকে আসতে দেখে বললেন, 'বক্সীজী তো বেরিয়ে গেলেন! উনি গেলেন শান্তি করাতে। এসব লোকের ওটাই স্বভাব।'

শুনেও সর্দার বিষনসিং রা কাড়লেন না। ঘাড় নিচু করে যেমন তেমনি চলতে লাগলেন।

সকলের পেছনে পড়ে-যাওয়া লক্ষ্মীনারায়ণের শখ গেল এগিয়ে যে কোনো ভাবে হোক হায়াতবক্সের সঙ্গে একটু গা ঘষে চলার। এটা মুসলমানদের এলাকা। একজন মুসলমানের সঙ্গে থাকতে পারলে ভালোয় ভালোয় এলাকাটা পার হয়ে যেতে পারবেন। আর হায়াতবক্সকে সকলেই জানে-চেনে।

'একটু দাঁড়িয়ে যাও। অত হানফানানির কী আছে?'

লক্ষ্মীনারায়ণের গলা পেয়ে তিনজনই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আর লক্ষ্মীনারায়ণ ছড়ি ঠকঠক করতে করতে সোজা বেরিয়ে গিয়ে হায়াতবক্সকে ধরে ফেললেন।

'শহরে গোলমাল বেধে গেলে বিশ্রী ব্যাপার হবে'—এই কথা বলতে বলতে লক্ষ্মীনারায়ণ হায়াতবক্সের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলেন। হায়াতবক্স লক্ষ্মীনারায়ণের মতলব ধরে ফেলেছিলেন। আর এতে হায়াতবক্সেরও লাভ ছিল।

কারণ, সাকো পার হয়ে আরও কিছুটা গেলে হিন্দু বসতি শুরু হয়ে যাবে। সেটা পেরিয়ে আরও খানিকটা গেলে তবে হায়াতবক্সের বাড়ি। লক্ষ্মীনারায়ণ থাকলে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নির্বিঘ্নে হিন্দুপাড়াটা পেরিয়ে যেতে পারবেন। এটা হায়াতবক্সও বিলক্ষণ জানতেন যে, এর মধ্যে ভয়ডরের কোনো ব্যাপার ছিল না। ওঁরা সবাই শহরের গণ্যমান্য প্রবীণ মানুষ—ওঁদের গায়ে হাত দেওয়া কারো পক্ষে সহজ হবে না।

টাঙ্গায় বসে থাকতে থাকতে বক্সীজী মনে মনে ভারি ক্ষুব্ধ আর বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা কোনো বেগড়বাই অবস্থা দেখলেই উনি খালি নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকেন, সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দাতমুখ খিঁচিয়ে কথা বলতে থাকেন, ওঁর মাথাটা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। ভাবনার তোড়ে সব কিছু ভেসে যায়।

'চিলশকুন শহরে উড়বে, মেহতাজী—শহরে চিলশকুন উড়বে।' বার বার এই কথাটা বলতে বলতে উনি উঁকিঝুঁকি দিয়ে টাঙ্গার বাইরে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

'হবার হলে হবে, এখন শহরে তো আগে পেঁছোই।'

এতে বক্সীজী চটেমটে বললেন, 'শহরে পেঁছে আর হবে কী? এখন তো শিরেসংক্রান্তি।'

মেহতাজীও ভয় পাচ্ছিলেন, তবে বক্সীজীব মতন রাগে ফেটে পড়ার দশা ওঁর নয়।

'ডি-সি কী বললেন, শুনলে তো? আগের ডি-সি তো সোজা মুখ করে কথাই বলত না।'

বক্সীজী বিরক্তভাবে বললেন, 'এ ডি-সিই বা করছে কী? ঘোড়ার ডিম। এ আমাদের কোন কথাটা শুনল?'

বক্সীজীর চিন্তা আবার অন্য দিকে মোড় নিল।

মেহতা বললেন, 'কাউকেই ভরসা করা যায় না।'

বক্সীজী তেতে উঠে বললেন, 'মুসলমানকে যায় না, হিন্দুকেই কি যায়?'

'দেখ বক্সী, হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই ভাত বোঝা যায়। মুবারক আলী ছিলেন কংগ্রেস কমিটির মেম্বার। উনি পরতেন খদ্দরের কুর্তা, খদ্দরের সালোয়ার। কিন্তু মাথায় দিতেন পেশোয়ারী টুপি, গান্ধী টুপি নয়। মুজফফরকে বাদ দিলে আর কোনো মুসলমানই গান্ধীটুপি মাথায় পরে না।'

বক্সীজী রুমাল বার করে ঘাড়গলার ঘাম মুছে নিয়ে বগলদাবা পাগড়িটা কোলের ওপর রাখলেন।

মেহতা ঘাড় মুছতে মুছতে বললেন, 'হিন্দু-সভাওয়ালারা তো তবু পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা কমিটি গড়েছে—আমাদের তো সেটুকু করারও মুরোদ হয় নি। পাড়ায় পাড়ায় শান্তি কমিটি গড়লেও তো কাজ হত।'

খোঁচা খেয়ে বক্সীজী ফেটে পড়লেন: 'কলসি গলায় বেঁধে ডুবে মরো, মেহতা—ডুবে মরো।'

'বালাই ষাট! খামাখা ডুবে মরতে যাব কেন? আমি কী করলাম?'

'দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা ভালো নয়। হামেশা তুমি তাই করে থাকো। এক

পা কংগ্রেসে, এক পা হিন্দুসভায়। ভাবো কেউ কিছু বোঝে না। সবাই বোঝে।'

'যদি দাঙ্গা বাধে, তুমি আমাকে বাঁচাতে আসবে? নালার ওপারটা পুরো মুসলমান এলাকা। আমি থাকি নালার ঠিক মাথায়। দাঙ্গা বাধলে, তুমিও আসবে না, বাপুজীও আসবেন না—তোমরা কেউই আমাকে বাঁচাতে আসবে না। তখন পাড়ার হিন্দুরাই হবে আমার একমাত্র ভরসা। যে ছোরা মারবে সে তো আর মারার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে না যে, আমি কংগ্রেস করি, না হিন্দুসভা করি...কী? চুপ করে গেলে কেন?

'ও মুখ আর দেখিও না, মেহতা। কার কত বিশ্বাসের জোর এখনই তা পরখ করার সময়। তুচ্ছ মাটির মায়ায় নিজেকে তুমি বড় বেশি জড়িয়ে ফেলেছ। চর্বি জমে তোমার আক্কেল ভোঁতা হয়ে গেছে। তোমার বাড়ি মুসলমান পাড়ার পাশে। আর আমারটা কি হিন্দু পাড়ার মধ্যে?'

মেহতাজী রাগতভাবে বললেন, 'তোমার কী? ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। কে তোমার গায়ে হাত দেবে? বলেছিলাম কংগ্রেসের দপ্তর থেকে লতিফকে বার করে দাও। আমি লিখে দিতে পারি, ও হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশের লোক। ও সব্বার নামে রিপোর্ট দেয়। রোজনামচা রাখে। তুমিও জানো। আমিও জানি। তবু তুমি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছ। ওদিকে মুবারক আলী ভেতরে ভেতরে লীগের সঙ্গে ষড় করে চলেছে। তোমার কাছ থেকেও পয়সা নিচ্ছে, আবার লীগের কাছ থেকেও পয়সা খাচ্ছে। নিজের পাকা দালান বানিয়েছে। তোমরাও সব আচ্ছা লোক। সব কিছু দেখেও না-দেখার ভান করছ।'

'থাকার মধ্যে তো আছে আমাদের দুতিনজন মুসলমান কর্মী। ওরাই সবেধন। ওদেরও বার করে দেব? তোমার বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? একা লতিফ খারাপ বলে কি সবাই খারাপ? তোমারও আগে থেকে কংগ্রেসের কাজ করছেন যে হাকিম সাহেব, তিনিও খারাপ হয়ে গেলেন? আজীজ আহমদ? সেও খারাপ...'

টাঙ্গাটা তখন ঢাল বেয়ে নামা শেষ করে সাঁকোর দিকে ঘুরে গেল।

ডানদিকে ইস্‌লামিয়া স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া বিরল। মাঝে মাঝে দু-একটা টাঙ্গায় কিংবা সাইকেলে দু-একজনকে যেতে দেখা যাচ্ছে।

পেছনে তখনও সেই চারজন ঢাল বেয়ে নামছে। বিজ্‌লী দপ্তরের সামনে হায়াতবক্সের সঙ্গে একজন মুসলমানের দেখা হয়ে গেল। মওলাদাদ। বিজ্‌লী দপ্তরের কেরানি। সেইসঙ্গে মুসলিম লীগেরও কর্মচারী।

'কোথা থেকে ফিরছ? ডি-সির সঙ্গে দেখা করে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, দেখা হল। ওখানে বসে থাকতে থাকতেই তো হল্লার আওয়াজ শোনা গেল। আমরা সবাই ধরে নিলাম হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। সভা মাথায় উঠল। সবাই আমরা বেরিয়ে চলে এলাম। শহরের হালচাল কী?'

'চাপা উত্তেজনা আছে। সেটা বাড়ছে। শুনছি রত্তের দিকে কী নাকি গণ্ডগোল হয়েছে। পেছনে ওদিকটাতে কী দেখে এলে?'

'ওদিকে সব ঠিক আছে।'

ততক্ষণে হাকিম আবদুলগণি আর সর্দার বিষনসিংও এসে গেলেন। কিছু পথ আলাদা আলাদা আসার পর এবার দুজনে একসঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। হাকিম সাহেব কংগ্রেসী মুসলমান। তাই তাঁর সঙ্গে বিষন সিং অসংকোচে হাঁটতে পারছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ বললেন, 'গোলমাল না হওয়াই উচিত। গোলমাল হওয়া খুব খারাপ।'

মওলাদাদ খুব তীক্ষ্ণ নজরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনারা তো গোলমাল না বাধিয়েই ছাড়তেন না। আমরা যারা আছি, সবই সয়ে যাচ্ছি।' এরপর হাকিম সাহেবকে চোখে পড়তেই মওলাদাদের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল : 'হিন্দুদের ঐ পোষা কুকুরটাও আপনাদের সঙ্গে গিয়েছিল নাকি? ও কার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিল?'

তিনজনেই এরপর চুপ করে গেল। হাকিম সাহেব ওসব কথায় কান না দিয়ে মুখ তুলে সাঁকোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু হাকিম সাহেবকে দেখে মওলাদাদের গা রী রী করে উঠল।

'মুসলমানের দুশমন হিন্দুরা নয়। মুসলমানের দুশমন হল সেইসব মুসলমান যারা হিন্দুদের পেছন পেছন ল্যাজ নেড়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের এঁটোকাঁটা খেয়ে বেঁচে থাকে।...'

হাকিম সাহেব খুব থেমে থেমে ধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'দেখুন, মওলাদাদ সাহেব! আপনার যা মুখে আসে তাই আমাকে বললেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা। বড় কথা হিন্দুমুসলমান নয়। কথা হল ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া।'

মওলাদাদ চিৎকার করে বলে উঠল, 'চোপরাও, কুত্তা।' ওর চোখ টকটকে লাল। ঠোঁট কাঁপছিল।

'ছাড়ো ছাড়ো! যেতে দাও, যেতে দাও! ঝগড়া করার এটা সময় নয়।'

মুহূর্তের জন্যে লক্ষ্মীনারায়ণ যেন জলে পড়লেন। কিন্তু হায়াতবক্স সেয়ানা লোক। তাড়াতাড়ি অবস্থা সামলে নিলেন। 'যান যান হাকিম সাহেব! আপনার মুরুব্বিরা তো দিব্যি টাঙ্গায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন আপনাকে একা ফেলে।

হাকিম সাহেব আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। সর্দারজী তাঁর সঙ্গ নিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

'বাড়ি যাচ্ছেন?' মওলাদাদ হায়াতবক্সকে জিজ্ঞেস করল, 'লীগের দপ্তরে যাবেন না?'

'আমি একটু পরে আসছি, তুমি চলে যাও।'

মওলাদাদ বুঝে গেল হায়াতবক্স কেন লক্ষ্মীনারায়ণকে সঙ্গে রাখছেন। বুকে হাত দিয়ে খুব শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণকে বলল, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি, লালাজী—আমরা থাকতে আপনার কেশ স্পর্শ করার কারো ক্ষমতা হবে না।'

বারোটা নাগাদ লীজা পায়চারি করতে করতে বারান্দার খোলা দরজার কাছে এল। পর্দাটা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল, বারান্দার বাইরে গোটা বাগান জুড়ে চড়চড়ে রোদ। কাঁচের মত চক্ চক্ করছে। মনে হচ্ছিল জমি থেকে কী যেন কেঁপে কেঁপে উঠে এসে হওয়ায় তির তির করছে। এখনই রোদের কী ঝাঁঝ! লীজা পর্দা ফেলে দিল।

ফায়ারপ্লেসের পাশে ঘুরতে ঘুরতে ওর চোখ গিয়ে পড়ল মাঝবরাবর একটা মূর্তির ওপর। মাথায় লাল সাদা দাগ-কাটা হিন্দুদের কোনো নাদাপেটা দেবতা। বসে হাসছে। দেখে লীজার গা গুলিয়ে উঠল। এই মূর্তি দেখে লীজার খুব ঘেন্না পেল। এটাকে রিচার্ড কোথা থেকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছে?

ঘুরে ঘুরে লীজা বড় ঘরে এল। ইতস্তত পড়ে থাকা মূর্তি আর পটগুলো দেখতে দেখতে ওর অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে এল। ওর মনে হতে লাগল এখানে কোনো ঠাকুর-দেবতা নেই। মৃত বুদ্ধের একটা মুণ্ডু রেখেছে যেটা একা দেখলে লীজার গা শিউরে ওঠে। বই আর মূর্তি দিয়ে ঠাসা এই ঘরটাতে এলে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানে ঘুরতে ঘুরতে ওর মনে হল বুদ্ধের মূর্তিটা যেন চোখের কোণ দিয়ে লীজাকে দেখছে। রিচার্ড চলে যাওয়ার পর ইচ্ছে থাকলেও এসব জিনিসে সে কিছুতেই আগ্রহ খুঁজে পাচ্ছে না। রিচার্ড চলে গেলে এসব জিনিসে ওর আর কোনো সাড় থাকে না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, লীজাকে এই বই আর মূর্তির স্তূপ আঁকড়ে সারাটা দিন একা একা কাটাতে হয়। দিনভর এইসব দেখে দেখে এ-ঘর ও-ঘর করে করে একা একা ওর দিন কাটে। লীজা বুদ্ধের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুটা মজা পাওয়ার জন্যে সুইচ টিপে দিল। সত্যিই সেই আলোয় বুদ্ধের মুখে একটা হালকা হাসি খেলে গেল। আলোটা নিভিয়ে দিতেই বুদ্ধের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। লীজা আবার সুইচ টিপল। অমনি মুখের হাসি ফিরে এল। কিন্তু ওর মনে হল, বুদ্ধ যেন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আড়চোখে ওকে দেখছেন। লীজা ঝট্ করে আলো নিভিয়ে দিল।

লীজা এবার নিজের ঘরে চলে এল। ভেতরে ঢুকতেই একটা মিষ্টি রুনুঝুনু আওয়াজ ওর কানে এল। খাটের পেছনে জানলার সামনে একটা ছোট কাঁসার ঘণ্টি টাঙানো ছিল। হাওয়া দিলেই ঘণ্টিটা ঠুন ঠুন করে নড়ে ওঠে। তা থেকে একটা ভারি মধুর আওয়াজ আলতো করে কানে ভেসে আসে। ঘরে সারাক্ষণ সেই মিষ্টি রুনুঝুনু আওয়াজ বাজতে থাকে। ঘরে এটা ছিল নতুন জিনিস। লীজা ফিরে আসার আগেই রিচার্ড কোথাও থেকে এটা এনে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল। এটা ছিল লীজাকে দেওয়া রিচার্ডের উপহার। এটা সে নিয়ে এসেছিল লীজাকে খুশি করার জন্যে।

এমন সময় ঝপ্ করে একটা শব্দ হল, লীজা ঘুরে বাঁদিকে চেয়ে দেখল। গোড়ায় ওর কিছু চোখে পড়ে নি। পরে দেখতে পেল, ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা টিকটিকি সেখানে চিৎপটাং হয়ে, খিঁচনি ধরলে যেমন হয়, সেইভাবে

হাত পা ছুঁড়ছিল। লীজার আপাদমস্তক শিউরে উঠল। দেয়ালের ইলেকট্রিক আলোর কাছ থেকে টিকটিকিটা উল্টে পড়েছিল। দেখতে দেখতে ওর দাপানো বন্ধ হয়ে গেল। লীজা বুঝল, টিকটিকিটা মরে গেছে। যত গরম বাড়ছে ততই প্রায় রোজদিনই টিকটিকি মারা পড়ছে। যতই অগ্রনুতি ঘর হোক, বাংলোটা ঝরঝরে পুরনো। পাঞ্জাবে যখন প্রথম ইংরেজ রাজত্ব গেঁড়ে বসল, এ বাংলো সেই আমলের।

দু বছর আগে একবার ওদের এইরকমের এক বাংলোয় চাকরদের কোয়ার্টারে তিন হাত লম্বা একটা সাপ বেরিয়ে ছিল। সাপটা কখনও খাটের তলায় সেঁধিয়ে থাকছিল, কখনও বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল। এই ঘটনার পর বাংলোতে থাকাই লীজার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। ক'দিন ভয়ের চোটে কাপড়ের আলমারি খুলতে পারেনি। খালি মনে হয়েছে, আলমারির মধ্যে হয়ত ফণাওয়ালা সাপ ঢুকে বসে আছে। এই রকম মানসিক অবস্থায় লীজা সেবার বিলেত চলে যায়।

লীজা দরজার পাশের কলিং-বেলটা টিপে দিয়ে নিজে ঘরের বাইরে চলে এল।

লীজা ভারতে এসেছিল অনেক কিছু কাজ করবার সংকল্প মাথায় নিয়ে। ভারতে এসে সে কারুশিল্পের নমুনা সংগ্রহ করবে, খুব ঘুরে বেড়াবে, অনেক ছবি তুলবে, নিজে বাঘের পিঠে বসে ফটো তোলাবে, হ্যান্ ত্যান্ কত কী। এখানে এসে ওর কপালে জুটল চাঁদি-ফাটা রোদ, প্রকাণ্ড বাংলোয় বন্দীর জীবন, শেষ হতে না চাওয়া দিনমান আর গৌতম বুদ্ধের প্রস্তরমূর্তি আর টিকটিকি আর সাপ···। বাংলোর বাইরের জীবনও নিতান্ত একঘেয়েমিতে ভরা—সেই ক্লাব, ইংরেজ অফিসারদের মেমসাহেব, কমিশনারের ঝিবি—যত না কমিশনার, তার চেয়েও এককাঠি বাড়া কমিশনারের স্ত্রী—ব্রিগেডিয়ারপত্নীর উচ্চনীচ ভেদ করে মেলামেশা। এবং বড় অফিসারদের স্ত্রীরাই দলে ভারী। তার কারণ, রিচার্ড'ও যে তখন ছোট অফিসার। ক্লাবে শনিবার রাত্রে নাচের আসর বসত। অন্য দিনগুলোতে পার্টি। তবু লম্বা দিনগুলো কিছুতেই যেন কাটতে চাইত না। আর সেই সময়ই বীয়ারে ওর নেশা ধরে গেল। ঘরে আসতে যেতে ওর মেজাজ বিগড়ে যেত আর খালি গেলাসভর্তি বীয়ার ঢেলে নিত। একঘেয়েমির ক্লান্তি দূর করার ও ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিল না।

'তোমার শিরায় নিশ্চয় জার্মান রক্ত বইছে, তাই বীয়ার তোমার এত পছন্দ।'

রিচার্ড ঠাট্টা করে বলত। কিন্তু লীজার বীয়ারের অভ্যেস ক্রমেই বেড়ে গেল। কখনও কখনও লাঞ্চে বাড়ি ফিরে রিচার্ড দেখত চোখ ঢুলুঢুলু করে লীজা অসাব্যস্ত অবস্থায় সোফায় পড়ে রয়েছে। চুম্বন, আলিঙ্গন আর হেঁচকি তোলার মধ্যে বার বার প্রতিজ্ঞা করত আর সে অত বীয়ার খাবে না। কিন্তু পরের দিন তার আবার সেই অবস্থা। দিন আর কাটতে চায় না।

লীজা এবার বিলেতে গিয়ে যথেষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঠিক করেছিল, এখন থেকে রিচার্ডের মন যুগিয়ে চলবে। শুধু তাই নয়। তার প্রশাসনিক কাজেও সে যেমন রিচার্ডের পাশে থাকবে, তেমনি সর্বজনীনহিতকর কাজেও অংশীদার হবে।

লীজা মনে মনে ভাবতে লাগল—প্রাণীদের রক্ষার জন্যে যে সংস্থা গড়া উঠছে তার কী কাজকাজ হবে। লীজা সেই সংস্থার কাজে কিভাবে জড়িত থাকবে।...হঠাৎ ওর মন ছোঁক ছোঁক করে উঠল, খানসামা আসতেই তাকে সে বীয়ার আনতে বলল। খানসামা নতুন লোক। লীজার এই স্বভাবদোষের কথাটা সে জানত না। লীজা কি নিজেই অলিগলি আর রাস্তাঘাটে ঘুরে যতসব অথর্ব ঘোড়া আর বেওয়ারিশ কুকুর মেরে বেড়াবে ? কী ধরনের কাজ হবে সেটা ? নাকি জেলার প্রথমা রমনী হওয়ার সুবাদে সে শুধু মাথায় বসে থাকবে আর যত কাজ সব অধস্তনেরাই করবে ?

লীজার এক অদ্ভুত মনের অবস্থা হল। একদিকে একঘেয়েমির ক্লান্তির ভয়, অন্যদিকে জেলার নগরলক্ষ্মী, জেলাধিপতির পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য। ডজন ডজন চাকর। এক বিশাল বাংলো, যার একদিকটা শূন্যতায় ভোঁ ভাঁ করে আর অন্যদিকেটা তার দাপটে গমগম করে।

'মেমসা···ব !'

খানসামা হুজুরে হাজির।

'আমার ঘরে ড্রেসিং টেবিলে একটা মরা টিকটিকি পড়ে আছে। যাও, ওটা ফেলে দিয়ে এস।' লীজার গলায় কর্তালির সুর।

খানসামা সেলাম ঠুকে 'জী, হুজুর' বলে চলে গেল।

লীজা ঘুরতে ঘুরতে বারান্দার দিকের জানলায় এসে দাঁড়াল। পর্দাটা সরাতেই জ্বলন্ত কাঁচের মত চোখধাঁধানো রোদের দেখা মিলল। সেই সঙ্গে তার চোখে পড়ল বারান্দায় একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে রিচার্ডের অল্পবয়সী অফিসবাবু চিঠিপত্র ঝাড়াই-বাছাই করছে। গায়ের রং ময়লা, দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। যখনই রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবারই দুদফা 'ইয়েস, স্যার' 'ইয়েস, স্যার' করে নেয় আর ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় কাত করে। অফিসবাবুকে দেখে লীজা হাসল। বাবুটি ইংরিজি জানে। ওকে ইংরিজি বলতে দেখে লীজার খুব আনন্দ হয়েছিল। লীজা ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'বাবু !' রিচার্ডের দেখাদেখি লীজাও ওকে বাবু বলে ডেকে দরজার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

বাবু তার ফাইলটা চাপা দিয়ে রেখে একছুটে লীজার সামনে এসে 'ইয়েস স্যার ! ইয়েস ম্যাডাম !' করে দাঁড়াল। বাবুর ছিল শ্যামলা রং আর দাঁত বেহদ্দ সাদা। আর ঘাড়ের সঙ্গে বাবুর শরীরটা যেন প্যাঁচ দিয়ে জোড়া ছিল। কেননা ওর প্রত্যঙ্গ-গুলো সব সময় ঝটকা খেয়ে লটর-পটর করত, কখনও ডান কাঁধ ঝুঁকে পড়ত কখনও বাঁ হাঁটু ভাজ হয়ে যেত, কিন্তু মুখ হাঁ করে থাকায় ওর সাদা সাদা দাঁতগুলো সব সময় ঝকমক করত।

'য়ু হিন্ডু, বাবু ?'

'ইয়েস, ম্যাডাম !' একটু সলজ্জভাবে বাবু উত্তর দিল।

লীজা ঠিকঠাক নিজে আন্দাজ করতে পেরে হেসে উঠল।

'আই গেসড্ রাইট !'

'ইয়েস, ম্যাডাম !'

লীজা ওর দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে লীজা ধোঁয়ায় পড়ে গেল। ও কিসের ভিত্তিতে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিল? পরনে ওর প্যান্ট-কোট-টাই। লীজা চিন্তায় পড়ে গেল। কী চিহ্ন দেখে কাউকে বলা যায় সে হিন্দু। লীজা উঠে দাঁড়িয়ে মাথার চুলে হাত চালিয়ে দিয়ে যেন আকাশপাতাল কী খুঁজছে। বাবু লজ্জায় পড়ে গেল। বয়স তার তিরিশ হলেও এক নাগাড়ে দশ বছর সে এই আপিসে স্টেনোর কাজ করছে। ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রীদের মধ্যে লীজাই প্রথম তার সঙ্গে আটপৌরেভাবে কথা বলছে। অন্য ডি-সির স্ত্রীরা তার সামনে এসে কাঠখোট্টা ভাব দেখিয়ে নাক সিঁটকে চলে যেত।

বারান্দার কোলে রান্নাঘরে যাবার রাস্তায় ছোট্ট উঠোনটাতে দাঁড়িয়ে খানসামা, বাগানের মালী আর কিচেনের রসুইকর ওদের দেখছিল।

'নো, ইজ্‌ন্‌ট্‌ দেয়ার !' লীজা বলল। বাবুটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সির সির করছে। লজ্জায় ওর হাসি-ফোটানো ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

'য়ু আর নো হিন্ডু, য়ু টোল্ড্‌ এ লাই !'

'নো ম্যাডাম, আই অ্যাম এ হিন্দু। এ ব্রাহ্মণ হিন্দু।'

'ও নো, দেন্‌ হব্যার ইজ য়ুঅর টফ্‌ট্‌ ?'

বাবুর ভয় ছিল। শহরে দাঙ্গার আতঙ্কের মধ্যে অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে আপিসে এসেছে। তবে লীজার কথায় তার ধড়ে প্রাণ এল। ওর কালো চেহারার চালচিত্রে সাদা দাঁত ঝিলিক দিল।

'আই হ্যাভ্‌ নো ট্যাফ্‌ট্‌, ম্যাডাম !'

'দেন্‌ য়ু আর নো হিন্ডু !'

লীজা ওর দিকে নিজের তর্জনী নেড়ে হাসতে হাসতে বলল: 'য়ু টোল্‌ড্‌ এ লাই !'

'নো ম্যাডাম ! আই অ্যাম এ হিন্দু !'

লীজা বলে উঠল, 'টেক আফ্‌ য়ুঅর কোট্‌, বাবু !'

'ওহ্‌, ম্যাডাম !' বাবু আবার লজ্জায় পড়ল।

'টেক্‌ অফ্‌, টেক্‌ অফ্‌ ! হারি !'

বাবু হাসতে হাসতে কোট খুলে ফেলল।

'ভেরি গুড্‌, নাউ আন্‌বাট্‌ন্‌ য়ুঅর শার্ট !'

'বাট্‌, ম্যাডাম !'

'ডোন্ট্‌ সে, বাট্‌ ম্যাডাম। সে, আই বেগ য়ুঅর পাড্‌ন্‌, ম্যাডাম ! অল রাইট আন্‌বাট্‌ন্‌ য়ুঅর শার্ট !'

বাবু অসহায়ভাবে লীজার সামনে দাঁড়িয়ে উঠে নেকটাইয়ের নিচে হাত গলিয়ে একেক করে তিনটে বোতাম খুলে দিল।

'শো মি য়ুঅর থ্রেড।'

'বাট, ম্যাডাম !'

'য়ুঅর থ্রেড. বাট্ ম্যাডাম ! শো মি য়ুঅর হিন্ডু থ্রেড।'

বাবু বুঝতে পারল। মেমসাহেব পৈতের কথা বলছেন। বাবুর গলায় পৈতে ছিল না। দশম শ্রেণী থেকে পাশ করে কলেজে উঠে প্রথমে কেটে ফেলে টিকি, তারপর দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠে গলার পৈতেটাও বিসর্জন দেয়।

'আই হ্যাভ্ নো থ্রেড, ম্যাডাম।' মুখ হাসি-হাসি করে সরোষে বলল।

'নো থ্রেড, দেন্ য়ু আর নো হিন্ডু।'

'আই অ্যাম এ হিন্দু, ম্যাডাম। আই শ্যার বাই গড্, আই অ্যাম এ হিন্দু।', আবার ও ভয় পেল।

'নো, য়ু আর নো হিন্ডু, য়ু টোলড্ এ লাই। আই শ্যাল্ টেল্ য়ুঅর বস্ অ্যাবাউট ইট।

বাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শার্টের বোতাম এঁটে কোট পরতে পরতে শুক্‌নো মুখে বলল, 'আই টেল য়ু সিন্সিয়ারলি, ম্যাডাম—আই অ্যাম্ এ হিন্দু, মাই নেম্ ইজ রোশনলাল।'

'রোশনলাল। বাট্ দি কুক্‌স্ নেম ইজ্ রোশনডিন, অ্যান্ড হি ইজ এ মুসলমান।'

বোঝানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে দেখে বাবু বলল, 'ইয়েস্, ম্যাডাম। হি ইজ রোশনদীন, ম্যাডাম—আই অ্যাম রোশনলাল। আই অ্যাম এ হিন্দু, হি ইজ এ মুসলিম।'

'নো, রিচার্ড টোল্‌ড্ মি য়ু পিপ্‌ল্ হ্যাভ্ ডিফ্‌রেন্ট নেম্‌স্।'

তারপর আবার বাবুর দিকে তর্জনী তুলে গলার স্বরে কপট ক্রোধ দেখিয়ে লীজা বলল, 'নো বাবু, ইউ টোল্‌ড্ এ লাই। আই শ্যাল্ টেল্ য়ুঅর বস্।

বাবুর গলা শুকিয়ে গেল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। শহরে গোলমাল বাধার কারণে এই জিজ্ঞাসাবাদ নয়ত! মেমসাহেবের মতলবটা কী?

হঠাৎ লীজা খিঁচ্‌ড়ে গেল।

'গো বাবু! আই শ্যাল্ টেল্ এভ্‌রিথিং টু য়ুঅর বস্।'

বারান্দার মেঝে থেকে নিজের ফাইলপত্র তুলে নিয়ে বাবু পেছন ফিরল। যখন সে বারান্দা পেরোচ্ছে, তখন লীজার ডাক তার কানে এল: 'বাবু……!',

বাবু ফিরে এল।

'কাম হিয়ার!'

সামনে আসতে গম্ভীর ভাব করে লীজা বলল, 'হ্যার ইজ্ য়ুঅর বস্?'

'ইন্ দি অফিস, ম্যাডাম। হি ইজ ভেরি বিজি, ম্যাডাম।'

'অল রাইট, গো। য়ু অ্যান্ড য়ুঅর বস্! গো! গেট আউট অফ্ হিয়ার!' লীজা চিৎকার করে বলল।

'ইয়েস, ম্যাডাম' বলে বাবু ফের কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল।

বাবু চলে যাবার পরই লীজার যেন গা গুলিয়ে উঠল। ওর হাসি-হাসি ভাব চলে গিয়ে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ওর ভাবান্তর ঘটল। বাবুকে কাঁধ ঝুঁকিয়ে যেতে দেখে

ওর মনে হতে লাগল, যেন কোনো চটচটে জীব চলে যাচ্ছে। রিচার্ড যে কী করে সারাটা দিন এইসব লোকের সঙ্গে কাজ করে, কে জানে! ওর মনের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর 'হুঃ' শব্দ। আর তারপর সে বাংলোর ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

আট

শহরের সব কাজকারবার ভাগ করা ছিল। বেশির ভাগ কাপড়ের দোকান হিন্দুদের ছিল, জুতোর দোকান মুসলমানদের, মোটর-লরির সব কাজ ছিল মুসলমানদের হাতে, আনাজের ব্যবসা হিন্দুদের হাতে। টুকিটাকি কাজ হিন্দুরাও করত, মুসলমানরাও করত।

শিবালয়ের বাজার বিয়ের কনের মুখের মত ফুটফুটে ছিল। ওখানে রোজই এমনি জমজমাট ভাব থাকে। দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না কোথাও উত্তেজনা আছে। স্যাকরার দোকানগুলোতে বোরখা-পরা গাঁয়ের মেয়েরা চাঁদির গয়না কেনা বা বানানোর জন্যে জায়গায় জায়গায় বসে। হেকিম লাভরামের দোকানের সামনে দুজন কাশ্মীরী মুসলমান নাক-মুখ ঢেকে, জড়িবুটি কুটছিল। কুঁজো হালুইকরের দোকানে মোটের ওপর রোজকার মতই ভিড়। ফেরিওয়ালা সন্তোরাম আজও ঠিক একটার সময় তার ঠেলাগাড়ি আস্তে আস্তে চালিয়ে সোনাপট্টি ছাড়িয়ে শিবালয়ের বাজারে এসে গিয়েছিল। আর তারপর রোজকার মতই দর্জি খোদাবক্স আর তার দুভাইয়ের জন্যে আধ ছটাক করে মোহনভোগ আলাদা তিনটি পাতায় মুড়ে তাদের দিচ্ছে।

পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সকালের ঘটনা থেকে উদ্ভূত উত্তেজনা কিছুটা থিতিয়ে গিয়েছিল। তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। রাস্তায় লোকের চলাচল ছিল। খোদাবক্সের দোকানের সামনে, গলির মোড়ে কমিটির নিযুক্ত এক কর্মী মই দিয়ে উঠে দেয়ালে লাগানো আলোর চিমনি সাফ্ করছিল আর ল্যাম্পে তেল ভরছিল। শহরের কাজকর্ম আবার যে-কে সেই সঙ্গীতের লয় অনুযায়ী চলতে শুরু করেছে। যখন ঘাড়ে পিঠে রকমারি শিশি ঝুলিয়ে আতরওয়ালা ইব্রাহিম এ-গলি ও-গলি হাঁক দিয়ে শান্ত ভাবে হেঁটে যেতে থাকে, তখন মনে হয় যেন নগরের এই ছন্দেই তার পা ওঠাপড়া করছে। এই ছন্দেই মেয়েরা কাঁখে ঘড়া নিয়ে রাস্তার কলে জল আনতে যায়। এই ছন্দেই রাস্তায় টাঙ্গা চলে। এর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে বাচ্চারা স্কুলে যায়। দেখে মনে হয়, শহরের সব কাজ যেন কোনো মিষ্টি সুরে স্বচ্ছন্দে হয়ে চলেছে। এর একটা তারও যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে গোটা সঙ্গীতেরই সুর কেটে যাবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, একটা শহরের যাবতীয় কাজকর্ম মিলে এমন এক শাশ্বত সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় যা শহরের হৃৎস্পন্দনের তালে তালে বাজতে থাকে। এরই ছন্দে শহরের লোক জোয়ান হয়, বুড়োও হয় এই একই ছন্দে। এরই সঙ্গে

তাল দিয়ে একেক পরম্পরায় মানুষ জীবনের পালা শেষ করে দিয়ে চলে যায়। একে তুমি সঙ্গীত বলতে পারো, কিংবা একটা সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড বলতে পারো যাতে ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধ, জনসমূহের আপন সম্বন্ধ—সমস্তই একটি বিশেষ ধারায় নির্ণায়িত হয়ে যায়···।

একথা তো বলা যাবে না যে, শহরের জীবনে ঢেউ ওঠে না। কংগ্রেসের যখন আন্দোলন হয় তখন সারা শহর চনমন করে ওঠে। প্রতি বছর গুরুপূর্ণিমার সময় যখন শিখদের মিছিল বেরোয় তখন শহর টগবগ করে ফোটে। জামা মসজিদের সামনে দিয়ে সেই মিছিল বাজনা বাজিয়ে যাবে কি যাবে না, মিছিলে ইঁট পাটকেল পড়বে কি পড়বে না, তাই নিয়ে কত দুর্ভাবনা। মুসলমানদের তাজিয়া বার হয়, 'হায়-হাসান হায়-হুসেন' বলতে বলতে বুক চাপড়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন মহরমের মিছিল বেরোয় তখনও শহরের বুক কেঁপে ওঠে। এরপর আবার সব থিতিয়ে যায়। জনসাধারণের জীবনের গতি এই চালেই চলতে থাকে। পরিবেশ আবার ঠাণ্ডা হয়। লোকে আবার হেসে-খেলে দিন কাটাতে থাকে।

দর্জি খোদাবক্সের দোকানে সর্দার হাকিম সিং-এর বউ এসে কড়কায়। 'এই বক্সা, তুই কি কাপড় সেলাই করে দিবি, না রোজ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি?

খোদাবক্স হেসে ফেলে। শহরের যত হিন্দুর মেয়েরা, সর্দারনীরা, বিশেষ করে ছুঁৎ-পোষা ঘরের মেয়েরা তাকে বক্সা বলেই ডাকে। বক্সার দোকানে বিয়ে-সাদির সেলাইয়ের জন্যে কাপড়ের ডাঁই জমে যায়। 'যখন আমি বলতাম—ও বিবি, কাপড় আন, ও বিবি কাপড় আন। তখন তো আমার কথা গায়েই মাখো নি। গোটা শীত যখন চলে গেল, এখন তো সময় লাগবেই। আমার তো আর দশটা হাত নেই।'

'কেন? কে বলল শীত গিয়েছে?'

'কেন-কী বলছ? শিবরামের ব্যাটার বিয়ের পনেরো দিন পর, কেন, তোমার বেটির পাকা দেখা হয় নি? সেটা কোন্ মাস ছিল!'

হাকিমের বউ হাসল।

'দেখছি সব খবরই রাখিস তুই, এখন বল আমার বেটির বিয়ের সাজ কবে দিবি।'

'বিয়ে কবে?'

'শোনো কথা। বেটির আশীর্বাদের দিন জানো, কবে বিয়ে সেটা জান না?'

'পঁচিশ তারিখে তো? আজ হল গিয়ে কত তারিখ? পাঁচ তারিখ। ঠিক আছে, দিয়ে দেব।'

'দিয়ে দেব নয়, কবে দিবি? নইলে বিয়ের দিন অবধি ঘুরিয়ে মারবি, আমি যেন তোকে চিনি না!' বিদ্যার বিয়েতেও তুই এই হাল করেছিলি। এদিকে বরযাত্রী আসছে, ওদিকে জরির সাজের জন্যে লোক পাঠিয়ে মরছি। ঠিক ঠিক বল্, কবে দিবি?'

মহিলাটির কথা বলার সময়ই খোদাবক্সের পেছন থেকে কেউ একটা কাপড়ের পুঁটলি ওর ঝোলার মধ্যে গুঁজে দিল। সবুজ রঙের রেশমী কাপড়, তার সঙ্গে চুমকিদার

বর্ডার : 'বক্সা, কাপড়ের মাপটা নে, আর দরকার হলে বুদ্ধ সিং-এর দোকান থেকে আমার নাম করে যতটা দরকার নিয়ে নিস'।

ইনিও মহিলা। খোদাবক্স কাপড়টার এককোণে জিব দিয়ে ভিজিয়ে, তারপর কানে-গোঁজা পেনসিলটা বার করে কাপড়ে দাগিয়ে পাশের আলমারিতে রেখে দিল। আলমারিটা বিয়ে-সাদিতে সেলাইয়ের জন্যে রাখা কাপড়ে ঠাসা ছিল।

'দিয়ে দেব, ঠিক দিয়ে দেব। নিজে বাড়ি বয়ে পেঁৗছে দিয়ে আসব।'

'তুই বড্ড কথা বলিস। আর এবার যদি কথামতো কাপড় না দিস, তো জন্মেও আর তোর দোকান মাড়াব না।'

এই বলে হাকিম সিং-এর গিন্নি দোকান থেকে চলে গেলেন।

উনি গেলে খোদাবক্সের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল শিবালয়ের পাঁচিলে। পাঁচিলের ওপর একটা লোক। খোদাবক্স ভালো করে চেয়ে দেখল। ও তো গুর্খা পাহারাওয়ালা, কিন্তু ও লোকটা ওখানে কী করছে? পাঁচিলের পেছনে শহরের পুরনো মন্দিরের ঝকমকে চুড়ো অনেক দূর থেকে দেখা যায়। এই মন্দিরের ওপর একটা ঘণ্টাঘড়ি লাগানো ছিল। গুর্খা পাহারাওয়ালা সেই ঘন্টাঘড়িটা সাফ করছিল। খোদাবক্সের পাশে বসে ওর যে লোকটা মেশিনে কাপড় সেলাই করছিল, তাকে খোদাবক্স বলল :

'দেখ তো, ওটা কী ব্যাপার?'

সে বলল, 'ঘণ্টাটা ঠিকঠাক করছে।'

খোদাবক্সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ইয়া আল্লা।'

'শহরে গোলমাল বাধার ভয় আছে……'

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল।

ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার পর ওই ঘণ্টাঘড়িটা লাগানো হয়েছিল। তখন থেকে আজ এই এতদিন। তার আর সে চেকনাই নেই। রোদবৃষ্টিতে তার আশাপাশের দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে। প্রথম দাঙ্গার সময় খোদাবক্স ছিল বিশ-বাইশ বছরের যুবক। ওর তখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো আর শরীর চর্চা করার ঝোঁক ছিল। সে তখন তার বাপের এই দর্জির দোকানে এসে বসত। ঘণ্টাঘড়িটা লাগানো হয়েছিল সেই আমলে। খোদাবক্স এখন মাঝবয়সী হতে চলেছে। এখন এ শহরে এমন কম বিয়েই হয় যেখানে বাড়ির লোকে কাপড় সেলাইয়ের জন্যে তার কাছে না আসে। পাঁচিলে চড়েছিল যে গুর্খা রামবলি, সেও পুরনো দিনের পাহারাওয়ালা। ঘণ্টাঘড়িটা তার হাতেরই লাগানো। সেবারের দাঙ্গার পর নিজের কর্মদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা আর বিশ্বস্ততার গুণেই আজও সে তার চাকরিতে বহাল আছে। এই দশ বছরে ও অনেকটা টসকে গেছে। বয়সের রেখা পড়েছে, কানের লোমগুলো সাদা হয়ে গেছে। তবু শিবালয়ের চৌকিদারিতে সে আগের মতই চৌকস।

ঘণ্টাঘড়ির হাল্কা ঠুনঠান আওয়াজ শোনা গেল। ফের খোদাবক্সের চোখ পড়ল পাঁচিলের দিকে। গুর্খা রামবলি ঘণ্টার সঙ্গে নতুন দড়ি বাঁধছিল। তাতেই ঘণ্টাটা

নড়ে উঠে ঠনঠন শব্দ হয়েছে। ঘণ্টার সারা গায়ে তেল মাখানোর ফলে সে ঝকঝক করছে।

খোদাবক্স বলল, 'এই ঘণ্টার আওয়াজ শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আগের দাঙ্গায় এটা যখন বাজে, তখন বড়বাজারে আগুন লেগেছিল আর তার হল্কায় অর্ধেক আকাশ ঢেকে গিয়েছিল।'

পাঁচিলের ওপর রামবলি তখনও ঘণ্টা ঝাড়পোঁছ করে যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সামনেই কোনো পালাপার্বণ। পেতলের মাজা বাসনের মতো ঘণ্টাটা চকচক করছিল। তার সঙ্গে ঝুলছে মোটা নতুন কাছি।

খোদাবক্সের নজর ঘণ্টা থেকে সরে পাশের স্যাকরার দোকানে গেল। সেখানে বোধহয় গ্রাম থেকে আসা, সস্ত্রীক একজন মাঝবয়সী লোক মেয়েকে একজোড়া মাকড়ি নিতে বলছিল।

'মনে ধরলে নিয়ে নে। জলদি কর। আরও অনেক কেনাকাটার আছে। শেষ করে গাঁয়ে ফিরতে হবে।'

মেয়েটার চোখ চকচক করছিল। একবার করে সে মাকড়িটা কানের কাছে নিয়ে যায় তারপর ঘুরে লজ্জা-লজ্জা করে মাকে দেখায়।

'কেমন লাগছে মা?'

লজ্জা পেয়ে মেয়েটি ঠিক করে উঠতে পারছিল না—মাকড়িটা ওকে মানাবে কিনা, মাকড়িটা সে কিনবে কিনা।

খোদাবক্সের দৃষ্টি আবার ফিরে গেল মন্দিরের পাঁচিলের দিকে। চৌকিদার বুড়ো তখন নেমে আসছিল। চকচকে ঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা কাছিটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছিল। খোদাবক্সের মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল: 'ইয়া আল্লা'! বলে সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ওদিকে ফজলদীনের রুটির দোকানে আড্ডা জমে উঠেছিল। দুপুর গড়িয়ে গেলে কাজকর্ম যখন কমে আসে, আশপাশের ইয়ার-বন্ধুরা আসে খোশগল্প করতে আর গড়গড়ায় টান দিতে দিতে চলে ওদের যত রাজ্যের গল্পগুজব। আজ সকালের ঘটনা দিয়েই কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। কিন্তু কথায় কথায় এমন একটা বিষয় এসে পড়ল যার সূত্রে বৃদ্ধ করিমখান বলতে লাগলেন—হাকিমদের মনের তল পাওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। হাকিম ভাবেন দূর ভবিষ্যতের কথা। তাঁর সব সিদ্ধান্তের পেছনে দূরদৃষ্টি থাকে। তিনি যতটা দেখতে পান, সাধারণ মানুষে ততটা দেখতে পায় না।

করিমখান বলছিলেন: 'মুসা একদিন খিজরকে বললেন—তুমি আমাকে তোমার সাকরেদ বানিয়ে নাও—শুনে নে, জিলানী! শোন! এ গল্পে মজা পাবি। শিক্ষাও হবে।

'মুসা ছিল ছোট, ও চাইছিল পয়গম্বর হতে। তখনও হতে পারেনি। কিন্তু হতে চাইছিল। খিজর তো, বুঝলে, তার আগেই পয়গম্বর হয়েছে। বয়সেও বড় ছিল।

সবাই তাকে খাতির যত্ন করত'—করিমখান বলে যাচ্ছিলেন। ওর ছোট ছোট চোখ সব সময় হাসতে থাকত। যখন হাসতেন তখন উরুতে চাপড় মারতেন। তখন আশপাশের সবাই হেসে উঠত।

'তো একদিন মুসা খিজারকে বললেন, আমাকে তোমার সাকরেদ করে নাও। খিজর বললেন ভালো কথা, বানিয়ে নেব, তবে একটা শর্তে। মুসা জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত? খিজার বললেন, শর্ত এই যে তুমি কথা বলবে না, আমি যাই করি তুমি মুখে ছিপি এঁটে রাখবে! মুসা বললেন, রাজি আছি। শুনে খিজর তাকে সাকরেদ করে দিলেন।

'এদিকে খিজর চাইছিলেন মুসাকে শিক্ষা দিতে। দেখার জন্যে আছেন খোদাবন্দতালা। আমরা মানুষেরা তো কিছুই দেখতে পাই না। আমরা তো আমাদের বুদ্ধি ঘটে কেবল যুক্তি আর তর্ক খুঁজি। সব কিছুই থেকে যায় আমাদের হাতের বাইরে কেননা দেখবার একজনই আছেন। তিনি খোদাবন্দ করিম। তো খিজর বললেন তুমি কথা বলবে না। আমি যাই করি আর যাই বলি না কেন, তুমি চুপ করে থাকবে।'

বলে করিম খাঁ গড়গড়া নলটা এগিয়ে দিলেন। জিলানী টান দিতে লাগলেন দুপুর গড়িয়ে গেলে ভিস্তিওয়ালা দোকানের সামনে জলের ছিটে দিচ্ছিল। হাওয়ায় ভেসে আসছিল ভিজে মাটির সোদা গন্ধ। রাস্তায় লোকচলাচল কমে এসেছিল। কিছু লোক যে একে একে জামা মসজিদে দিনমানের নমাজ পড়তে যাচ্ছে, সেটা চোখে পড়ছিল।

'তারপর কী হল, আরেকদিন খিজর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিলেন। মুসাও যাচ্ছিলেন তাঁর পেছনে পেছনে। পরে মুসা হয়েছিলন খুব বড় পয়গম্বর, কিন্তু সেই সময় তিনি খিজরের চেলা।—শোন্ জিলানী, ভালো করে শোন্! এই গল্পে শিক্ষা হবে, মজা পাবি।—দুজনে তো যাচ্ছেন। এবার রাস্তায় নদী পড়ল। নদীর ধারে একটা কিস্তির নৌকো বাঁধা ছিল। তাইতে লোকে নদী পারাপার করত। এইবার কী হল, দুজনে নিচে নেমে কিস্তির নৌকোয় উঠে বসলেন। আর খেয়ামাঝি তাদের নদী পার করতে লাগল। তো খানিক দূর গিয়ে মুসা দেখলেন খিজর নৌকোর তলায় ফুটো করছেন। নৌকো ছিল, একেবারে নতুন যেন আনকোরা তৈরি হয়ে এসেছে। আর খিজর কিনা সেই নৌকোরই তলা ফুটো করছেন। একটা ফুটো করার পর আরেকটা ফুটো করলেন, তারপরেও আরেকটা। মুসা চেঁচিয়ে উঠলেন—আজ্ঞে, এ আপনি কী করছেন? নৌকো ডুবে যাবে। আমরা দুজনেই ডুবব।

'খিজর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে মুসাকে চুপ করতে বললেন। মুসা ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন। কেননা নৌকোয় তখন জল উঠছে। মুসার ভয় হচ্ছিল—নৌকো এই ডোবে। মুসা চুপ করে গিয়েছিলেন। কেননা খিজরকে তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন। একটু পরেই খিজর নৌকোর ফুটোগুলো একে একে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নৌকোর তলাকার অবস্থা খুবই কাহিল

হয়ে দাঁড়িয়েছিল।—এইভাবে দুজনে তো পার হলেন—পার তো হলেন—আল্লা রহম কর—দুজনে যাচ্ছেন, সেই সময় একটি ছোট্ট ছেলে মাটিতে বসে খেলছিল। বাচ্চাটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে খিজর কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে ছেলেটার ঘাড় মট্‌কে দিলেন।

'এ কী? এ কী!—মুসা চিৎকার করে উঠলেন—নির্দোষ বাচ্চাটাকে মেরে ফেললেন? কিন্তু খিজর চুপ। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে খিজর মুসাকে কোনো কথা বলতে ফের বারণ করলেন।

'অলহমদুলিল্লাহ! কিছু বলব না আমি? একজন নিষ্পাপ শিশুর ঘাড় মট্‌কে দিলেন! জানেন না, চেনেন না—এ গ্রামে আগে কোনো দিনই আপনি পা-ও দেন নি। এই নিরীহ ছেলেটা কী আপনার পাকা ধানে মই দিয়েছে?—মুসা বেজায় উচাটন হলেন। ভেতরে ভেতরে মুসাও তো পয়গম্বরই ছিলেন। যদিও তখনও তাঁর পয়গম্বরি মেলে নি। করিমখাঁ মাথা নেড়ে বললেন, 'খোদার দয়া হোক, দুজনে এগোতে থাকেন। গ্রামের শেষ প্রান্তে ছিল একটা পুরনো ভাঙাচোরা পাঁচিল। মুসা তো এক লাফেই সেটা পেরিয়ে গেলেন। কিন্তু পেছন ফিরে দেখলেন পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে খিজর ভাঙাচোরা ইঁটগুলো তুলে তুলে দেয়ালটা গাঁথতে শুরু করে দিয়েছেন। মুসা ফিরে এলেন। কাছে এসে খিজরকে বললেন—হে বয়োবৃদ্ধ! দুটো দিনও যে জীবনের মুখ দেখল না, সেই বাচ্চাকে তো আপনি বেশ যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে যে পাঁচিলটা বছরের পর বছর ভেঙে পড়ে ছিল, সেটাকে আপনি নতুন করে খাড়া করে দিলেন। ব্যাপারটা কী? আপনার এসব জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'খিজর আঙুল তুলে ফের মুসাকে চুপ করে যেতে বললেন। মুসা মুখ বন্ধ করলেন।

'ওঁরা তারপর আবার এগিয়ে চললেন। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। শেষে একটা বাগানে পেঁছলেন। সেখানে ছিল গাছের ছায়া-ঘেরা একটা ফোয়ারা। দুজনে সেই ফোয়ারার জলে হাত মুখ ধুয়ে গাছের নিচে বসলেন। খিজর তখন বললেন—

'শোন্ বাছা! ঐ যেখানে আমি নৌকোয় ফুটো করেছিলাম আর তাই দেখে তুই বিগড়ে যেতে থাকলি—আসলে কী জানিস? ঐ গ্রামের হাকিম ভীষণ অত্যাচারী। নিজের ফুর্তির জন্যে সে গরিব লোকদের নৌকো কেড়ে নিত। আমি দেখলাম নৌকোটাতে ছেঁদা করে দিলে হাকিমের লোকজনেরা তাহলে আর ঐ নৌকো তুলে নিয়ে যাবে না। আর তাহলে পাটনীর রোজগারে টান পড়বে না।

—মুসা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। শোনার পর বললেন—সে না হয় হল, কিন্তু আপনি ঐ নিষ্পাপ শিশুটাকে কেন মারলেন?—খিজর বললেন, শোনো বৎস। ও ছিল হারামের বাচ্চা, হালালের বাচ্চা নয়। ও যার সন্তান, সেই লোকটা ছিল যেমনি নৃশংস, তেমনি নোংরা। আমি ঐ ছেলেটাকে

এই জন্যেই মেরেছি যে, তা নইলে সে বড় হয়ে ওর বাপের মতই নৃশংস হত। নিষ্পাপ লোকদের ওপর জুলুম করত। এইবার বলো, আমি ঠিক করেছি, না অন্যায় করেছি ?

'মুসা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ওঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল—কিন্তু আপনি ঐ ভাঙাচোরা পাঁচিলটা কেন মেরামত করতে গেলেন ? ওটা দিয়ে কার কী হবে ?

'সেটাও বলি।—খিজর বললেন : ঐ যে ভাঙাচোরা পাঁচিলটা আমি সারালাম তার নিচে গুপ্তধন আছে। এক বিশাল গুপ্তধন। কিন্তু গ্রামের লোকে তার কোনো হদিশই রাখে না। গ্রামের লোকগুলো বেজায় গরিব। তারা খুবই অভাবী। আমি ওদের সাহায্য করতে চেয়েছি। পাঁচিলটা আমি মজবুত করে দিয়েছি। লোকে যখন চাষ বাড়াতে বাড়াতে গ্রামের শেষ প্রান্তে পেঁছে যাবে, তখন পাঁচিলটা তাদের কাছে প্রতিবন্ধক বলে বোধ হবে। তারপর একদিন তারা ঐ পাঁচিল ভেঙে ফেলে এককেকটা ইঁট খসিয়ে নিয়ে ক্ষেতের বাইরে ফেলে দেবে। তখন ঐ পাঁচিলের নিচে পুঁতে রাখা গুপ্তধন তাদের হাতে এসে যাবে। তখন ধনে ধান্যে ওদের ঘর ভরে উঠবে। ওদের তখন মিলবে পরনের কাপড় আর ঘরে ঘরে থাকবে ক্ষুধার অন্ন। এইবার বলো আমি কাজটা খারাপ করেছি ?'

গল্প শেষ করে করিমখাঁ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সঙ্গীদের প্রত্যেককে একে একে দেখে তারপর বললেন : 'এটা বলার মানে হল এই, যে জিনিস হাকিম দেখতে পান, সে জিনিস কখনই তুমি-আমি, আমরা সাধারণ মানুষেরা দেখতে পাই না। ইংরেজ হাকিমের চোখ চারদিকে দেখতে পায়, নইলে এটা কেমন করে সম্ভব হল যে, মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি সাতসমুদ্র পেরিয়ে এত বড় দেশে রাজা হয়ে বসল! ইংরেজদের যেমন আক্কেলবুদ্ধি, তেমনি ওরা পরিণামদর্শী'।'......

'বটেই তো! বটেই তো!' সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বলে উঠল করিমখাঁর আশপাশে বসা শ্রোতার দল।

ফজলদীনের নানরুটির দোকানের অন্য একটা দিকে বসে ছিল নাথু। সামনে কফির পেয়ালা রেখে তাতে লম্বা এক-ফালি রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছিল। আর সেইসঙ্গে করিমখাঁর মুখে গল্প শুনছিল। করিমখাঁর কথা শুনে ওর বিশ্বাস হল। শুয়োরের চক্কর থেকে বেরোবার পর থেকেই নাথু সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে। যেখানেই দুদণ্ড বসে, সেখানেই শোনে লোকে শুয়োর নিয়ে আলোচনা করছে। রাস্তায় যেতে কান খাড়া করে সে শোনে কে কী বলছে। কখনও কখনও ওর মনে হয় লোকে বোধহয় অন্য কোনো শুয়োরের কথা বলছে, নাথু যে শুয়োরটা মেরেছে তার কথা নয়। কখনও কখনও তাদের কথা শুনে নাথুর মন ভেঙে যায়। এখানে, এই রুটির দোকানেও শুয়োরের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রবীণ মানুষটির কথা শুনে সে মনে জোর পেল। দাঙ্গাহাঙ্গামা যদি না হয়, তাহলে

শুয়োরের ব্যাপারটা নিয়ে কেউই আর তেমন মাথা ঘামাবে না। সরকারের চোখের ওপর সব কিছু থাকলে কোনো অঘটন ঘটতে পারবে না।

নাথু আরও একবার তার পকেটটা ছুঁয়ে দেখল। করকরে নোট। মনে আনন্দ হল। এটা ভালো যে, মুরাদ আলী গোড়াতেই পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে। তা না করে যদি নাথুর হাতে একটা আধুলি ধরিয়ে দিয়ে বলত বাকিটা পরে নিস্—তাহলেই বা নাথু চামার ওর কী করতে পারত? মুরাদআলীর বেলায় হয়েছে ভদ্রলোকের এক কথা। নাথুরও কথা রাখা উচিত ছিল। নাথু শুয়োর মারার চক্কর থেকে বেরিয়ে এসেছে, অথচ মুরাদআলীকে সে কথা দিয়েছিল যে তার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করবে। কিন্তু ঐ কুঠুরিতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু শহরে পেঁাছেই ওর রক্ত হিম হয়ে গেল। যেখানেই যায় শোনে, লোকে শুয়োর নিয়ে আলোচনা করছে।

ভেতরে ভেতরে নাথু ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। চিন্তায় চিন্তায় ও অস্থির হয়ে পড়ছিল। পেটের মধ্যে যতই হাতপা সেঁধোচ্ছে, ততই ওর ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কাকেই বা সে বলবে। কাকে কী জিজ্ঞেস করবে? ও এক মহা ধন্দের মধ্যে পড়েছে। মুরাদআলী পশুর ডাক্তারের বাহানা দিয়ে শুয়োর মারিয়ে মসজিদের সামনে কাউকে দিয়ে ফেলিয়েছে। সেটা আর কোনো শুয়োর কিনা তাই বা কে বলবে? মসজিদের সামনে পড়ে থাকা শুয়োরটাকে সে দেখেছে, ওটা নাথুর শুয়োর নয়। নাথুর মন কিছুতেই মানছিল না। আর যদি ওটা ওর শুয়োরই হয়, তাহলে? লোকে যদি জেনে যায় নাথুই শুয়োর মেরেছে, তাহলে কী হবে? মনের এই উথালপাথাল অবস্থার মধ্যে নাথু কখনও ভাবছে পালিয়ে বাড়িতে গিয়ে ভেতর থেকে শেকল লাগিয়ে শুয়ে থাকবে. কখনও ভাবছে অলিগলিতে ঘুরবে। কখনও এই, কখনও ঐ। উঁহু, বাড়ি ফিরব না। রাত হলে যাব মোতিয়া রাঁড়ীর কাছে। মোতিয়া এক চাইলে ওকে পাঁচ টাকা দেব। সারা রাত ওর কাছে থাকব।

কিন্তু দিনভর রাস্তায় টো-টো করে ঘোরার পর নিজের বউয়ের কথা ভেবে ওর খুব মন কেমন করতে লাগল। এই সময়টা বাড়িতে থাকলে নাথু তার চামার বন্ধুদের সঙ্গে বসে কল্কেয় টান দিতে পারত, দুটো কথা বলতে পারত। না, নিজের ডেরাতেই ফিরে যাব। স্নান করে কাপড় বদলে নেব, ঘরে বউয়ের সঙ্গে বসে গল্প করব। গিয়েই ওকে বুকে জড়িয়ে নেব। মুরাদআলীর নাম করার কোনো দরকার নেই। ওকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলার দরকার নেই। এই ঘিনঘিনে ব্যাপার-গুলোর কথা আদৌ বলে কাজ নেই। ওর বুকের ওপর মাথা রাখলে তাহলেই আমার প্রাণ ঠান্ডা হবে। রাঁড়ীর কাছে গেলে সে মুখ খারাপ করবে। উল্টোসিধে বলবে। ঘরের বউ চুপ করে থাকার মানুষ, তার কাছে মেলে সান্ত্বনা। মেলে সুখ। নাথু আপন মনে বলল, দুটাকা মোতিয়া রাঁড়ীকে দেওয়ার বদলে বরং ঘরের বউয়ের জন্যে কিছু নিয়ে যাব। বউ খুব খুশি হবে। বলবে, কেন এসব আনলে, আমার তো সব কিছুই আছে। বউ কখনও মুখ ফুটে কিছু চাইবে না। দূরে

থেকেও নাথুর মনে হল, বউ যেন তার বুকের মধ্যে। নাথুর মনে আর কোনো ক্ষোভ থাকছে না। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাওয়া মানুষ প্রথমেই ছুটে যেতে চায় তার স্ত্রীর কাছে। বউকে বুকে নিলে সব কষ্টের অবসান হয়। নাথু এ কথায় বিশ্বাস করছে। ওর বউ বড় ধীরস্থির মেয়ে। ভালবাসায় ওর বুক ভরা।

কফিখানা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। দোকানের বাইরে দুটো বেঞ্চি পাতা। তাতে বসে চটা-ওঠা কলাইয়ের প্লেটে মুটেমজুররা খাচ্ছে। সামনে রাখা ডালের বাটি। বেঞ্চির আড়াআড়ি ঠ্যাং ঝুলিয়ে ওরা নানরুটি ছিঁড়ছিল।

এই সময় দূরে যেন ঢোল বেজে উঠল। বাইরে বসে থাকা মুটের দল পেছন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাল। ঢোলেরই আওয়াজ। আস্তে আস্তে আওয়াজটা কাছে আসছে। কফিখানার ভেতরে বসা লোকগুলো কথা থামিয়ে দিল।

কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'ঢোল কিসের ?'

'কিছু ঘোষণা করা হবে।' একজন উত্তর দিল : 'এদিকেই আসছে।'

বলতে বলতে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উড়িয়ে এসে হাজির হল একটা টাঙ্গা। তার ভেতরে বসে একজন ঢোল পেটাচ্ছে। রুটির দোকানের প্রায় সামনে এসে টাঙ্গা থামল। সামনের সিট থেকে একজন উঠে দাঁড়াতেই ঢোল পেটানো বন্ধ হল। লোকটি দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে দিল :

'বতন ফিক্‌র্ কর জ্যাদা মুসিবত আনেবালী হ্যায়।
তেরি বরবাদিয়োঁ কে তজ করে হ্যায় আসমানো মেঁ॥'

(দেশের কথা ভাবো, সামনে খুব বিপদ। আকাশে তোমার সর্বনাশের সংকেত।)

'মহাশয়েরা,

আজ সন্ধ্যে ছটায় গঞ্জের বাজারে জেলা কংগ্রেস কমিটির ডাকে একটি জনসভা হবে। এই সভায় হিন্দুস্থানের স্বাধীনতায় বাদ সাধার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকারের বিভেদনীতির মুখোশ খুলে দেওয়া হবে। আর সারা শহরের দলমতনির্বিশেষে সবার কাছে আবেদন করা হচ্ছে—আপনারা শান্তি বজায় রাখুন। দলে দলে এই সভায় যোগ দিয়ে আপনারা এই জনসভা সার্থক করে তুলুন।'

টাঙ্গার পেছনের সিটে জার্নাইল ঢোল বাজানো থামিয়ে বসে ছিল। ঘোষণা করার ভার ছিল শঙ্করের ওপর। ঘোষণা করা হয়ে গেলে সে ফের নিজের সিটে বসে পড়ল। আবার ঢোল বাজানো শুরু হল। ঝাণ্ডা পত্‌ পত্‌ করে উড়িয়ে টাঙ্গা এগিয়ে চলল।

টাঙ্গা দূরে চলে গেলে একজন মজুর আরেক মজুরকে বলল : 'সেদিন গঞ্জের বাজার থেকে এক বাবুর মোট বয়ে আনছিলাম। বাবু বলছিলেন, স্বাধীনতা এবার এসে যাবে। আমি হেসে বললাম, স্বাধীনতা না হয় এলোই—কিন্তু তাতে আমাদের কী হবে ? আমরা এখনও মোট বইছি, তখনও মোট বইব।' বলে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল। আর তার লাল-লাল মাড়ি ঝলসে উঠল।

'আমরা এখনও মোট বইছি। তখনও মোট বইব।' বলে আবার হাসতে লাগল।

কফিখানার ভেতরে বসে দাড়িওয়ালা এক মাঝবয়সী লোক বলল: 'যে লোকটা মসজিদের হেনস্তা করেছে, সে ধরা পড়েছে, না পড়ে নি? শুয়োরের বাচ্চা! ওর হাতেপায়ে পোকা পড়ুক।'

'খুব খারাপ কাজ করেছে।' একজন বিড়বিড় করে বলল।

কথাগুলো কানে গিয়ে নাথুর সারা শরীর শিউরে উঠল।

ফের আরেকজন লোক বলল, 'শুনলাম একটা গরুও মারা পড়েছে। দুগ'ন্ধ নদ'মাটার পাশে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে।'

'এটাও খুব খারাপ কাজ হয়েছে।'

এরপর ছোট্ট ছোট্ট হাসি-হাসি চোখ মেলে বৃদ্ধ করিমখাঁ ফের বয়েদ আউড়ে বললেন, 'কোরান শরীফে বলা আছে—মানুষের ক্ষেত-খামার আমার হুকুম মেনে খাড়া রয়েছে। মানুষের সমস্ত উদ্দেশ্য অভিপ্রায় আমার হুকুম মেনে খাড়া আছে। আমার অনুমতি ছাড়া ফসলভরা ক্ষেতও জ্বলে খাক হয়ে যাবে। আমার হুকুমে বান এলে শহরের পর শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বুড়ো বলেছেন, সব কিছু প্রভুর হাতে। মানুষের হাতে কিছুই নয়। সব কাজ পবিত্র পরমেশ্বরের হুকুমে চলে। তাঁর হুকুম মতই সব কিছু হবে।'

আশপাশে বসে থাকা সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়। বাইরে এক মুটে উঁচু গলায় গান ধরে:

'ওয়ে উড়ি-উড়ি কিয়াঁ তক্কণে
মাহড়ে সুখণে নী চুড়িয়াঁ।'

(কেননা কেবলি ঘুরেফিরে তুমি ঝুঁকে ঝুঁকে আমার সালোয়ারের চুনটে নজর দিচ্ছ)।

এই হল সেই মজুরটি, যে কিছুক্ষণ আগে খিঁক খিঁক্‌ করে হেসে বাবুর সঙ্গে তার কথোপকথনের বিষয় বার বার বলছিল। তার হাঁসকুটে বেপরোয়া স্বভাব দেখে নাথুর বেজায় হিংসে হল।

সেই সময় রাস্তায় একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল।

যেতে যেতে লোকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ডানদিকে তাকাতে লাগল, যেদিকে ছিল জামা মসজিদ।

'এসে গেছেন, পীর সাহেব এসে গেছেন। গোলড়া শরীফের পীর সাহেব।'

রাস্তায় দাঁড়ানো একজন লোক রুটিওয়ালাকে কথাটা বলল। তারপর সে রুদ্ধ নিশ্বাসে পীর সাহেবের আসা পথ চেয়ে রইল।

রুটিওয়ালাও উঠে দাঁড়াল। কফিখানার ভেতরে যারা বসে ছিল, তারাও বাইরে এসে দাঁড়াল। সবাই পীর সাহেবের খাতিরে তাঁর আসবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একজন বৃষস্কন্ধ দাড়িওয়ালা লোকের আবির্ভাব হল। পরনে লম্বা কালো

কুর্তা, গলায় নানা রকমের মণিমাণিক্যের তিন চারনরী হার। পাগড়ির পেছনে ঘাড় অবধি লম্বা চুল। হাতে তস্‌বী। চওড়া ফরসা মুখ থেকে জ্যোতিঃ ফুটে বেরোচ্ছে। তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে আর পেছনে প্রচুর ভক্ত তাঁর সঙ্গে চলেছে।

রুটিওয়ালা এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে হাঁটুতে হাত রেখে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পীর সাহেব তার বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিতেই রুটিওয়ালা চোখ দিয়ে তাঁর হাত চুম্বন করল। এরপর বুকে ডান হাত রেখে তারপর আগের কায়দায় দু হাত সামনের দিকে জোড় করে ঝুঁকে ঝুঁকে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। পীর সাহেব তাঁর হাত একটু উঠিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে এগিয়ে গেলেন। যারাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা প্রায় সবাই একে একে তাঁর কাছে গেল। সকলেই তাদের চোখে তাঁর হাতের ছোঁয়া নিল। পীর সাহেব সবাইকে দোয়া দিলেন।

রুটিওয়ালা নিজের জায়গায় ফিরে আসতে আসতে বলল, 'অনেক উঁচুদরের পীর। হায় আল্লা! মুখের কী জেল্লা, দেখে মনে হয় জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।'

অন্যেরাও ফিরে এসেছিল। কিছু লোক ওখান থেকেই বাড়ি চলে গিয়েছিল। এরপর পীর সাহেবকে নিয়ে কফিখানায় আলোচনা জমে উঠল।

রুটিওয়ালা বলছিল: 'খুব উচ্চাঙ্গের মানুষ, মনের কথা ধরতে পারেন।' এরপর তক্তায় বসে ভেতরের দিকে মুখ করে বলল: 'একবার আমি জিয়ারত করতে গোলড়া শরীফে গিয়েছিলাম। পীর সাহেবের সামনে গেলে আমাকে দেখে উনি বলে উঠলেন—কী? চেয়ে দেখছিস কী? কিছু দানা তুলে নে। সামনে গমের দানা স্তূপাকার করা ছিল। আমি অমনি ঝুঁকে পড়ে মুঠোর মধ্যে কিছু দানা তুলে নিলাম। এই দেখে পীর সাহেব বললেন—ব্যস, মাত্র একশো সত্তরটা দানা? আরও নিলে পারতে!

আমি হকচকিয়ে গিয়ে হাতের দানাগুলো গুনতে বসে গেলাম। গোনাগুনতি ঠিক একশো সত্তরটা দানা।

শুনে করিমখাঁ বললেন, 'ও'র হাতে অলৌকিক শক্তি। আমার এক নাতি—এখন অবশ্য সে ধাড়ি হয়ে গেছে। যখন সে বাচ্চা ছিল, তখন কানপাকা হয়ে গাল দুটো ফুলে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল। তখন একজন বলেছিল—গোলড়া শরীফে ওকে নিয়ে যাও। যাওয়ার পর পীর সাহেব ইশারা করে বললেন বাচ্চাকে তাঁর সামনে শুইয়ে দিতে। আমি তাকে শুইয়ে দিলাম। তখন উনি একটা বড় ছোরা বার করে একবার এ-গালে একবার ও-গালে ছোঁয়ালেন। তারপর হাতের চেটোয় মুখ থেকে নিজের থুথু নিয়ে বাচ্চার দুই গালে ঘষে দিলেন। ব্যস্ আর কিছু নয়। আমি পীর সাহেবকে কদমবুসি করে বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে গালের ফোলা চলে গেল আর জ্বরও সেরে গেল।'

'পীরদের আর দস্তগীরদের হাত মন্ত্রপূত হয়। এই অঞ্চলে মসিয়াদির

কাছে রোডা-বাবা বসেন। তাঁরও খুব সাফা হাত।'

'তবে পীর সাহেব কাফেরদের ছোঁন না। কাফেররা তাঁর দুচক্ষের বিষ। আগে পীর সাহেবের কাছে যে কেউ যেতে পারত। কোনো কাফের চিকিৎসার জন্যে এলে তিনি ছড়ির গোড়াটা তার নাড়ীতে ঠেকিয়ে ছড়ির আগাটা কানের কাছে ধরে নাড়ীতে গতি টের পেতেন। কিন্তু এখন আর কোনো কাফেরকে তিনি কাছে ঘেষতে দেন না।'

'গরমের সময় পীর সাহেব শহরে বড় একটা আসেন না। এইবারই যা এলেন।'

'পীরের কাছে গরমই বা কী, ঠাণ্ডাই বা কী।'

'সম্ভবত তাঁর কাছে পর্যন্ত খবর গেছে। মসজিদ অপবিত্র করার খবর।'

'এঁর কাছে সব কিছুরই খবর থাকে। খবর আর ওঁকে দিতে হয় না। আপনা থেকেই উনি সব টের পান। আপনা থেকেই সব জেনে ফেলে উনি সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে গেছেন।'

'এঁর কৃপাদৃষ্টি চাই। যদি পীরফকিরের শাপ লাগে তাহলে শহরের পর শহর ছারখার হয়ে যায়।'

'ঠিক।'

'ওয়াজ করবেন কি?'

'কী জানি? জাম্মা অবধি থেকে গেলে নিশ্চয় করবেন।'

'এসেছেন যখন জাম্মা অবধি না থেকে যাবেন না—ওয়াজ করবেন তো বটেই। একবার এসেছেন, শহর পাক না করে ছাড়বেন?'

নাথু যখন ওখান থেকে রওনা হল, তখন অলস দুপুর। ওর মন কিছুটা হালকা-হালকা বোধ হল। এক ধরনের বুক ধড়ফড় করা ভাব, যা সকাল থেকে —তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। একটা অজানা ধরনের আশঙ্কা, যা ওকে ভেতরে ভেতরে কুরে খাচ্ছিল—তার অনেকটাই তখন মিলিয়ে গিয়েছিল। ছিল শহর জুড়ে একটা রমরমা ভাব, চলফেরার ব্যস্ততা। যে শুয়োর ফেলেছে লোক তার কথা বললেও, তাকে সেফ মাথাখারাপ পাগল বলে দুএকটা গাল দেবার পরসেই ঘটনার কথা আবার ভুলেও যাচ্ছে। অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়ে এত তিল থেকে তাল করে সেই বা কেন বুকে ভারী জগদ্দল পাথর বয়ে বেড়াচ্ছে? নাথু এও দেখেছে যে, তাকে জড়িয়ে কোনো কথা মোটেই পাঁচ কান হচ্ছে না। সবাই এই ঘটনাকে কোনো মতিচ্ছন্ন লোকের পাগলামি কিংবা কোনো অলপেয়ে অলবড্যের নষ্টামি বলে মনে করছে। একমাত্র মুরাদআলীই আসল ব্যাপারটা জানে। কিন্তু নিজে মুসলমান হয়ে ও কি কাউকে বলতে যাবে যে কুকর্মটি সেই করিয়েছে?

আশপাশের দৃশ্যগুলো নাথুর ভালোই লাগল। একটা ছোট দোকানের সামনে গাঁ থেকে আসা এক পুরুষ তার স্ত্রীকে একজোড়া জুতো নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছিল: 'নাও না গো, আমার কথা শোনো। তোমার জুতোই তো নেই। একজোড়া জুতো মোটে তাও ছিঁড়ে গেছে।'

তার পাশে আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা তার স্ত্রী নিজস্ব মধুর স্বরে সমানে আপত্তি করে চলেছে : 'না, না। আর জুতো আমার দরকার নেই। এটাতেই দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে। তোমার ভালো জুতো নেই। তুমিই বরং ভালো গোছের একটা জুতো কিনে নাও। তোমায় অনেক বেশি হাঁটাহাঁটি করতে হয়।' শুনতে শুনতে নাথু এগিয়ে গেল। এখানে নাথু সুখের একটু আভাস দেখতে পেল। রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকে এসে পড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। সেখানে সার বাধা আরও একপ্রস্থ রুটির দোকান। বড় কড় ডেকচি। আর তা থেকে উঠছে মশলাদার মাংসের গন্ধ। সেইসঙ্গে চারপাশে সব ডাঁই-করা নানরুটি। দোকানগুলো খদ্দেরে বোঝাই। তাদের বেশির ভাগই মজুর, মুটে, ঝাঁকাওয়ালা আর আশপাশের গ্রাম থেকে আসা পরিবার। সারাদিনের কাজের পর কেউ বা শহরবাজারে কেনাকাটা সেরে এখনে এসে হাউ-মাউ করে খাচ্ছে। শহরের এক মুড়োয় এই বাজার। খাওয়া শেষ হলে গাঁয়ের চাষীরা নিজের নিজের গরুর গাড়িতে করে শহরের বাইরের লম্বা রাস্তায় পাড়ি দেবে। সেইসব রাস্তা যার যার নিজের গাঁয়ে তাদের পোঁছে দেবে।

রুটির দোকানগুলোর পেছনে জামা মসজিদের দর্শনীয় উঁচু ইমারত নাথুর চোখে পড়ল। পড়ন্ত বেলায় মসজিদটি আগের চেয়েও বেশি ধূসর আর সাদা লাগছে। এটা এখানে রোজকার দৃশ্য। সিঁড়ির ওপর যত ভিখিরি, শুয়ে বসে থাকা মুটেমজুর, পথচলতি লোকের জটলা। হঠাৎ নাথু দেখল, মসজিদের বিরাট খিলানদার দরজা দিয়ে পিল্ পিল্ করে শয়ে শয়ে লোক বেরিয়ে আসছে। ভেতর থেকে স্রোতের মতো লোক বেরিয়ে এসে ফটক পার হয়ে সিঁড়ির মাথায় ছাড়া জুতোগুলো হয় পরে, নয় হাতে নিয়ে ধাপে ধাপে নিচে নেমে আসছে। নাথু দেখতে লাগল। একমাত্র ঈদের দিনেই এত লোককে এভাবে মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা যায়। কী ব্যাপার? আজ কি মসজিদে কোনো ওয়াজ ছিল? হঠাৎ তার খেয়াল হল, গোলড়া শরীফের পীর ওয়াজ দিতে আসেন নি তো! তবে কি ওয়াজ শেষ করে ওরা ফিরছে? নাথুর বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। ওর মনে হল মসজিদে এই যে এত লোকের ভিড় তার কারণ হয়ত এই যে, তারা একত্র হয়ে নাথুর কুকর্মের আলোচনা করেছে। গোলড়ার পীরসাহেব সেই কুকর্মের খবর পেয়েই শহরে ছুটে এসেছেন।

নাথু জামা মসজিদের সামনে থেকে সরে গেল। যেখানে মসজিদের দেয়াল শেষ হয়েছে, তার পাশ দিয়ে গেছে একটা পচা নালা। সারা শহরের নোংরা জল এই নালায় পড়ে শহরের বাইরে নিকাশি হয়। নাথু সেই নালার ধারে এসে বেড়া ধরে দাঁড়াল।

নিচের দিকে নজর পড়তে নাথু দেখল বাঁধের কিছুটা নিচে নালার ধারে চাতালের মতো একটা জায়গায় একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ লোক শুয়ে আছে। কুচকুচে কালো রঙের একটা লোক। লোকটার মুখে দাড়ি, মাথায় শণ-নুড়ির মতো শুকনো এলোমেলো চুল, গলায় তাবিজ। নালার দেয়ালে একটা পেরেকে তার একটা টিনের ডাব্বা ঝুলছে। চাতালটা টঙের মতো হলেও শুয়ে শুয়ে পাশ ফিরতে গেলে সোজা

নিচের নালায় লোকটা পড়ে যেতে পারে। নাথু মনে মনে বলল, লোকটা বাইরে থেকে আসা কোনো ফকির-টকির হবে। নাথু লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ লোকটা উঠে বসে চোখ বড় বড় করে নাথুকে দেখতে লাগল। নাথুকে দেখতে দেখতে লোকটা জোরে জোরে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় হেলাতে লাগল। খ্যাপা লোকেরা যেভাবে মাথা নাড়ায়।

নাথু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু পর আবার সে ঘাড় ফিরিয়ে যখন চাতালের দিকে তাকাল, তখন দেখল মাথা নাড়ানো বন্ধ করে লোকটা চোখ কুঁচকে নাথুর দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে আর আঙুল দিয়ে ইশারা করে তাকে ডাকছে। নাথু আঁৎকে উঠল। ওর ভয় ধরল যে, ফকিরটা তাকে কোনো তুকতাক করবে না তো? কোনো কুনজর দেবে না তো! এই ভেবে সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা এক-আনি বার করে ফকিরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরে পড়ার উপক্রম করল। এমন সময়ে ও দেখতে পেল সেই ফকির তার একআনিটা তুলে নিয়ে নালার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর নাথুর দিকে ফিরে ফের আঙুল দিয়ে ইশারা করে নাথুকে ডাকতে লাগল। নাথু বেজায় ভয় পেয়ে শিউরে উঠে সেখান থেকে চলে গেল।

বড়বাজারের রাস্তায় লোক গিজগিজ করছিল। শহরের এই এলাকাটা নাথুর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। সোডা ওয়াটারের দুটো দোকানেই রঙ বেরঙের অসংখ্য বোতল চকমক করছে। তার নিচে, পাটভাঙা কাপড় পরে দোকানদার লেবুর জল ঢাল-উপুড় করতে করতে ভর্তি গেলাস খদ্দেরদের দিয়ে যাচ্ছিল। ফুটপাথের ওপর ফুলের মালা বেচতে এখনই লোক বসে গেছে। সোডাওয়াটারের দোকানের গায়ে শিককাবাব বেচছে। কাছেই শুঁড়ির দোকান। ওখান থেকে কসাই গলির সড়কের মুখ। ঐ মোড়ে বেশ্যারা বসে থাকে। নাথু রাস্তার একধারে এসে ফট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানগুলোর সামনে রাস্তার ওপর বিস্তর টাঙ্গা দাঁড়িয়ে—তাদের কী বাহারে সাজ, ঘোড়াগুলোর মাথায় নাচুনে পালক। যেন মেলা বসে গেছে। কখনও কখনও দু-একটা টাঙ্গা রাস্তার মাঝখানে এসে থেমে পড়ছিল। ঘোড়াগুলোর ছটফটে শরীর এমনভাবে আড়ামোড়া ভাঙছিল যেন তাদের সাজসজ্জা-গুলো ভাঙচুর করতে চায়। আর সেই টাঙ্গায় মাথায় দামী পাগড়ি পরা কোনো রেস্তয়ালা লোক দু-চারজন ইয়ারদোস্ত নিয়ে বসে আছে।

নাথু চামার ঠান্ডা হয়ে এধার ওধার ঘুরতে শুরু করে। ওর মনে হল সমস্ত লোকই মাতোয়ারা হয়ে আছে। আর আপনজনদের মধ্যে চাদের হাসিখুশির ভাব বিলিয়ে দিচ্ছে। নাথু চামার অনেকক্ষণ ধরে সেখানে চক্কর দিয়ে বেড়াল। পরে সন্ধ্যে হওয়ার পর ফিরে এসে দেখল বাজারের জমজমাট ভাব আরও বেড়ে গিয়েছে। নাথু তখন সাঁ করে শিককাবাবের দোকানে ঢুকে পড়ল। সেখানে আটআনার কাবাব কিনে সোজা দেশী মদের আখড়ায় চলে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

সেখানে বসে নাথু মহাসুখে একটু করে কাবাব খায় আর একটু করে ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

ঠিক সেই সময় সামনে দিয়ে মুরাদআলীকে নাথু আসতে দেখল। হাঁটু অবধি লম্বা কোট, হাতে সরু ছড়ি, বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, কালো কালো গোঁফ, অবিকল মুরাদআলী। লোকটা কি সত্যি মুরাদআলী ছিল? না, নাথু জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল। ওর চোখের সামনে মুরাদআলীর এক প্রেতাত্মা বহু রূপ ধরে যেন পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ-গলি সে-গলি এ-মোড় সে-মোড় ছড়ি ঠুকঠুক করে ঘুরছে ফিরছে। সত্যিই কি এই শহরে মুরাদআলী নামের কোনো লোক আদৌ থাকে? নাকি শুধু তার প্রেতচ্ছায়া এ-গলি ও-গলি করে বেড়ায়। আর লোকে তারই নাম দিয়েছে মুরাদআলী? লোকটা সত্যি মুরাদআলীই বটে বাজারের দিক থেকে গলিমুখো রাস্তায় হেঁটে আসছিল। নাথু যদি নেশায় টং হয়ে না থাকত, তাহলে ঠিক কোনো চাতালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। কিন্তু তার সাহস এখন বেড়ে গেছে। নাথু সোজা গলির মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মদ এমন কিছু সে বেশি খায়নি। যে চামার ছাল ছাড়ায়, তার কাছে দু-ভাঁড় মদ তো নেহাতই জল। সারাদিন একা একা রাস্তায় চক্কর দেবার পর এতক্ষণে নাথু যেন একটা চেনা লোক খুঁজে পেল। হঠাৎ নাথুর মনে একটা গর্বের ভাব জাগল। যে কাজেই আমি হাত দিই, শেষ করে তবে ছাড়ি।

'সেলাম হুজুর,'

নাথু সামনে এসে হেসে কথাটা বলে ফের ঘাড় সোজা করে দাঁড়াল। মুরাদআলী এক মুহূর্ত থ হয়ে দাঁড়াল। ওর কুতকুতে চোখ দিয়ে নাথুকে এক নজর দেখেই সে সমস্ত বুঝে ফেলল। নাথুর অভিবাদন অগ্রাহ্য করে বিনা বাক্যব্যয়ে মুরাদআলী হনহন করে এগিয়ে গেল।

'সেলাম হুজুর, আমি নাথু। চিনতে পারলেন না!' বলে নাথু জোরে হেসে উঠল। মুরাদআলী ইতিমধ্যে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

নাথু থতমত খেয়ে গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হুজুর, মুরাদআলী সাহেব!'

কিন্তু মুরাদআলী থামল না।

হঠাৎ তার ঝোঁক চাপল: মুরাদআলীকে অন্তত এটা আমার জানানো দরকার যে, তার দায় আমি উদ্ধার করে দিয়েছি—যাতে সে না ভেবে বসে যে, আমি তার কাজ না করেই এখানে গায়ে ফু দিয়ে বেড়াচ্ছি।

নাথু টলতে টলতে মুরাদআলীর পিছু নিল। সামনে বেশ অন্ধকার। তবু দূর থেকে মুরাদআলীকে ঠিক ঠিক সে দেখতে পাচ্ছিল। নাথু প্রাণপণ করে এগোচ্ছিল। হুজুরকে তার জানানোর খুবই দরকার যে, হুজুরের কাজটা সে হাসিল করে ফেলেছে। ওর ধারণা হল, মুরাদআলীকে ও প্রায় ধরে ফেলেছে। আসলে গলি ফাঁকা হয়ে আসছিল। তাই ওর মনে হয়েছিল যে, মুরাদ আলী তার হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছে।

'হুজুর, বলতে ভুলে গিয়েছি।কাজটা আমি সেরেছি। সেরে ঠিক সর্দি পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠ্য লাগাড়ি এসেছিল…।'

এইসময় নাথু দেখতে পেল মুরাদআলী দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার শরীর টান করে ওকে দেখছে।

মুরাদআলীর তো এখন এদিকে এগিয়ে আসার কথা। কিন্তু হাতের ছড়িটা সে সমানে উঁচিয়ে রেখেছে কেন? মুখে কোনো কথা নেই। অন্ধকার গলির এক কোণে পরস্পর পরস্পরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে।

নাথু আরও একবার বলল, 'আপনার কাজ ফতে করে দিয়েছি, হুজুর! পেঁছে গিয়েছে ঠিক জায়গায়।'

নাথুর কথা শেষ না হতে না হতেই মনে হল মুরাদআলী মুখ ঘুরিয়ে এগোতে শুরু করেছিল। তারপর পা ফেলে ফেলে গলির রাস্তা শেষ করে ঢাল বেয়ে মুরাদ-আলী উঠতে শুরু করে দিল।

নাথু মুখ তুলে দেখল, দূরে মুরাদআলী যাচ্ছে। গলি থেকে বেরিয়ে সেই টিবিটা গিয়েছে শিবালয়ের দিকে। মুরাদআলী সেই পথ ধরে এগোচ্ছে। এবারও নাথুর মনে হল, যেন কোনো প্রেতমূর্তি এগিয়ে চলেছে।

…দূরে, ক্রমশ দূরে……তাই বলে কখনই নাথুর চোখ ছাড়িয়ে নয়।

দরজা খুলেই দোরগোড়ায় নাথুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নাথুর বউয়ের ধড়ে প্রাণ এল। আর সেইসঙ্গে চোখ ছলছল করে উঠল। 'তুমি এমন কোরো না গো' বলে কাঁদতে কাঁদতে খাটিয়ায় গিয়ে বসল। 'আমার এদিকে বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। আমি কেবলি ভাবছি, মানুষটা গেল কোথায়! এ কোন্ ধরনের কাজ আমি এদিকে ভেবে মরছি!'

এরপর আঁচলে চোখ মুছে নাথুর দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটু হেসে বলল, 'এ কী চেহারা করে ফিরেছ? কানে ফুলের মালা লটকে আছে, কোন্ মুখপুড়ির কাছে গিয়েছিলি?'

কিন্তু নাথু একটাও কথা বলল না। শুধু চুপচাপ খাটিয়ার ওপরে বসে রইল।

'মদ খেয়েছিস অথচ হাসি নেই গান নেই, হলো কী তোর? আগে আগে তো মদ খেলে কত হাসিখুশি হয়ে ঘরে ফিরতিস।'

ভগবানের বরে নাথুর বউ ধৈর্য পেয়েছিল বটে। নাথু রেগেমেগে ওকে হাজার বকাঝকা করলেও নাথুর বউ আগ বাড়িয়ে কিছু বলত না। শুধু বলত, 'বকে যাও, বকে বকে মন হাল্কা কর।' কিংবা এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলত, 'হয়েছে, ঢের হয়েছে! পরে তোকেই পস্তাতে হবে।' এখন, মাংসের দলাতেই লোকে চিমটি কাটে, মাটির ডেলায় কেউ কি চিমটি কাটে? ওর ঠান্ডা প্রকৃতির জন্যে নাথু চামারও থামতে বাধ্য হত। পাশাপাশি কম করে কুড়িটা ঘরে চামার পরিবার বাস করত। নাথুর বউ সকলের সঙ্গে মিশত। সকলের সুখেদুঃখে সে থাকত। নিজের অল্পটুকু নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকত। আর সে

ছিল খুব ধর্মভীরু মানুষ। বুঝেসুঝে চলাটা কিছু লোকের স্বভাবগত। তারা এই লোকেরা যা যা অবস্থা সেই ভাবেই চলে। জীবনের কাছে এমন কিছু আশা করে না, যা তারা কখনই পাবে না। এ জন্যেই এসব লোকের মনে সব সময় সুখ থাকে।

নাথু তখন চুপচাপ বসে।

'কী? কথা বলছিস না কেন? তুই যে এতক্ষণ আসছিলি না এদিকে আমার অবস্থাটা হয়েছিল জলছাড়া মাছের মতন।'

নাথুর মনে বান ডেকে যাচ্ছিল। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে নিজের মনে সে বলে উঠল: জাহান্নামে যাক মুরাদআলীটা আর তার শুয়োর!

যাই হোক, ঘরে তো আমি ফিরে এসেছি।

'এ মহল্লার কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে?'

'হ্যাঁ করেছে, এক-আধ বার।'

'তুই কী বলেছিস?'

'বলেছি কাজে গিয়েছে, এখুনি এসে পড়বে।'

'তারা কি অনেক বার জিজ্ঞেস করেছে?'

'তা কেন, লোকের কাজ যেন নেই আর! সন্ধ্যের সময় পাশের বাড়ির বউ খোঁজ নিয়েছিল। আমি বললাম, ঘোড়ার ছাল ছাড়াতে গিয়েছে।'

নাথুর ঠোঁটে একটা হাল্কা হাসি খেলে গেল।

'সে তো হল, কিন্তু তুই গিয়েছিলি কোথায়?'

'বলবখন।'

নাথুর বউ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আগে তো কখনও এমন হয়নি যে, নাথু ওর কাছে কোনো কথা চেপে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু না বলাই ভালো। কিছুদিন পর শেষে নিজেই সব বলবে।

'বলতে না চাইলে, ঠিক আছে……খেতে দেব? এখুনি গরম গরম রুটি বানিয়ে দিচ্ছি, চায়ের সঙ্গে খেয়ে নিস।'

নাথুর বউ খাটিয়া থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু একরকম আবেগের বশেই নাথু তাকে ধরে ফেলে তাকে টেনে নিয়ে কাছে বসাল।

'উহু উঁহু, তুই যাবি না।'

বউ ওর কথামতো ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে বসল।

নাথু সস্নেহে বউয়ের চুলে বিলি কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করল, 'তুই খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ, খেয়েছি।'

নাথুর ব্যবহার ওর বউয়ের কাছে একটু কেমন কেমন ঠেকছে।

'বানিয়ে বলছিস না তো? ঠিক করে বল, খেয়েছিস?'

বউ চোখ তুলে হাসতে হাসতে বলল, 'রান্না করেছিলাম কিন্তু খাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'সকাল বেলা ?'

'খেয়েছিলাম।'

'ফের মিথ্যে কথা ? ঠিক করে বল, খেয়েছিলি ?'

ও আবার স্বামীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফের হেসে ফেলল; 'খাইনি। তোর আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তুই এলি না, কী করে খাবো।'

'যদি আজ রাতেও না ফিরতাম ?'

'ফিরবি না কেন ? আমি ঠিক জানতাম তুই আজ আসবি।'

একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট উচাটন ভাব তখনও নাথুর চেতনাকে মথিত করছিল। এই আঁকু-পাঁকু ভাবটাই তাকে নাকে দড়ি দিয়ে রাস্তায় ঘুরিয়ে মেরেছে, তারই জন্যে সে মদ গিলেছে। বউয়ের পাশে বসেও এই দ্বিধাসংশয়টাই ভেতর থেকে তাকে পুড়িয়ে খাক করে ফেলছিল। হঠাৎ নাথুর বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। ওর মনে হল মুরাদআলী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। আর ওর ছড়ির গোড়া দরজার গায়ে। ওর বুক কেঁপে উঠল। তারপর নিজের মনকে এই বলে বোঝাল যে, মুরাদআলী বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেনি। নইলে অন্তত কথা তো বলত। কোনো রা না কেড়ে চলে গেল। ও নিশ্চয়ই আমাকে এমন কোনো মাতাল বলে ঠাউরেছিল যে বেহেড হয়ে ওর পেছনে লেগেছে। যাই হোক, পাঁচ টাকার নোট হাজার হোক আমাকে দিয়েছিল।

'আমি জানতাম তুই কোনো ঝামেলায় আছিস, সোয়াস্তি পাচ্ছিস না। সেই জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছিল।'

নাথু বউয়ের দিকে ফিরে তাকাল। ওর বউ ঠায় নাথুর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

লোকে বলবলি করছিল শহরে গোলমাল বাধতে পারে। কেউ শুয়োর মেরে কোনো মসজিদের সামনে ফেলে রেখেছিল। এতেও আমার ভয় হচ্ছিল। মন বলছিল, গোলমাল একবার বেধে গেলে তখন কোথায় তোকে আমি খুঁজতে যাব ?'

নাথু থতমত খেয়ে ওর বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

জিজ্ঞেস করল, 'শুয়োর ? কী রকমের শুয়োর ?'

নাথুর বউ ফিক করে হেসে ফেলল, 'শুয়োর আবার কী রকমের হবে ?' নাথু ফিরে এসেছে, এতেই না কত তার আনন্দ। ও চাইছিল দুজনে এইভাবেই বসে সমানে কথা বলে যাবে।

নাথু জিজ্ঞেস করল, 'রং কালো না সাদা ?' তারপর কান খাড়া করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল।

'কী এসে যায় রঙে।'

'তুই দেখে এসেছিলি ?'

'আমি যাব শুয়োর দেখতে ? আমার কী দায় পড়েছে ?'

'পাড়ার কে গিয়েছিল ?'

'কী যে বলিস, পাড়ার লোকে শুয়োর দেখতে যাবে ? শোনা কথা নিয়েই লোকে আলোচনা করছিল।'

রাত বেড়ে যাচ্ছিল। আশপাশের ঘর থেকে যেসব আওয়াজ আসছিল, তাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

'বাইরে শুবি, না ঘরে ?' নাথুকে ওর বউ চোখ টিপে বলল।

'কেন ?'

'তোকে তো বলা যায় না। বাইরে শুলে শেষে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে যাবি। ভাবলাম গোড়াতেই জিজ্ঞেস করে নিই। তোর মতলব খারাপ হলে গোড়া থেকেই ভেতরে শোওয়া ভালো।' 'ভেতরে বড় গুমোট বলে সে বসে বসে চুল এলো করতে লেগে গেল।

কই খাবি কিনা বললি না তো! চা করে দেব? এমন গোঁজ হয়ে বসে আছি কেন? কাল তুই ছিলি না, ঘরটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছিল।'

বউকে ওইভাবে চুল এলো করতে দেখে নাথুর সারা শরীরে যেন বেদনা ভরা এক উন্মাদনার ঢেউ খেলে গেল, আর সে পাগলের মতো তার বউকে বুকে টেনে নিল। তার গালে ঠোঁটে চুলে বারবার চুমো খেতে লাগল। তার এই আবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। আর নাথুর সমস্ত সত্তা তার উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রীর শরীরে আর আকুল নিশ্বাসে হারিয়ে যেতে লাগল।

'আজ তিন তিন বার আমি চোখ ফুলিয়ে কেবল কেঁদেছি। বারান্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় তোর পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি, তারপর আবার ভেতরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছি। খালি ভয় হচ্ছিল তুই আর বোধ হয় এলি না।'

বউয়ের বুকের মধ্যে নাথু যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। দিনদুনিয়ার সব কিছুই বিস্মৃতির অতলে যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। তার বুভুক্ষু অশান্ত ঠোঁট ঘুরে ফিরে কখনও তার বউয়ের ঠোঁটে গিয়ে লাগছিল, কখনও তার বউয়ের স্তনবৃন্ত চেপে ধরছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে নাথু যেন ওর বউয়ের প্রতি অঙ্গে পরিত্রাণ আর বিস্মরণ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সেই সময় মাঠের দিক থেকে কুকুরের দল খুব জোরে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে দিল। অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে একটা হৈ-হট্টগোলের রেশ ভেসে আসছিল। নাথুর কোনোদিকে কোনো হুঁশ ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ছাদের নিচেকার দেয়ালের দিকে নাথুর বউয়ের চোখ পড়ল। ঘুলঘুলির সামনেকার দেয়ালে একটা হালকা আলোর ছাপ পড়ে সেখানে যেন একটা লাল ছায়া নাচতে শুরু করে দিয়েছে। ওর মনে হল, দেয়ালে এসে পড়া আলোটা যেন থর থর করে কাঁপছে। দূর থেকে চাপা শোরগোল শোনা যাচ্ছে।

'কী হচ্ছে, গো?' দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে নাথুর বউ বলে: 'ঐ যে দেখ না দেয়ালে! কিসের আলো? দেখে মনে হচ্ছে, আগুনের শিষ। কোথাও আগুন লাগল নাকি? শোনো তো, গো, কান দিয়ে ওটা কিসের চিৎকার?'

নাথু মাথা তুলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ দিয়ে একটা চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। ততক্ষণে আরও জোরে জোরে কুকুররা ডাকতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে দূরের শোরগোল আরও বেড়ে যেতে লাগল। তার অস্পষ্ট গুঞ্জন চারদিকে ছড়িয়ে

পড়ছিল, সামনে চড়াও হওয়া সৈন্যদের রণধ্বনির মতো। দেয়ালের ওপর দিকে আগুনের শিখা আরও বেশি অস্থির, আরও বেশি গাঢ় বলে বোধ হল। মনে হচ্ছে, আগুনের ছায়াটা যেন হেলছে দুলছে।

'কোথাও আগুন লেগেছে!' ধরা গলায় বলতে বলতে নাথু উঠে বসল।

এমন সময় সেই দূরাগত শোরগোল ছাপিয়ে ভেসে এল ঢং ঢং করে বেজে ওঠা ঘণ্টার আওয়াজ।

দুটো আওয়াজই ওদের দুজনকার কাছে নতুন ছিল। ওদের কাছে রোজকার আওয়াজ শেখের বাগানের ঘড়ির। হেঁশেলের সব কাজ চুকিয়ে নাথুর বউ যখন আসত, দুজনে যখন শোয়ার জন্যে তোড়জোড় করত—তখন ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজত। নাথুর বউ এক দুই করে দশ পর্যন্ত গুনত। কোনো কোনো দিন এগারোটা বাজতেও শুনত। তবে এটা শেখেদের ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজ নয়। এটা দড়ি নেড়ে ঘণ্টা বাজানোর আওয়াজ। এ আওয়াজ এর আগে কখনও নাথু শোনে নি। ঘণ্টা বেজে চলেছিল সমানে। ক্রমশ জোর হওয়া শোরগোলের মধ্যেও তার ঠুং ঠাং আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। কখনও আবার কিছুক্ষণ ডুবে থেকে ফের শোরগোল ছাপিয়ে ভেসে উঠছিল।

দূরের হল্লা ক্রমেই বাড়ছে। বস্তিবাড়ির ভেতরের খুপরিতেও এখন তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লোকে জেগে জেগে উঠে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসছে।

'বড়বাজারে আগুন লেগেছে।' একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল। সেই সময় হঠাৎ অনেক দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এল। খুব উঁচু গলায় খুব স্পষ্ট আওয়াজ ঃ

'আল্লা-হো-আকবর!'

নাথুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। ও এতক্ষণ চোখ গোল-গোল করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে হল, ওকে যেন পক্ষাঘাতে ধরেছে।

নাথুর বউ ত্রস্ত কণ্ঠে বলল :

'চল্, বাইরে চল্। বস্তির লোকজনদের জিজ্ঞেস করি। এখানে আমার ভয় করছে।'

কিন্তু নাথু ওকে ধরে থেকে খাটিয়ার ওপর নিশ্চলভাবে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর ক্রমবর্ধমান হল্লার সঙ্গে এসে জুড়ল বহুকণ্ঠের মিলিত আরও একটি আওয়াজ :

'হর-হর-মহাদে...ব!'

শেষের শব্দটি টেনে লম্বা করে বলা হল।

এই বেড়ে-ওঠা চিৎকার-চেঁচামেচি আর একটানা ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে বার বার এই জোরালো আওয়াজটি শোনা যেতে লাগল। মনে হচ্ছিল, যেন খুব কোনো পার্বণ চলেছে।

শেষ অবধি নাথুর বউকে ধরে রাখা গেল না। নাথুর হাত থেকে নিজেকে

ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে গেল। নাথু তখনও চোখ বড় বড় করে ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

সেই হট্টগোল অস্ফুটপ্রায় এক স্বরতরঙ্গ হয়ে শহর ছাড়িয়ে দূরে রিচার্ডের বাংলোর দেয়ালে দেয়ালেও ঘা খেয়ে ফিরতে লাগল। এই অথই আওয়াজের মধ্যে খানিকক্ষণ পর ভেসে এল ঠুং-ঠুং ঘণ্টাধ্বনি। রিচার্ড তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেও আওয়াজ শুনে লীজার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আওয়াজ শুনে গোড়ায় সে ভেবেছিল এটা ওদেরই ঘরে টাঙানো সেই ঘুন্টির আওয়াজ, যেটা দিনের বেলায় হাওয়া দিলেই ঠুনঠুন করে। কিন্তু ঘুমের ঘোর পুরোমাত্রায় কেটে যেতে লীজা বুঝতে পারল—না, এ আওয়াজ আলাদা। কখনও কখনও সেই শব্দটা হাওয়ায় বিলকুল উবে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে হাওয়া এসে শব্দটাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। আবার পরক্ষণেই অন্ধকারের দীর্ঘপথ সাঁতরে হঠাৎ তা বেজে উঠলে। তখনও লীজার চোখে ঘুম। ওর কখনও কখনও মনে হচ্ছে, যেন তুফানে-পড়া কোনো জাহাজ ঘণ্টা বাজিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

লীজা কনুইতে ভর দিয়ে উঠে রিচার্ডকে দেখল। রিচার্ডের একটু একটু নাক ডাকছিল। বলা যায়, রিচার্ডের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল বালিশে মাথা রাখলেই ওর চোখ বুজে আসে। নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে পালঙ্কে লম্বা হলেই ও ঘুমে কাদা হয়ে যায়।

লীজার কাছে ঘরের অন্ধকার দুর্বহ মনে হল। গেটের কাছে পাহারাদারের বুটের শব্দ। শহরটাকে যেন ধরে পিটছে।

'ও কিসের আওয়াজ, রিচার্ড'—বলে রিচার্ডের কাছে লীজা সরে গেল।

'অ্যাঁ?...কী?' রিচার্ড চটকা ভেঙে বলল।

'কিসের আওয়াজ হচ্ছে?'

'ও কিছু নয়, শুয়ে পড়ো।' বলে রিচার্ড আবার পাশ ফিরে শুলো।

কিন্তু লীজা হাত দিয়ে ওর গলা জড়াল। 'কোথা থেকেও ঘণ্টাঘড়ি বাজার মতন আওয়াজ আসছে,' লীজা বলল ঃ 'যেন কোথাও গির্জার ঘণ্টা বাজছে।'

রিচার্ডের ঘুম ভেঙে গেল! রিচার্ড কান পেতে শুনল। তারপর কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বলল।

'গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ আরও গম্ভীর। এ আওয়াজ বোধহয় মন্দিরের ঘণ্টার। হিন্দুদের মন্দিরে যেমনটা বাজে।'

'এখন এমন একটা সময়ে কেন বাজছে, রিচার্ড? আজ কি ওদের কোনো পুজোপরব? ঘণ্টার আওয়াজটা শুনলে মনে হয় সমুদ্রে তুফান ওঠায় জাহাজ থেকে যেন ঘণ্টা বাজিয়ে বিপদসংকেত দেওয়া হচ্ছে।' শুনেও রিচার্ড কিছু বলল না।

শহরের দিক থেকে আসা গুনগুনানো শোরগোল ক্রমেই বাড়ছে। কখনও কখনও তাকে ছাপিয়ে উঠছে অন্য কোনো আওয়াজ, যেমন কেউ কাউকে ডাকছে

কিন্তু সে ডাক আবার হট্টগোলের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এই সময় অন্ধকারের তরঙ্গে ভেসে এল আরেকটি আওয়াজ :

'আল্লা-হো-আকবর !'

রিচার্ডের সারা শরীর একবার টানটান হয়ে উঠল। তারপরই আবার গা এলিয়ে দিল।

'কিসের আওয়াজ ? কিসের আওয়াজ ওটা ? কী বলতে চায় ?'

'বলতে চায়, ঈশ্বর মহান্।'

'হঠাৎ এ সময়ে এই আওয়াজ উঠছে কেন ? নিশ্চয় কোনো ধর্মীয় পরবের ব্যাপার !'

রিচার্ড আপন মনে হাসল।

'ধর্মীয় কোনো উৎসব নয়, লীজা। আসল কথা হল, শহরে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেছে।'

'তোমরা থাকতে দাঙ্গা বাধল, রিচার্ড ?'

রিচার্ডের মনে হল, লীজা সব জেনে বুঝেও আবোল তাবোল বকছে।

'আমরা এদের ধর্মীয় ঝগড়ার সাতে পাঁচে থাকি না। তুমি তো তা জানো, লীজা।'

মুহূর্তের জন্যে লীজার মনে হল, ভয়ংকর এক জঙ্গল তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে আর দূরাগত আওয়াজটা যেন জঙ্গলেরই আওয়াজ, শেয়াল শকুনের মতো জন্তুগুলো চেঁচাচ্ছে।

'এটা কেন তুমি হতে দিলে, রিচার্ড ? আমার এখানে থাকতে ভয় করছে।'

রিচার্ড চুপ করে কনুইতে ভর দিয়ে আগের মতো বসে রইল। তার মাথায় তখন ঘুরছে, এ অবস্থায় আমাকে কী করতে হবে, সরকারের যে নীতি কোন্ ঢঙে তাকে আমি কাজে লাগাব।

লীজা নিজের হাত দিয়ে রিচার্ডের গলা জড়িয়ে ধরল। 'এরা লড়াই করলে তোমারও তো প্রাণসংশয় হতে পারে, তাই না, রিচার্ড ?' বলার সঙ্গে সঙ্গে লীজার মন রিচার্ডের প্রতি সমবেদনায় ভরে উঠল। রোগাপট্কা রিচার্ড একা এই বর্বরদের মোকাবিলা করছে। এদের শাসনে রাখা কি সহজ কাজ ?

এরই মধ্যে অন্ধকারের গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘণ্টাঘড়ির ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ।

'এরা যে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লড়ছে, এটা কি ভালো কথা ?' শুনে রিচার্ড হেসে ফেলে।

'এটাই কি ভালো কথা হত, যদি ওরা নিজেরা হাত মিলিয়ে আমার বিরুদ্ধে লড়ত ? যদি আমাকে খুন করত ?' বলে রিচার্ড লীজার চুলে বিলি কাটতে থাকে। 'কেমন হত, যদি ঐ আওয়াজ আমার ঘরের বাইরে উঠত ? আর আমার খুন বইয়ে দেবার জন্যে যদি সঙীন হাতে ওরা আমার ঘরের বাইরে সার দিয়ে দাঁড়াত ?'

লীজার পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিউরে উঠল। রিচার্ডের পাশে চলে এসে লীজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল, মানবিক মূল্যবোধ তেমন কোনো মহামারী ব্যাপার নয়। কার্যক্ষেত্রে সরকারী হিসেবটাই বড়। এবার রিচার্ড ফের উঠে বসল। 'শহরের গণ্ডগোল হচ্ছে, লীজা। তুমি শুয়ে পড়ো। আমাকে সব খবরাখবর নিতে হবে।'

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

নয়

'এমন রাঁড়ীর বাড়ি যে কোনো জিনিসই রাখলে আর খুঁজে পাবে না। তারপর সারা বাড়ি ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে মরো।' লালা লক্ষ্মীনারায়ণ আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে গজগজ করছিলেন। আলমারির নিচের তাকে একটা ছোট মত কাটারি রেখেছিলেন, সেটা আর এ সময়ে খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে শহরে গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। দু দুবার ঘরের বাইরে গিয়ে গিন্নীকে তিনি জিজ্ঞেস করে এসেছেন, ছোট কাটারিটা কি তুমি দেখেছ? গিন্নীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন একই প্রশ্নের দুরকম জবাব।

'দেখ গো, আমি তো দাঁতন করি না যে, বাবলার ডাল কাটতে আমার কাটারির দরকার হবে! কাঠও চেলা করি না যে, আমার হাতকুড়ুল লাগবে। তাহলে কেন আমাকে বার বার এসে জিজ্ঞেস করছ?'

'ঘাট হয়েছে আমার, ঘাট হয়েছে। কাটারিটা পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে তোমাকে না করলে আর কাকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাব?'

'কেন গো, কেন তুমি এ নিয়ে অত উচাটন হচ্ছ। মাথার ওপর ভগবান আছেন, তাঁর ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকো ঐটুকু কাটারি দিয়ে কজনকে তুমি বাঁচাতে পারবে?'

কাটারিটা সত্যিই এইটুকু। হলুদে রঙের হাতল, তাতে লাল সবুজ বুটি। লালাজী একবার ছোটদের নিয়ে মেলায় গিয়েছিলেন, সেইখানে এই হাতকুড়ুলটা কেনেন। পরে কিছুদিন ছড়ির বদলে সেটা নিয়ে সকালে বেড়াতে বেরিয়ে দেখলেন ওটা দিয়ে তো বেশ গাছের ডাল কেটে দাঁতন করা যায়! ফলে কী হল, ওটা সঙ্গে নিয়ে বেরনোয় বাড়িতে দাঁতনের পাহাড় জমে উঠল। নিজের দরকার তো দিনে একটি দাঁতন। কিন্তু ডাল ভেঙে কাটাকুটি করে বাড়িতে আনলে একটা ডালে রাশি রাশি দাঁতন হয়। বউ বাকি দাঁতনগুলো নিয়ে গিয়ে জঞ্জালের টুকরিতে ফেলতে গেলে লালাজীর সেটা পছন্দ হয় না ঃ

'টাটকা দাঁতনগুলো ফেলে দিতে যাচ্ছ? একটু দেখেশুনে ফেলো।'

'দেখ গো, টাটকা না বাসি, তাতে কার কী যায় আসে? এসব জমিয়ে হবেটা কী?'

'তুমি নিজে দাঁতন করলে পারো।'

'আমার দাঁত নড়ছে। সেও তোমার ঐ দাঁতনের কৃপাতেই। তার আগে ছিল লোহার মতো শক্ত।' বলতে বলতে লালার বউ সিঁড়ির পাশে রাখা ময়লার বালতির দিকে যাওয়ার উপক্রম করেন।

'দেখ লক্ষ্মীটি, আরও একটা দিন ওগুলো পড়ে থাকতে দাও। যখন শুকিয়ে যাবে তখন আর কিছু বলব না। কিন্তু দাঁতন তাজা থাকতে কেউ ফ্যালে?'

এখন সেই কাটারি খোয়া গেল। বাড়িতে ওটা থাকলে মনে তবু জোর পাওয়া যেত। বিপদে আপদে কাজে দেবে। ওটা না থাকলে নিজেকে খুব নিরস্ত্র লাগে। ওটা ছাড়া বাড়িতে অস্ত্রপদবাচ্য আর কিছু নেই। আছে মশারি খাটানোর ডান্ডা আর তরকারি কাটার ছুরি। তেল বলতে কেবল এক শিশি সরষের তেল আর কয়লা না থাকার মতন। বানপ্রস্থীজী বলা সত্ত্বেও এই জিনিসগুলো লালাজী যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দাঙ্গা যদি লেগেও যায় সরকার বেশিদূর তা বাড়তে দেবে না।

কাটারিটা তখন যুবক সঙ্ঘের 'অস্ত্রাগারে'র শোভাবর্ধন করছিল। ওটা রাখা ছিল জানলার তাকে, যেখানে রণবীর তীরের ফলাগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে রেখেছিল।

'এমন রাঁড়ীর বাড়িতে কার কাছে গিয়ে বলব?' লালাজীর গজর গজর বন্ধ হল না।

চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে নানকু, আমার কাটারিটা দেখেছিস?'

'এখানেই তো ছিল, বাপঠাকুর। আমি তো দেখি নি।'

'এখানেই যদি ছিল তো গেল কোথায়? পাখা নেই যে উড়ে যাবে। তুইও জানিস না, তবে কাটারিটা গেল কোথায়?'

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থেকে নানকু বলল; 'কই, আমার তো চোখে পড়ে নি, বাপঠাকুর।'

সেদিনই সকালে অন্তরঙ্গ-সভার মিটিঙে শহরের হালচাল নিয়ে যে আলোচনা হয় তাতে হিন্দুদের সামগ্রিকভাবে আত্মরক্ষার প্রসঙ্গ উঠেছিল। লালাজী বলেছিলেন, ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাও, এ কাজে যেন একদিনও দেরি না হয়। এ কাজের জন্যে আমি পাঁচশো টাকা দেব।' লালাজীর অনুপ্রেরণায় দেখতে দেখতে আড়াই হাজার টাকা উঠে যায়। কিন্তু তখন তাঁর মধ্যে ছিল শত্রুর মহড়া নেওয়ার, তাকে তুচ্ছ করে দেখার একটা ঝোঁক। নিজেকে তিনি তখন খুব সুরক্ষিত বলে মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভয় পাওয়ার কোনো কারণও ছিল না। অর্থবান মান্য গণ্য লোক তিনি, উঁচু দালানে থাকেন—কার সাধ্যি তাঁর গায়ে হাত দেবে? আশপাশে যে মুসলমানেরা থাকে, তারা সব দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থার লোক। শহরের প্রচুর মুসলমান কারবারীর সঙ্গে তাঁর ব্যবসার যোগ। তাঁরা পরস্পরকে দেখেন শোনেন। তবে আর ভয় কিসের? কিন্তু আগুন লাগার পর শহরের আর সে অবস্থা নেই। আমূল বদলে গেছে। জেনে শুনেও লালাজীর বুক দুরুদুরু করছে।

'ওগো শুনছ? আমার কেমন যেন মন বলছে ঐ কাটারি যুবক-সমাজে চলে গেছে।'

'সে তুমি জানো আর তোমার ছেলে জানে! আমাকে তো তোমরা মনে করো বেকুব। আমি ওসব সাতে পাঁচে নেই।

'তোমায় কিছু বলে গেছে?'

'কে?

'কে আবার? তোমার গুণধর রণবীর!'

'তোমায় কিছু বলে যায় নি। সারাদিন তো তোমারই কথা শুনে চলে। আমি কী করে জানব কোথায় গেছে না গেছে!

'এই দুর্যোগের রাতে ছেলে ঘরে নেই।'

লালাজী হাতটা ছুঁড়ে বিরক্তি দেখিয়ে ঘুরে চলে গেলেন ঘরের দিকে। এখন আর ঘরে ঢুকে কী হবে! কাটারিটা তো নেই। লালাজী ঘরের কোণে রাখা মশারির ডাণ্ডাগুলো নিয়ে বাইরে এলেন। একটা ডাণ্ডা নানকুকে দিয়ে বললেন ওটা হাতে নিয়ে যেন সে দরজার পাশে গিয়ে বসে থাকে। আরেকটা ডাণ্ডা উনি দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দিলেন। সেখানে ডাগর মেয়েকে নিয়ে লালাজীর বউ খাটের ওপর বসেছিলেন। একটা ডাণ্ডা লালাজী নিজের হাতে নিলেন। কিছুক্ষণ ধরে থাকার পর অস্বস্তিবোধ করতে থাকায় সেটাও দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দিলেন। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ছাদে চলে গেলেন। ছাদেই এ বাড়ির বাথরুম ছিল।

আগেরবার দাঙ্গায় শুধু বড়বাজারেই আগুন লেগেছিল। মারামারি কাটাকাটি হয়নি। এবার আবহাওয়া একটু বেশি বিষাক্ত। লোকের মধ্যে আতঙ্কও বেশি। অন্তরঙ্গ-সভার মিটিং হওয়া অবধি লালাজী নিজেও ঘাবড়ে ছিলেন।

আগুন আগের চেয়েও ব্যাপক হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সেই লালের মধ্যে থেকে ঝলকে-ওঠা আগুনে লেপটে থাকা এক মহানাগের জিভ যেন লক লক করছে। আগুন এই সময় উত্তরের দিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল, দশহরার সময় যেভাবে লংকাদাহন হয়, সেই রকম তেজের সঙ্গে। নিচের দিকে আগুন ঝড়ের মতো পাক খাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে আগুনের ঝাঁপির ভেতর থেকে বেরিয়ে শিখার দল সোজা আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ক্রমশ আকাশে লালের আরো বিস্তার হচ্ছে। কখনও কখনও মেঘের মতো লাল ধুলো ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ছিল। তারপর ধোঁয়া হয়ে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। তারাগুলো ফিকে হয়ে গেছে। কখনও কখনও আগুনের কোনো ঝলক সোজা ওপরে উঠে আকাশের বহু দূরে চলে যাচ্ছে। যেন একটা মেঘ থেকে আরও মেঘ বেরিয়ে আসছে আর তারপর একাকার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

লালাজী বাথরুম থেকে বেরিয়ে ছাদের পাঁচিলের পেছনে দাঁড়ালেন। ঝলসানো আকাশের পটভূমিতে বাড়ির ছাদগুলোর ওপর এসে দাঁড়ানো লোকগুলোর চেহারা আরও স্পষ্ট হয়ে নজরে পড়ল। সবাই আগুনের দিকে চেয়ে ছিল। শহরের

দিগন্তবিস্তৃত ঘরের পাঁচিল, চিলেকোঠার চতুর্ভুজ ধাঁচ ঠিক যেন ছবি হয়ে উঠেছিল। লালাজীর আড়ত ছিল বড়বাজারের একটা গলির মধ্যে, যেটা মণ্ডী থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসে উত্তর-দক্ষিণের দিকে পড়ে। দেখে উনি খুশি হলেন যে সেদিকটা অন্ধকারে ঢাকা। আগুন অতদূর পৌঁছোয়নি।

লালাজী পাঁচিল থেকে নিচে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন পাশের বাড়ির ছাদে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। তিনজনেরই মুখ আগুনের দিকে ফেরানো। দাঁড়িয়েছিল ফতহুদ্দীন, তার ভাই আর বুড়ো বাপ। লাল আকাশ থেকে ফতহুদ্দীনের চোখ পিছিয়ে ঘুরে এসে লালাজীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'কী সর্বনাশ হচ্ছে, দেখুন বাবুজী! উহ্ কী, সাংঘাতিক আগুন লেগেছে!' সে বলল।

লালাজী কোনো জবাব দিলেন না। এরপর আশ্বাসের সুরে ফতহুদ্দীন বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবুজী! আপনার বাড়ির দিকে কারও সাধ্য নেই নজর দেয়। আমাদের না মেরে আপনাদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই। প্রতিবেশী তো মানুষেরই হাত। তাছাড়া আপনার মতো প্রতিবেশী।'

'আপনি কিছু ভাববেন না। গুণ্ডগুলে লোকেরাই গণ্ডগোল করছে। ভালো মানুষদের ফ্যাসাদে ফেলছে। এখানে এ শহরে সবাইকেই থাকতে হবে। তাহলে ঝগড়া মারামারি কিসের জন্যে? তাই নয়, বাবুজী!'

'যা বলেছ।'

ফতহুদ্দীনের কথায় লালাজী বিশ্বাসও করেননি, অবিশ্বাসও করেন নি। এখানে তিনি বিশ বছর ধরে আছেন। এদের সঙ্গে তাঁর কখনও কোনো খটাখটি হয় নি। তবু মুসলমান তো বটেই। এমনিতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি আমার ঘরে আগুন লাগে তো শুধু আমারই ঘর পুড়বে, আর মুসলমানদের সারা মহল্লা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া সকালে মুসলিম লীগের পাণ্ডা হায়াতবক্স ভরসা দিয়েছে সে থাকতে কেউ লালাজীর কেশস্পর্শ করতে পারবে না। আড়তের ব্যাপারেও লালাজীর চিন্তার কিছু ছিল না। আড়তের সব মাল বীমা করা আছে। তবে এও ঠিক, অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়তে পারে। আর এই মোছলাদের বিশ্বাস নেই।

লালাজীর চিন্তা হচ্ছিল তখনও বাড়ি না ফেরায় রণবীর। খুব ছটফটে ছেলে, ভুল করে কিছুতে না ফেঁসে যায়। এমনও হতে পারে যে, দেবব্রত মাস্টার গণ্ডগোল হচ্ছে দেখে তাকে বাইরে বেরোতে দেন নি। সন্ধ্যের দিকে রণবীরের এক বন্ধু বলেও গিয়েছিল যে, ছেলের দল সবাই মাস্টারজীর কাছে আছে। মণ্ডীর দিকে যে ওকে ঠেলে দেওয়া হয়নি তাই বা কে বলতে পারে?

ঠিক এই সময় ঘণ্টা বাজার শব্দ লালাজীর কানে এল। শুনে ওঁর ভালো লাগল। অন্তরঙ্গ-সভার বৈঠকে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, বিপদ-সংকেতের ঘণ্টাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে তাতে নতুন দড়ি লাগানো হোক। ওঁর প্রস্তাবমত

কাজ হয়েছে দেখে লালাজী খুশী হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের ঐ তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে ঘণ্টাঘড়ির আওয়াজ খুব বেমানান আর অর্থহীন বলে মনে হল।

এদিকে বিপদের ঘণ্টা বাজছে, ওদিকে মণ্ডী দাউ দাউ করে জ্বলছে। হিন্দুদের লাখ লাখ টাকা পয়মাল হচ্ছে। আমরা হিন্দুরা এই করে মরেছি। কী করে, না বকবক করে...

লালাজী পেছনে হাত ধরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে বক বক করতে লাগল। মাঝেমাঝে ওঁর বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। ঘরে সোমত্ত মেয়ে, এদিকটাতে গণ্ডগোল বাধলে কী করে তাকে সামলাবেন। আর রণবীর যে কোথায় ঘুরছে, কী করছে, ভগবান জানেন।

'বড় কাঠগোঁয়ার ছেলে, কারও কথা শোনে না। সারাক্ষণ সমাজসেবা আর সমাজসেবা—এই নিয়ে আছে। যে নিজের মা-বাবার কথা ভাবে না, সে আবার সমাজসেবা করবে কী।'

কখনও কখনও ওঁর মনে হয় যেখানে আগুন লেগেছে সেই সব্জিমণ্ডীর দিকে রণবীর না গিয়ে থাকে। কথাটা মনে হতেই ওঁর সারা শরীর শিউরে উঠল।

আরও তো অনেকের ছেলে আছে, তারা বৈঠকে যায়, লাঠি খেলা শেখে। তাই বলে এমন নয় যে, বিপদের সময় তারা ঘর ছেড়ে যাবে। ছেলে বড় বীর রথী মহারথী হয়েছে···নিজের ওপর ওঁর রাগ ধরল। মিটিঙে আর সবাই মুখ বুঁজে থাকে, আমি কিনা সমানে মুখ খুলি। পাঁচ পাঁচশো টাকা আমার কাছ থেকে ওরা বার করে নিয়েছে, আর কেউই একশোর বেশি দেয়নি। আমাকে নিয়ে যখন এ-ও তা বলে তখন কোনো ভেড়ুয়া তো কাছে ভেড়ে না।

পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে লালাজী ঝুঁকে বাড়ির ভেতর মহলটা দেখছিলেন। নিচে নিস্তব্ধ অন্ধকার। যেখানটা জঙ্গল হয়ে আছে তার পাশে লালাজীর মেয়ে খাটের পায়ায় সেঁটে বসে আছে। তার মায়ের গায়ে গা দিয়ে বসে আছে। তার মা বলছিলেন : হরিনাম কর, হরিনাম কর, গায়ত্রী পড়। মেয়ে কোলে হাত রেখে গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

ওপর থেকে লালাজী খাটো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'রণবীর এসেছে? ও রণবীরের মা! রণবীর এসেছে?

'না গো। কে আবার আসবে, কেউ আসেনি।

'ওঃ, একটু আস্তে! আস্তে কথা বলা যায় না? লালাজী আবার ছাদে পায়চারি শুরু করলেন। বারবার এই বলে নিজের মনে সাহস আনার চেষ্টা করলেন : হুঁঃ আমার ঘরে আগুন দিলে এদের গোটা গলি জ্বলে যাবে না! কিন্তু ছাদে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। নিজের মনে বকর বকর করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন।

কিন্তু নিজের বউ-মেয়ে কাছে আসতেই আগের ভাব বদলে গেল।

'এরকম মুখ গোঁজ করে বসে আছো কেন, রণবীরের মা ? অত ঘাবড়াবার কী আছে ? মনে সাহস আনো।'

রণবীরের মা চুপ করে থাকলেন। রণবীরের কথা ভেবে ওঁর বুকও ধুকধুক করছিল। মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন।

'আমাদের বলছ মনে সাহস আনো, বলে নিজে তিনবার কলঘরে গেলে।' রণবীরের মা বিজবিজ করে বললেন।

লালাজী জঙ্গলমত জায়গাটার কাছ থেকে সরে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

একটু পরে রণবীরের মার কেমন যেন খটকা লাগল।

'বিদ্যা, যা দেখে আয় তো, তোর বাবামশাই কী করছে।'

বিদ্যা তৎক্ষণাৎ তার বাবার ঘরের দিকে গেল। লালাজী নিজের আড়াই-গজী ধুতি ছেড়ে পা-জামা পরছিলেন। বিদ্যা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে মার কাছে গেল।

বিদ্যা ঘাবড়ানোর ভাব করে বলল, 'বাবা তো বেরোচ্ছেন বলে মনে হল।'

'হা ভগবান, ইনি যে, কখন কী করেন!' বলে মা খাট থেকে নেমে সোজা লালাজীর ঘরের দিকে চলে গেলেন; 'ওগো শুনছো, বাড়ির বাইরে পা দিলে তুমি আমার মরা মুখ দেখবে।'

'করব কী ? ওর একটা খোঁজ নিতে হবে না! ঘরে বসে থাকলে চলবে ?'

রণবীরের মা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'ঘরে সোমত্ত মেয়ে আমার একার ঘাড়ে ফেলে বেশ চলে যাচ্ছ। এখন তো যেকোনো সময় একটা সর্বনাশ ঘটতে পারে।'

'ছেলে বাইরে রইল আর বাপ বুঝি হাতে চুড়ি পরে বসে থাকবে ? বেশ আক্কেল তোমার।'

'ছেলে একা তোমার নয়, ছেলে আমারও। খুঁজতে যে যাবে, কোথায় যাবে ? ইস্কুল বন্ধ, মন্দির কখন ফাঁকা হয়ে গেছে। ওকে কোথায় খুঁজে মরবে ? বুঝদার ছেলে আমার, নিশ্চয় কোথাও থেকে গেছে। সন্ধ্যের সময়ও ওর বন্ধু বলে গেল যে, ছেলেরা সব মাস্টারজীর ঘরে আছে। আমি কত বলেছি, আর্যবীর বানানোর কোনো দরকার নেই, ও লিখুক-পড়ুক, খেলাধুলো করুক, খাক দাক। কিন্তু না, তুমি আমার কোনো কথাই শুনবে না। ওকে তুমি পালোয়ান বানাতে লাগলে, লাঠিচালানো শেখাতে লাগলে। মুসলমানের শহর ওকে সারাজীবন ওদেরই সঙ্গে কাটাতে হবে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে ? এখন দেখো তার কী পরিণাম হয়।'

'বেশি উপদেশ ঝেড়ো না। যুবক-সমাজে দিয়ে কী খারাপ কাজ করেছি। দেশের কাজ, সমাজের সেবা এসব তো করাই দরকার।'

'দেশের কাজ, সমাজের সেবা করে এখন ভোগো! তবে এসময় আমি তোমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছি নে, সে তুমি যাই করো আর তাই করো। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।'

লালাজীকে বাইরে বেরোবার মতলব ছাড়তে হল। লালাজী ভেবে উঠতে পারেন নি আগুন এতটা বড় আকারে লাগবে। মুসলমানদের ওপর ওঁর রাগ তো হামেশাই হত। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর মনে মনে এ বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজরা ওদের দাবিয়ে রাখবে।

'আরও লোক তো আছে! তারা অফিসারদের সঙ্গে, পাড়াপড়শিদের সঙ্গে, হিন্দু মুসলমান সকলের সঙ্গে ভাবসাব করে চলে। তোমার নিজের সম্বন্ধীকেই দেখো না, ওর বাড়িতে তো মুসলমান পিলপিল করছে। আর না তোমার ভাব অফিসারদের সঙ্গে, না পাড়াপড়শিদের সঙ্গে।'

আদতে তাঁর কথাগুলোই যেন তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী বলছিলেন। কেননা এই সময় ঠিক এই কথাগুলোই লালাজী ভাবছিলেন। ওঁর সম্বন্ধীর ছিল শাহনওয়াজের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব। শাহনওয়াজ অত্যন্ত প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী মুসলমান। জায়গায় জায়গায় ওঁর বাস লরি চলত, ওঁর পেট্রোলের ঠিকা। লালাজীর সম্বন্ধী আর শাহনওয়াজ ছিল দুজনে হরিহরআত্মা। সবচেয়ে ভালো হয়, ওর সাহায্য নিয়ে যদি আমরা যে কোনো ভাবে চলে গিয়ে কিছুদিন বাইরে থেকে আসতে পারি। আগুন যেরকম দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে তাতে সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তাও বলা যাচ্ছে না। মেয়েটাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে সদরবাজারে চলে যাওয়া যাক। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হবে?

এই সময় দূরে থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল 'আল্লা-হো-আকবর।' সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথাও বাড়ির ছাদগুলো থেকে লোকে তার প্রতিধ্বনি তুলল। বাড়ির ছাদে উঠে যেসব লোক আগুন লাগার মজা দেখছিল, তারাও সমস্বরে তাতে সাড়া দিল। সে এক তুমুল শোরগোল। দূরে শিবালয়ের দিক থেকে হিন্দুরাও স্লোগান দিচ্ছিল, কিন্তু তাতে বেশি জোর ছিল না। আর আশপাশের কোথা থেকেও হিন্দুদের সেই আওয়াজে বিশেষ কাউকে সাড়া দিতে দেখা গেল না। এতে লালাজী আরও বেশি ভয় পেলেন।

'শোনো রণবীরের মা, তুমি নানকুকে ওপরে আসতে বলো।'

'কেন হঠাৎ কী হল?'

'দেখো, প্রতি কথায় কেন কেন কোর না। ওকে তুমি ওপরে ডাকো। আমি ওর হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠাব।'

রণবীরের মা লালাজীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এই সময় পাঠাবে? কোথায় পাঠাতে চাইছ?'

রণবীরের মার মনে তখন রণবীরের চিন্তা। 'ওকি রণবীরের খবর নিতে যাবে? মাস্টারজী তো তোমাকে বলে পাঠিয়েছেন রণবীর ওর সঙ্গে আছে। এ নিয়ে কেন এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ? ভগবানে বিশ্বাস রাখো। রাত পোহানো অবধি চুপচাপ বসে থাকো।'

'না, ওকে আমি রণবীরের খোঁজে পাঠাচ্ছি না। পাঠাতে চাই অন্য একটা কাজে…।'

'হ্যাঁ গো, এই গরিব মানুষটাকে এখন কোথায় পাঠাবে? বাইরে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে। তার মধ্যে ওকে কেউ জানে না, চেনে না!'

'আমি যা বলি তাতেই বাগড়া দেওয়া তোমার স্বভাব। বিদ্যাকে নিয়ে এখানে পড়ে থাকাটা আমার ইচ্ছে নয়। আচমকা যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। সম্বন্ধী ভায়ার কাছে একটা হাতচিঠি পাঠাচ্ছি ও যাতে ওর বন্ধু শাহনওয়াজকে বলে এখান থেকে আমাদের বার করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে আমি এখানে থাকতে চাই না।'

'কাল সকালে ছাড়া তো আর এ কাজ হতে পারবে না! তোমার সম্বন্ধী কি চিঠি পেয়ে এই রাতেই শাহনওয়াজের বাড়িতে ছুটবে? অদ্ভুত কথা বলছ।'

কিন্তু লালাজী তা মানবেন না। লালাজীর বউ একটু বিজ বিজ করে বললেন, 'একটা কথা মাথায় একবার ঢুকলে তা আর বার করা শিবেরও অসাধ্য। ও তোমার চিঠি পেঁাছে দেবে কোথায়? ও চেনে কী আর জানে কী?'

'কেন পেঁাছুতে পারবে না? ওকে রাখা হয়েছে কী জন্যে? অলিগলি দিয়ে গেলে দু মিনিটে সম্বন্ধীর বাড়িতে পেঁাছে যাবে। কাছেই তো ওর বাড়ি।'

'তোমারই বা অত জেদ কিসের, গো? এখান থেকে বেরোলেও দিনের বেলাতেই তো বেরোবে! এখন সাত তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়েই বা কী লাভ? সম্বন্ধীকেই বা শুধু শুধু কেন ভোগান্তির মধ্যে ফেলবে?'

লালাজী এক মুহূর্ত থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'সম্ভব হলে আজ রাতেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই।'

'এই বা কী কথা গো। পাশের বাড়ির লোককে দেখেও তোমার ভয় হচ্ছে? আমার হচ্ছে না। ভগবানের নাম করো। আর চুপটি করে বসে থাকো।' বউয়ের কথা শুনে লালাজী এরপর চুপ করে গেলেন।

লালাজীর অতটা উতলা হওয়ার হয়ত কারণ আছে। নানকুর বিপদের ঝুঁকি থাকলেও নিজের ডাগর মেয়ের কথা খেয়ালে আসায় মা-র মনের স্থিরতাও নড়ে গেল। হয়ত এইবেলা এখান থেকে চলে যেতে পারলেই ভালো হয়। ভগবান না করুন, যদি কিছু ঘটে—তখন এ মেয়েকে কেমন করে আঁচলচাপা দিয়ে বেড়াব?

লালাজী নানকুর প্রতি খানিকটা মমত্বের ভাব দেখিয়ে বললেন, 'ওকে বলো সঙ্গে মশারির একটা ডাণ্ডা নিয়ে যাক।'

নানকুকে চিঠিটা দিয়ে অনেকখানি সময় নিয়ে লালাজী বোঝাতে লাগলেন: 'দেখবে কোনো গলিতে শোরগোল শুনলে ঘুরে অন্য গলির পথ ধরবে। সম্ভব হলে মন্দির থেকে একজন আরদালিকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। এখন যাও, জলদি করো। চিঠিটা যে করেই হোক পেঁাছে দিয়ে আসতে হবে।'

লালাজীকে কিন্তু নানকু রওনা হওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী আরও একবার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেখ গো, ভগবানের ভরসায় আজ রাতটা কাটিয়ে দাও। কালকের

কথা কাল ভাবা যাবে। এও তো একজন মায়েরই সন্তান, কেন একে জ্বলন্ত আগুনের মুখে ঠেলে দেবে?'

'কিছু হবে না। বলে দিচ্ছি কিস্যু হবে না। আমি যদি যেতে পারি, তো ও পারে না? কী ঘরে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবে?'

কিন্তু ঠিক সেই সময় পেছনের গলি থেকে লোকের হুড়মুড় করে পালাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসছিল। প্রতি মুহূর্তেই তার জোর বাড়ছিল। সে রাত্রে গলিতে চলন্ত পায়ের সব আওয়াজই চড়া সুরে বাঁধা ছিল। কানের ভেতর দিয়ে এসে শব্দগুলো যেন হৃদয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঘা দিচ্ছিল।

লালাজী চলতে চলতে থেমে গেলেন। তাঁর পাদুটো আর যেন বইছে না। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেছে। রণবীর কি কোথা থেকেও পালিয়ে আসছে?

ছুটে পালনোর আওয়াজ শুনে কাউকে কি চিনে ফেলা যায়?

হঠাৎ আরও একটা লোকের ছুটে পালানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হল, কেউ অন্য গলির মোড়ে ঘুরে এ গলির ভেতরে এসে গিয়েছে। আর পলায়মান লোকটার পেছনে পেছনে সে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ অন্ধকার চিরে ফেলে একটা আওয়াজ উঠল:

'বাঁচাও…বাঁ…চা…ও!'

লালাজীর আপাদমস্তক শিউকে উঠল। গলির পেছনদিকটা থেকে এবারে আর এক নয়, একসঙ্গে দু পাঁচ জনের ছুটে পালানো পদশব্দ শোনা গেল। এইসব আওয়াজ খাটে-বসা মা-মেয়ে, পাড়াপড়শির বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো মানুষজন, সকলেই শুনতে পেল। গোটা আবহাওয়ায় যেন সেই শব্দের গুঞ্জরণ হতে লাগল।

'বাঁ…চা… ও!,

ফের আওয়াজ শোনা গেল। ছেঁড়া-ছেঁড়া আওয়াজ, ভয়ে প্রাণ-শুকিয়ে-যাওয়া কোনো লোকের কণ্ঠস্বর। এই আওয়াজ থেকেও নিজের ছেলের গলা চেনা সম্ভব ছিল না। ভীত সন্ত্রস্ত পলায়মান সব মানুষ কেমন যেন একভাবে চিৎকার করে।

গলিতে কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলার আওয়াজ হল। শব্দটা লাঠির, না পাথরের? কেউ ছুটে পালাচ্ছিল। পেছন থেকে তার দিকে লাঠি ছোঁড়া হয়েছিল। নাকি কেউ কাটারি ছুঁড়েছিল, সেটা গলির দেয়ালে লেগে রাস্তার মেঝেয় ঠোক্কর খেয়ে পড়ে ডিগবাজি খেতে খেতে সামনের দিকে চলে গেছে।

'ধরো…ধ…রো…মা-রো!'

'বাঁচাও' বলে যে লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার করেছিল, হাঁফাতে হাঁফাতে পায়ে চটাপট শব্দ করতে করতে সে যখন গলিটা পেরোচ্ছিল, তখন তার পায়ের শব্দ দূরে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে জোরে শোনা যেতে লাগল তার পিছু নেওয়া লোকদের পায়ের আওয়াজ।

তবে কি লাঠিটা ওর গায়ে লাগেনি? কেউ কি রণবীরকে লক্ষ্য করে লাঠি ছুঁড়েছিল? রণবীর খুব জোর বেঁচে গিয়ে ফিরে এসেছে? দরজায় এবার সে

খুট্‌ খুট আওয়াজ করবে? পেছনে ছোটা লোকদের পায়ের শব্দ গলির বাইরে চলে গেল। লালাজীর বুক ধুকপুক ধুকপুক করছিল। ওঁর কান দরজার দিকে খাড়া হয়ে ছিল। এখুনি দরজায় খুট্‌ খুট্‌ আওয়াজ হবে। কিন্তু দরজায় কেউই এসে খুট খুট আওয়াজ করল না।

লালাজী পায়ে বল ফিরে পেলেন। পা চালিয়ে তিনি ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। যাতে রাস্তায় ছুটে পালানো লোকগুলোকে দেখা যায়। রাস্তা শুনশান। সামনের মেটে ঘরের ছাদে মেয়ে পুরুষ আর বাচ্চারা দাঁড়িয়ে। আওয়াজগুলো ওদের কানেও গেছে। সবাই গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় প্রায় বারান্দার নিচে তাকিয়ে তিনজন লোককে রাস্তা থেকে গলির দিকে ফিরে আসতে দেখা গেল। তিনজনেরই মুখে কাপড় বাঁধা, জোরে জোরে তাদের শ্বাস পড়ছিল। আর তিন জনেরই হাতে ছিল লাঠি।

'সরে পড়েছে শিখটা। ও যদি না ছুটত। আমরাও ওর পিছু নিতাম না।' ওদের একজন বলল।

গলির ভেতর ধাপে ধাপে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ওরা মোড় নিল। তারপর আস্তে আস্তে ওদের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

লালাজী স্বস্তিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর দুহাত পিছমোড়া করে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। নানকুও সঙ্গে সঙ্গে মশারির ডাণ্ডা তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে বাইরের দরজায় পিঠ দিয়ে বসল।

দশ

সকালের ফুটফুটে আলোয় মৃতপ্রায় শহরটা যেন ঠাণ্ডা মেরে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মণ্ডীর আগুন নেভেনি। মিউনিসিপ্যালিটির দমকল লড়াইতে হার মেনে ফিরে গেছে। রাত্তিরে আকাশ লাল হয়ে ছিল, কিন্তু সকালে ধুঁইয়ে-ওঠা কালিমায় আকাশ মসীলিপ্ত। সতেরোটা দোকান জ্বলে খাক হয়ে গেছে।

দোকানপাট বন্ধ। কোথাও কোথাও দুধদইয়ের দোকান খোলা। দু-চারজন তার কাছে দাঁড়িয়ে রাত্তিরের ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা বলছে। খুনখারাপির বেশিটাই গুজব—গোয়ালটুলির একজন বলল। দাঙ্গা হয়েছে রত্তায়—একজন রত্তার লোক বলল। দাঙ্গা হয়েছে কমিটি পাড়ায়।

নয়া মহল্লার চকে একটা ঘোড়ার লাশ পাওয়া গেছে। শহরের বাইরে গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় মাঝবয়সী একজন লোক মরে পড়ে ছিল। কলেজ রোডে জুতোর দোকান আর দর্জির দোকান লুট হয়েছে। আরেকটি লাশ পাওয়া গেছে শহরের এক প্রান্তে কবরখানার মধ্যে। এক মাঝবয়সী হিন্দুর লাশ। তার পকেটে পাওয়া গেছে খুচরো পয়সা আর বিয়ের যৌতুকের একটা ফর্দ।

যে যার নিজের নিজের মহল্লায় ঢুকে বসে আছে। হিন্দুদের এলাকায় মুসলমানের যেতে সাহস হচ্ছে না। তেমনি মুসলমানদের এলাকায় হিন্দু শিখেরা যাতায়াত করতে পারছে না। চোখে মুখে সবার সন্দেহ আর ভয়ের ছাপ। গলির মোড়ে আর রাস্তার নাক বরাবর, জায়গায় জায়গায় লোকে হাতে লাঠি আর সড়কি নিয়ে মুখ ঢেকে লুকিয়ে বসে রয়েছে। যেখানে হিন্দুমুসলমান পাড়াপড়শিরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সেখানে তাদের মুখে কেবল এক কথা : 'খুব খারাপ হল। খুবই খারাপ হল।' এর বেশি কথা এগোতেই পারছিল না। চারদিকের আবহাওয়ায় এসে গিয়েছিল একটা জড়সড় ভাব। মনে মনে সবাই বুঝছিল যে, এই ঘটনার এখানেই শেষ নয়। কিন্তু ঠিক কী ঘটবে সে সম্বন্ধে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ঘরে ঘরে দরজায় খিল আঁটা। শহরের ব্যবসাবাণিজ্য, ইস্কুলকলেজ, আপিস-কাছারি সব কিছুর অবস্থা মন্দা। শহরের পথচলতি লোকের সারাক্ষণ মনে হচ্ছে দুপাশের বাড়ির জানলার পেছন থেকে অন্ধকার দেউড়ির ফাঁকফোকর থেকে কেউ তার ওপর চোখ রাখছে। তার পিছু নিচ্ছে। মানুষ যে যার পাড়ায় বন্দী। পরস্পরের যোগাযোগের একমাত্র উপায় এখন উড়ো খবর। যাদের অবস্থা ভালো তারা চাচা আপন বাঁচায় ব্যস্ত। সার্বজনিক সব কাজ চাপা পড়ে গেছে। কংগ্রেসের প্রভাতফেরী বলো, জনসেবা বলো, সব কাজ একদিনেই শিকেয়। তবু ভোর হতে না হতে রোজকার মতো জার্নাইল জো-সো করে রাস্তা পেরিয়ে কংগ্রেস আপিসের সামনে এসে হাজির হল। দরজায় তালা লাগানো দেখে জার্নাইল তার সঙ্গী-সাথীদের জন্যে বেলা হওয়া অবধি অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নালার ওপরকার চাতালে উঠে ছোট একটা বক্তৃতা দিয়ে তারপর চলে গেল।

বক্তৃতায় বলল : 'ভদ্রমহোদয়েরা, ভীতুর জাশুরা আজ যেহেতু ইঁদুরের গর্তে গিয়ে লুকিয়েছে, সেই জন্যে দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে—আজ প্রভাতফেরী হবে না। আপনাদের সবার কাছে এর জন্যে আমি মাপ চাইছি আর সবাইকে আবেদন জানাচ্ছি—আপনারা শহরে শান্তি বজায় রাখুন। এসব শয়তানি ইংরেজদের। তারাই ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে। জয় হিন্দ!' এই বলে চাতাল থেকে নেমে এসে জার্নাইল ঘাস-বিচালি-ঘাস করতে করতে ভোরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওদিকে রণবীর কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি। অবশ্য ওর কুশলসংবাদ দেবব্রত মাস্টার কোনোরকমে লালা লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। তাছাড়া, যে সময়ে লালাজী ভাবছেন কী-করব কোথায়-যাব, ঠিক তখনই স্বয়ং শাহনওয়াজ লালাজীর বাড়ি বয়ে এসে হাজির। খুব লম্বাচওড়া, ভারি সুপুরুষ দেখতে শাহনওয়াজ। নিজের গাঢ় নীল রঙের বুইক গাড়িতে করে এসেছে। শাহনওয়াজের সঙ্গে লালাজীর চেনাপরিচয় থাকলেও খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তখন তখনই লালাজী বউ মেয়েকে নিয়ে শাহনওয়াজের গাড়িতে করে মহল্লা ছেড়ে চললেন। থাকার মধ্যে থাকল বাড়ির দেখাশোনার ভার নিয়ে একা নানকু।

'চোখকান খোলা রেখে বাড়ি পাহারা দিস্, নানকু। সব কিছু তোর জিম্মায় রইল।'

মোটরগাড়ি ছেড়ে চলে গেল। জনশূন্য নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে এঁকে বেঁকে চলল সেই নীল বুইক্। এখানে সেখানে রাস্তায় দাঁড়ানো লোকেরা চেয়ে দেখতে লাগল লালাজীরা চলে যাচ্ছেন। সবাই দেখল, সামনে ড্রাইভারের সিটে বসে বাহারে টুপি মাথায় দেওয়া শাহনওয়াজ। সম্বন্ধীর বন্ধু। ফর্সা ধবধবে চেহারা। তার পাশে লালা লক্ষ্মীনারায়ণ। পেছনে মহিলা সওয়ারী। এভাবে নিয়ে যেতে সাহসের দরকার। রাস্তার কোথাও লোকের জটলা দেখলে লালাজী তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আর লালাজীর স্ত্রী পেছনের সিটে বসে শাহনওয়াজকে আশীর্বাদ করেন—এইসব লোক, যারা বিপদে বন্ধু হয়ে হাত বাড়ায়, তাদের অন্তরে পাতা থাকে ভগবানের আসন।

এরপর ঐ বুইক্ গাড়ি সপরিবারে লালাজীকে সদরবাজারে ওঁর এক সম্বন্ধীর বাড়িতে পেঁছে দিয়ে ফের শহরের রাস্তা ধরে চলে আসতে থাকে। এবার শাহনওয়াজ যাচ্ছে তার প্রাণের বন্ধু রঘুনাথের বাড়িতে। শাহনওয়াজ নিজের জানের পরোয়া করে না। ওর বুইকগাড়ি শহরময় চক্কর দিয়ে ফেরে।

জামা মসজিদের সামনে এসে গাড়িটা মোড় নিয়ে সতীমায়ের দীঘির দিকে এগোতে থাকে। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট দালান। ছোট দোকানগুলো ছাড়িয়ে ডাঁই-করা লাঠির ছাউনি একটা ধ্বংসস্তূপের মত দেখায়। এটা ছিল মুসলমান এলাকা। ভগ্নপ্রায় পুলটা পেরিয়ে বুইকগাড়ি সৈয়দপাড়ার দিকে মোড় নিল। ডাইনে বাঁয়ে ক্রমেই উঁচু উঁচু বাড়ি। গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতলা তিনতলা দালান। নিচে চওড়া চওড়া চাতাল। দরজা জানলায় রঙিন শার্সি। এখানে থাকে হিন্দু উকিলমোক্তার আর ঠিকাদার। দু-এক ঘর বাদ দিলে সবই হিন্দুর বাস। তাদের সঙ্গেই শাহনাওয়াজের ওঠাবসা ছিল, অন্তরঙ্গতা ছিল, খুব ভাবসাব ছিল। শাহনওয়াজ জানত ঘুলঘুলি দিয়ে অনেক চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। তার এই বিশ্বাস ছিল যে, তাকে দেখে সবাই চিনবে। সে গাড়ির স্পীড একটু বাড়িয়ে দিল।

সতীর দীঘির কাছে পেঁছে শাহনওয়াজ ডানদিকে মোড় নিল। এই এলাকাটা ছিল মেলানো মেশানো। সব জাতের লোকই সেখানে থাকত। একদিকে সারবন্দী যাদের দোকান ছিল তারা জুতো তৈরি করত। তারা ছিল হোশিয়ারপুরের লোক। সবাই শিখ। সব দোকানই বন্ধ ছিল। আরও এগিয়ে কিছু মাটির ঘর। তার দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া। এ পাড়াটাও খাঁ খাঁ করছিল। এটা ছিল ধাঙ্গড়দের বস্তি। শাহনওয়াজের গাড়ি ফের আস্তে আস্তে চলতে লাগল। এখানে সংকটের ছায়া তত গভীর হয়ে পড়েনি বলে মনে হল। ইলেকট্রিকের খুঁটির দুপাশে দুটি বাচ্চা ঘুরে ঘুরে এ ওকে ধরবার চেষ্টা করছিল। তার কাছেই আরেকদল বাচ্চা খেলছিল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাহনওয়াজ ভালো করে ওদের দেখল। বাচ্চাগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটি ছোট মেয়েকে ঘিরে ছিল। মেয়েটা তার জামাটা উঠিয়ে মাটিতে শুয়ে ছিল। আর তার উরোতের ওপর তার চেয়েও ছোট একটা

ছেলে বসে। ওর জামাও ওপর দিকে টেনে তোলা। আশপাশের দাঁড়ানো সমস্ত বাচ্চা হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। 'বজ্জাতের দল! এরা আর কোনো খেলা খুঁজে পেল না?' নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে শাহনওয়াজ এগিয়ে গেল। এই এলাকায় তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। থাকলেও তার চোখে পড়েনি।

শাহনওয়াজের মুখ দেখলে মনে হয়না কখনও ওর মনে কোনোরকম ইতরতা বা ক্ষুদ্রতার কোনো ছায়া পড়ত। দশাসই জোয়ান, টানটান বুকের ছাতি, মাথায় বাহারে পাগড়ি, পায়ে বুট জুতো সবসময় চকমক করছে। সবসময় ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট। ওর সম্বন্ধে লোকে বলে, 'দিব্যি করে বলতে পারি, ও কোনো মেয়ের দিকে চেয়ে হাসলে সে মেয়ে না হেসে পারবে না।' তবে এসব অনেক বছর আগের কথা। এখন ও ধীর স্থির বিষয়ী মানুষ। দু-দুটো পেট্রল পাম্পের মালিক। ট্রাক লরির ব্যবসা। তবে খুব বন্ধু বৎসল, মিশুক, সবসময় হাসিমুখ, তেমনি আবেগপ্রবণ। আগেও যেমনি ছিল এখনও তেমনি। বন্ধুবাৎসল্যকে শাহনওয়াজ তার ধর্ম বলে মনে করত। শহরে গন্ডগোল যখন শুরু হয়, রঘুনাথের খবরা-খবর নিতে এসে তার পাশে বসা রুটিওয়ালাকে সে বলেছিল, 'দেখ ফকির, দু কান দিয়ে ভাল করে শোন—যদি আমার বন্ধুর বাড়ির দিকে কেউ কুনজর দেয়, তো আমি তোকেই ধরব। কেউ যেন ওর ঘরের কাছে না ঘেঁষে।'

গাড়ি এবার বড় রাস্তায় এসে পড়ে। এলাকা এখান থেকে বড় হয়েছে। রাস্তা বেশ চওড়া, আশপাশের বাড়িগুলো রাস্তা থেকে দূরে দূরে। মুসলমান এলাকা। গাড়ি আস্তে চলতে লাগল। ঝাঝড় খানের দিকে যাওয়ার রাস্তার মোড়ে মৌলাদাদ দাঁড়িয়ে ছিল। পেছনের এক দোকানের চত্বরে পাঁচ সাতজন লোক মুখ বেঁধে হাতে সড়কি লাঠি নিয়ে বসে ছিল। পরনে খাঁকি রঙের ব্রিচেস; গলায় রঙ বেরঙের রেশমি রুমাল। শাহনওয়াজের গাড়ি আসতে দেখে মৌলদাদ এগিয়ে এল। শাহনওয়াজ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কী?'

'কী আর খবর হবে, খানজী! ওদিকে পেছনের মহল্লায় কাফেরগুলো এক গলির মুসলমানকে খুন করেছে,' বলতে বলতে মৌলাদাদের ঠোঁটে ঠোঁটে রাগ ঝলসে উঠল।

মৌলাদাদের চোখ রাগে জ্বলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ও বলছে: তুমি তো খানজী, কাফেরদের বুকে টেনে নাও, ওদের সঙ্গে ঢলাঢলি করো যখন মুসলমানরা মরছে।' কিন্তু মৌলাদাদ মুখে কিছু বলল না। সে জানত শাহনওয়াজের প্রভাব প্রতিপত্তি ওর চেয়ে অনেক বেশি। ডেপুটি কমিশনার থেকে শুরু করে শহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোক পর্যন্ত শাহনওয়াজের জন্যে অবারিত দ্বার। সেক্ষেত্রে মৌলাদাদ বছরের পর বছর শুধু কমিটির আশপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে।

'পাঁচ কাফেরকে আমরাও কোতল করেছি। ওদের মা-কে...'

খিস্তিটা কানে যাবার আগেই শাহনওয়াজ গাড়ি চালিয়ে দিল।

কিছুটা যাবার পরই ডানদিকের আরেকটা গলি থেকে হঠাৎ অনেক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তারা চুপচাপ রাস্তা পার হচ্ছিল। মুসলমানদের এক

শবযাত্রা। জানাজার সামনে ছিল হায়াতবক্স। তার মাথায় ছিল কুল্লা। গায়ে সাদা কামিজ আর সালোয়ার। জানাজার লোকদের হালকা হালকা পায়ের শব্দ যেন হাওয়ার বুকে চড় মারতে মারতে যাচ্ছিল। শাহনওয়াজ বুঝতে পারল মৃতদেহটি মুসলমানের। জানাজার পেছনে পেছনে ছোট ছোট দুটি ছেলে আসছিল। নিশ্চয় ওই মৃত লোকটির ছেলে।

একটু পরেই রাস্তা খালি হয়ে গেল, শাহনওয়াজ আবার গাড়ি নিয়ে এগোতে লাগল।

ফটক পার হয়ে শাহনওয়াজ একটা গাছের ছায়ায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে আঙুলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বাংলোর দিকে এগোতে লাগল। জানলার পর্দার আড়াল থেকে রঘুনাথের বউই তাকে প্রথম দেখতে পেল। ওকে চিনতে পেরে সে খুব খুশি হল।

'ও কালা, দরজা খোল'। বাইরে থেকে আওয়াজ এল। রঘুনাথের বউ ছুটে বাথরুমের দিকে গেল।

বাথরুমের দরজার বাইরে থেকে রঘুনাথকে ডেকে বলল, 'শাহনওয়াজ তোমার কাছে এসেছে। আমি ওকে বসাচ্ছি, তুমি এস।'

দরজা খোলার আগেই শাহনওয়াজ ফের বলতে লাগল, 'আরে, ও আবু! বাংলোয় থাকতে আরম্ভ করে দেখছি আর দরজা খোলে না।' তারপর সামনে হঠাৎ রঘুনাথের বউ দাঁড়িয়ে আছে দেখে হকচকিয়ে গেল: 'সেলাম, বহুজী! আমার বন্ধুটি কোথায়?' বলে শাহনওয়াজ বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইল। রঘুনাথের বউ বলল, 'বাথরুম সেরে ও এখুনি এসে পড়বে।' তারপর শাহনওয়াজের কাছে চেয়ারে বসল।

'এখানে সব কে কেমন আছে? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো, বহুজী? ওখান থেকে চলে এসে ভালই করেছ।'

'ভালই আছি। তবে নিজের বাড়ি, সে একটা আলাদা জিনিস। জানি না কখনও আর ফিরে যেতে পারব কিনা।' বলতে বলতে রঘুনাথের বউয়ের চোখ ছলছল করে উঠল।

দেখে শাহনওয়াজেরও মনটা কেমন করে উঠল। 'কেঁদো না বহুজী, আমি যদি বেঁচে থাকি নিজের ঘরে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবই। তুমি কিছু ভেবো না।'

রঘুনাথের সমস্ত মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র শাহনওয়াজের সামনে রঘুনাথের বউয়ের আসতে কোনো পর্দা মানার দরকার পড়ত না। রঘুনাথ নিয়ে গর্ববোধ করত যে, তার একমাত্র নিকট বন্ধুটি মুসলমান।

'ফাতিমাকে আনলে না কেন? আসবার সময় বউকে সঙ্গে আনতে পারলে না?'

'শহরে গোলমাল হচ্ছে, বহুজী। কী ভাবছ তুমি? আমি কি হাওয়া খেতে বেরিয়েছি?'

'তুমি আসতে পারলে, ও আসতে পারল না? গাড়িতে বসিয়ে নিলেই তো হত।'

এমন সময় রঘুনাথ এসে গেল।

'আরে আরে! এখানে এসেও তোর ভয় গেল না? ফের এখানে এসেও সেই নলিখলি!'

এরপর দুজনের কী কোলাকুলির ঘটা! শাহনওয়াজের মনের ভাব তখন: 'বন্ধুর জন্যে আমি জান দিয়ে দিতে পারি। কেউ যদি ওর গায়ে হাত তোলে আমি তার গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেবো।'

রঘুনাথের বউ ওঠবার উপক্রম করতেই শাহনওয়াজ বলে উঠল, 'আহা যাও কোথায়? আমি এখন কিছু খাব না।'

'বারে, কিছু খাবে না?'

রঘুনাথ ওর বউ জানকীকে বলল, 'কেন শুনছ ওর কথা? যাও, কিছু খাবার বানিয়ে নিয়ে এসো।'

'যা যা! ভিণ্ডি না পিণ্ডি—ওতে আমি নেই। আমি ভিণ্ডি খাই না। বহুজী, কিছু বানাতে হবে না।'

জানকীকে যেতে দেখে পেছন থেকে শাহনওয়াজ চেঁচিয়ে বলল, 'খোদার কসম, বহুজী! আমি কিছু খাব না। আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। দু মিনিটের জন্যে এসেছি।'

জানকী ফিরে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, 'খাবার না খাও, একটু চা করে দিই।'

'এ আমি তখনই জানতাম খাওয়া আমার কপালে নেই। ঠিক আছে, চা-ই হোক।'

দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে। রঘুনাথ থমথমে গলায় বলল, 'কোথা থেকে কী হয়ে গেল! কী খারাপ যে লাগছে। ভাই হয়ে ভাইয়ের গলা কাটছে।'

কিন্তু কথাটা বলামাত্র দুজনের মধ্যে হঠাৎ একটা দূরত্ব এসে গেল। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক এক কথা, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক হল অন্য কথা। রঘুনাথ চেষ্টা করছিল ব্যক্তির সম্পর্কের সঙ্গে জাতের সম্পর্ককে জুড়ে দিতে। সেখানে দুজনের বোধ-অনুভূতি মেলে না।

'শুনেছিস, গ্রামেও দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে।' রঘুনাথ বলল। এ বিষয় নিয়ে বেশি কচলাবার অবকাশ ছিল না। সেটা দুজনেই তালেগোলে টের পাচ্ছিল। বিষয়টা যেন ওদের হার্দ্য বাক্যালাপের ওপর একটা কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিল।

'থাক আবু, ওসব পরের কথা থাক।' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে শাহনওয়াজ বলল, 'জানিস আবু, কাল কার সঙ্গে দেখা হল?' তারপর আধো আধো গলায় বলল, 'ভীমার সঙ্গে।'

'কোন্ ভীমা?' রঘুনাথ জিজ্ঞেস করার পরই দুজনে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল।

ছেলেবেলায় ভীমা ওদের সঙ্গে পড়েছে। শহরের এক কেউকেটা 'ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট সিটি পোস্টমাস্টারের বেটা, বলে সব সময় ও নিজের পরিচয় দিত। তাই বন্ধুরা ওকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করত।

'দুবছর কাফেরটা এখানেই আছে। অথচ একদিনও দেখা করে নি।' বলে শাহনওয়াজ ফের হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। আমি দূর থেকে দেখেই ওকে চিনতে পেরে ডাক দিয়েছিলাম : ও ডেপুটি-অ্যাসিস্ট্যান্ট-সিটি-পোস্টমাস্টার সাহেব !' হতভাগা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দুজনের সে কী মধুর মিলন !'

জানকী চা এনে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'খানুজী তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।'

দুজনেই সোয়াস্তি পেল জানকী আসায়। দাঙ্গা প্রসঙ্গে কথা বলার সময় দুজনেই আড়ষ্ট বোধ করছিল। ভাবছিল, নিজেরা বসে এভাবে আর এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিয়ে কখনও আলোচনা করবে না। কিন্তু তাতেও একটা যেন বাধো-বাধো ভাব থেকে যাচ্ছিল। ছেলেবেলার হাসির কথা আর ঠাট্টা-তামাসা—সেও যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হচ্ছিল।

'বলো না, বহুজী।'

'তোমার অসুবিধে না থাকলে তবেই—'

'আগে বলোই না।'

'আমার আর আমার বড় জায়ের গহনার একটা বাক্স ও-বাড়িতে ফেলে এসেছি। সেটা বার করে আনতে হবে। আসবার সময় অল্প কিছু জিনিস আনতে পারা গেছে। আমি তো এসেছি এক কাপড়ে।'

'এ আর কী শক্ত কাজ, বহুজে ? সামান্য ব্যাপার। কোথায় রাখা আছে ?'

'ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির ঘরে।'

ও-বাড়ির আনাচ-কানাচ সবই শাহনওয়াজের চেনা। বন্ধুদের মধ্যে একা ওর ছিল বন্ধুর বাড়িতে অবাধ প্রবেশ।

'ওখানে তো তালা দেওয়া। ইয়া বড় সিক্কার তালা।'

'আমি তোমাকে চাবি দিয়ে দিচ্ছি। কোথায় আছে জায়গাটাও বলে দিচ্ছি।'

'বার করে আনব, আজকের মধ্যেই।'

'মিলখী ওখানেই আছে। ওকে বললেই তালা-টালা যা খোলাবার ও খুলে দেবে।

'মিলখী আছে ওখানে। সকালে আমি একটা চক্কর মেরে সব দেখে এসেছি। ওর খোঁজখবরও নিয়েছি।'

'খাচ্ছে-দাচ্ছে কোথায় ?

'সবঘরই এখন ওর। রান্নাঘরেই নিশ্চয় নিজের রান্নাটা করে নেয়। না করার কী আছে ?' রঘুনাথ বলে।

'ভাঁড়ারে এত জিনিস আছে যে, ছ-মাস চোখ বুজে খেয়ে যেতে পারবে।' বলে জানকী শাহনওয়াজের দিকে ফিরে বলল, 'চাবি এনে দিই ?'

শাহনওয়াজ ভাবালু হয়ে পড়ল। ভেবে গর্ব বোধ করল যে, হাজার হাজার টাকার গয়নার চাবি জানকী আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। আমাকে আপনার জন বলে মনে করে বলেই তো!

দেখতে দেখতে জানকী চাবি ঝনাৎ ঝনাৎ করতে করতে এসে গেল।

'আর যদি আমি তোমার গয়নার বাক্স হাওয়া করে দিই, বহুজী?'

'তোমার চেয়ে কি আমার গয়না বেশি হল, খানজী? তুমি যদি ফেলে দিয়েও আসো, তাও আমি ইস! বলব না। আমি বলব তোমারই গ্রহেরই ফের।'

আর তারপরই চাবির গোছা থেকে চাবি বেছে নিয়ে শাহনওয়াজকে দেখিয়ে সব বোঝাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর শাহনওয়াজ বিদায় দিয়ে উঠে পড়ল। তারপর দুই বন্ধুতে কোনো কথা না বলে গাড়ির কাছ অবধি এল।

রঘুনাথের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃতজ্ঞতার কথা বেরিয়ে এল: 'কী বলে যে তোমাকে আমি ধন্যবাদ দেব, ভাই শাহনওয়াজ। তুমি আমার অশেষ উপকার করলে।'

'চুপ করে থাক, বিট্‌লে।' শাহনওয়াজ ধমক দিল: 'যা, ঘরে গিয়ে বস্‌। হাগু কর গে।' বলে সে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসল। রঘুনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'যা না, যা। কেন এখানে বকে বকে আমার মাথার পোকা বার করে দিচ্ছিস?'

তাও রঘুনাথ গেল না। শাহনওয়াজের হাতে দেবার জন্যে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'যা না, যা। আমার হাত নোংরা করিস্‌ নে, যা। কোনো বাক্যবাগীশের সঙ্গে বসে বকবক কর গে। কেন খামাখা এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘাঁটাচ্ছিস? তোর মতো আমি অনেক দেখেছি।'

বলে শাহনওয়াজ স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

গয়নার বাক্স আনবার জন্যে শাহনওয়াজ যখন রঘুনাথের পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছুল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

'মিল্‌খী দরজা খুলতে একটু দেরি করল। 'কোন্‌ জী?'

'দরজা খোলো। আমি শাহনওয়াজ।'

'কোন্‌ জী?'

'খোলো, খোলো! আমি শাহনওয়াজ।'

'আসছি, জী। ভেতর থেকে তালা দেওয়া আছে, জী। এখুনি এসে পড়ছি, জী। চাবি রেখেছি আখার মধ্যে।'

রাস্তার ওপারে ফিরোজ চামড়াওয়ালার আড়ত। চাতালে দাঁড়িয়ে ফিরোজ দুটো গাঁঠরিতে ঠিকানা লাগাচ্ছিল। ঐদিকে শাহনওয়াজকে তাকাতে দেখে লোকটা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে শাহনওয়াজের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

শাহনওয়াজ মুখ ফিরিয়ে নিলেও বুঝতে পারছিল বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে ফিরোজ তাকে সমানে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

লোকটা যেন মনে মনে বলছে, 'আজও হিন্দুর বাড়িতে দরজার কড়া নাড়ার অভ্যেস তোর গেল না?'

পাশ দিয়ে একটা টাঙ্গা চলে গেল। শাহনওয়াজ ঘুরে গিয়ে দেখল। চৌধুরী মৌলাদাদ তার অদ্ভুত পোশাকে—পরনে ব্রিচেস আর গলায় রংবেরঙের রেশমী রুমাল জড়িয়ে—খোলা টাঙ্গায় চড়ে মুসলমান এলাকাগুলো টহল দিচ্ছে। শাহনওয়াজকে দেখে সে হেসে একটু বেশি রকম উঁচুতে হাত তুলে বলল, 'সেলাম আলেকুম!'

শাহনওয়াজ একটু কুঁকড়ে গেল। চাকরটার ওপর ওর রাগ হল। দরজা খুলতে এত দেরি করছে কেন লোকটা?

ভেতর-বাড়ির তালা খোলার আওয়াজ হল। আস্তে আস্তে দরজার পাল্লা ফাঁক করে শাহনওয়াজকে দেখে মিলখী বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হাসল। শাহনওয়াজ পায়ের ঠোক্করে দরজাটা হাট করে খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

'দরজা বন্ধ করে দাও।'

'হ্যাঁ দিচ্ছি, খান্‌জী।'

বাড়ির অন্ধকার বারান্দাটা পেরোতে পেরোতে শাহনওয়াজের যেন প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এই অন্ধকার বারান্দায় আজ অনেকদিন পর সে পা দিল। বাড়ির সুপরিচিত গন্ধটা ওর ভারি ভালো লাগল। অনেক বছর আগে ও যখন বারান্দা দিয়ে ভেতরে আসত, রঘুনাথের ছোট মেয়ে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে ড্যাব ড্যাব করে ওর দিকে চেয়ে থাকার পর হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে কোলে নিতে বলত। এ বাড়িতে সে এলেই মেয়েটা এক ছুটে বারান্দায় চলে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসত। বারান্দা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার সময় কমবয়সী বউ-ঝিরা দরজার আড়াল থেকে ছুটে ভেতরে চলে যেত। সেও আজ অনেকদিন হয়ে গেল, রঘুনাথ যখন প্রথম প্রথম ওকে বাড়ির ভেতরে আনতে শুরু করেছিল। হাসি-হাসি মুখের মেয়েদের যদি কারো নজরে যে, পড়ত ও শাহনওয়াজ—সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়ে ছোটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যেত।

'ও আপনি? আমি ভেবেছিলাম কে না কে।'

শাহনওয়াজের মন মধুর স্মৃতিতে ভরে উঠল। এই বাড়িতে রঘুনাথ আর তার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সন্ধ্যেগুলো বড় আনন্দে কেটেছে। শাহনওয়াজ আসামাত্র রঘুনাথের ছোট ভাইয়ের বউ ওর জন্যে ডিমের ওমলেট বানাতে ছুটে যেত। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ির সবাই আঙিনায় এসে বসত।

মিল্‌খী হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির সবাই ভালো আছে তো, খানজী?'

এতক্ষণে ওর সম্বন্ধে শাহনওয়াজের খেয়াল হল। ব্যাটা হাত কচলানোর ভঙ্গিতে হাত জোড় করে আছে। ওর ঘোলা-ঘোলা চোখ, কীটাণুকীটসুলভ কথা

বলার ভঙ্গি আর কুঁচকে-থাকা শরীর শাহনওয়াজ দুচক্ষে দেখতে পারে না। আজও মিল্‌খীর চোখদুটো ঘোলা। কোনো সময় বাড়ির সবাই মিলে মিল্‌খীকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করলে লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢাকত, বিলকুল মেয়েদের মত। তাতে সবাই খিল খিল করে হেসে উঠত। তখন এতটা খারাপ না লাগলেও ওকে চ্যাটচেটে কাঁকলাসের মতো মনে হত। ও ঠিক কোথাকার লোক কেউ জানে না। পাঞ্জাবী নয়, গাড়োয়ালীও নয়। ওর ক্ষুদে-ক্ষুদে ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁত দিয়ে এক কিম্ভুত-কিমাকার খিঁচুড়ি ভাষার শব্দ পেষাই হয়ে বেরিয়ে আসত।

উঠোনের ঠিক মাঝখানে তিনটে ইঁট পেতে মিল্‌খী তার চুলা বানিয়ে রেখেছে। তার ছাই উঠোনময় ছড়ানো। তার চেয়েও বেশি এখানে সেখানে পড়ে থাকা বিড়ির টুকরো।

শাহনওয়াজ জিজ্ঞেস করল, 'রান্নাঘর থাকতে সেখানে তুই কেন রাঁধিস না?' মিল্‌খী ঘাড় কাত করে হাসল।

'একা তো লোক। এখানেই ডাল চড়িয়ে দিই।'

'চালডাল সব আছে তো? কোনো কিছু লাগবে?'

'কিছু লাগবে না। অনেক আছে। পাশেই থাকে রুটিওয়ালা। সেও রোজ আমার খোঁজখবর নেয়। আপনিই তো ওকে বলে গিয়েছিলেন।'

'কোন্ রুটিওয়ালা?'

'কেন, নালার কাছে যে বসে? বিড়ির বাণ্ডিলও বাইরে থেকে ও ছুঁড়ে দেয়। বড় ভালো লোক।' বলে মিল্‌খী খিঁক্ খিঁক্ করে হাসে।

উঠোনের ভেতরে, ঠিক রান্নাঘরের সামনে দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। শাহনওয়াজ সিঁড়ির ওপর পা রেখে উঠোনের দিকে তাকালো। বড় ঘরের দরজা উঠোনের দিক থেকে খোলে। সেটা বন্ধ। ঘরের ভেতরে কী আছে না আছে শাহনওয়াজের সব নখদর্পণে। আগুন-পোহানোর জায়গায় ওপর রঘুনাথের মার ছবি। ভেতরে আছে দুটো খাট আর একটা উঁচু পালঙ্ক। বন্ধ দরজার দিকে চোখ পড়ে শাহনওয়াজের ভারি ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। বন্ধ দরজার বাইরের দালানে মিল্‌খীর তামাকের ছিলিম উল্টে আছে। তার কাছে ওর ময়লা কাঁথাকানিগুলো পড়ে রয়েছে।

'তুই এখানে বসে বসে করিস কী? মেঝেটাও একটু ঝাঁট দিয়ে নিতে পারিস্ না?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে মিল্‌খী বলে, 'ওরাই নেই, এখন আর ঝাড়পোঁছ করে কী হবে, খানজী?' মিল্‌খী যখন কথা বলে তখন শাহনওয়াজের মনে হয় গম্বুজ ঘর থেকে কথা উঠে আসছে, যখন চুপ করে তখন চারদিক নৈঃশব্দ্য ছেয়ে যায়।

'যে ঘরে আসবাবপত্র থাকে সেটা মাঝের ছাদে না?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। সিঁড়ির সামনে—যেখানে একটা বড় তোরঙ্গ রাখা আছে।'

শাহনওয়াজের পেছনে পেছনে মিল্‌খীও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

চাবির গোছায় কম করে পনেরোটা চাবি। একটা ছিল ছোট পেতলের চাবি। জানকী প্রথমে বড় তালার চাবিটা দেখিয়ে দিয়েছিল। পরে আলমারির ছোট পেতলের চাবিটা দেখিয়ে বলেছিল : 'এই চাবিটা, খান্‌জী। ভুলে যেয়ো না।'

কিন্তু শাহনওয়াজ চাবি খুঁজতে গিয়ে চক্‌করে পড়ে গেল। 'এই বড় তালার চাবি কোন্‌টা, জানো তুমি ?'

'জানি খানজী। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।

মিল্‌খী চাবির গোছার ওপর ঝুঁকে পড়ে এমন নিপুণ হয়ে চাবি বাছতে লেগে গেল যে, দেখে মনে হল যেন কোনো মাছি-মারা কেরানি ঝুঁকে পড়ে খাতার অংক মেলাচ্ছে। সব ধরেও মিল্‌খীর মাথা শাহনওয়াজের কনুইয়ের কিছুটা ওপর অবধি আসে। শাহনওয়াজের পাগড়ির নিচে থেকে মিল্‌খীর টিকি-ঝাঁকানো নজরে আসছিল। বাঁ কানের ওপর থেকে সেটা একটা তেঁতুলে বিছের মতো বেরিয়ে আছে। দেখে শাহনওয়াজের গা সিব সিব করে উঠল।

তালা খুলে ফেলেছে মিল্‌খী। ঘরের ভেতরে দমবন্ধ করা অন্ধকার। মিল্‌খী এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিতেই বাড়ির পেছনের দিকটা নজরে এল। সেদিকে একটা মসজিদ। তার পুরো আঙিনাটা দেখা যায়। জানলা খুলতে ঘরের ভেতরকার সব জিনিস দেখা যেতে লাগল।

ঘরের ভেতরে যত না গুমট, তার চেয়ে বেশি মেয়েদের কাপড়ের গন্ধ। মনে হয়, রঘুনাথের তিন ভাইবউই বেরোবার আগে তাড়াহুড়ো করে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঘরের বড় তোরঙ্গের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ঘরটা তোরঙ্গ আর সিন্দুকে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে।

তোরঙ্গগুলোর ভেতর দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে আলমারি অবধি পেঁছুনো গেল। ওরই মধ্যে রাখা আছে গয়নার বাক্স।

এই সময় খোলা জানলার ভেতর দিয়ে মসজিদের আঙিনার দিকে শাহনওয়াজের চোখ পড়ল। ওজু করার পুকুরের ধারে অনেক লোক বসে। দেখে মনে হল, ভিড়ের মাঝখানে একটা লাশ রাখা আছে। আরও একটা জানলার দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠল। রঘুনাথদের বাড়িতে গাড়িতে করে যাওয়ার পথে সেটা সে দেখেছিল। কিছুক্ষণ সে জানলা দিয়ে মসজিদের দিকে মুখ করে ঠায় বসে রইল।

গয়নার বাক্স বার করে আনতে দেরি হল না। নীল মখমলে মোড়া বাক্স। ওটা আগে ছিল এ-বাড়ির কোনো বউয়ের প্রসাধন রাখার ডিব্বা। বাক্সটা খুব সন্তর্পণে ধরে বাইরে নিয়ে এসে আলমারিতে তালা লাগিয়ে দিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। চাবির গোছা নিয়ে মিল্‌খী আগে আগে নামছিল। গয়নার বাক্সটা দুহাতে উঠিয়ে শাহনওয়াজ পেছনে পেছনে আসছিল। হঠাৎ দপ্‌ করে ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠে। কেন যে ওর হঠাৎ এমন হল কে জানে। মিল্‌খীর টিকিতে চোখ পড়ে গিয়ে, মসজিদের আঙিনায় লোকের ভিড় দেখে, নাকি কারণটা ছিল এই যে—সমানে তিনদিন ধরে ও যা দেখেছে, যা শুনেছে তাতে ওর হৃদয় মথিত করে গরল উঠে এসেছে। শাহনওয়াজ

হঠাৎ এগিয়ে এসে মিলখীর পিঠে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল। মিল্‌খী লাথি খেয়ে গড়াতে গড়াতে সিঁড়ির বাঁকে গিয়ে পড়ে দেয়ালে ধাক্‌কা খেল। নিচে গিয়ে পড়ার সময় মিল্‌খীর মাথা ফেটে চৌচির হওয়ায় আর শিরদাঁড়া ভেঙে যাওয়ায় ওর আর ওঠার ক্ষমতা হয় নি। শাহনওয়াজ মিল্‌খীর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখল ওর মাথা নিচের দিকে লট্‌কে আছে আর ওর পা শেষ দুটো সিঁড়িতে লট্‌কানো। যে রাগের কারণ সে নিজেই জানত না, শাহনওয়াজের সেই রাগ উত্তরোত্তর বাড়ছিল। পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর একবার মনে হয়েছিল, দিই ওর মুখে ক্যাঁৎ করে এক লাথি, পোকাটাকে থেঁৎলে দিই—কিন্তু ওর ভয় হল তাতে হয়ত সিঁড়ির বাঁকে এসে টাল সামলাতে পারবে না।

নিচের উঠোনে পড়ে ও একবার মিল্‌খীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। মিল্‌খীর খোলা চোখের দৃষ্টি শাহনওয়াজের দিকে নিবদ্ধ। মনে হচ্ছিল, ও যেন বুঝে উঠতে পারছে না ওর কোন্ ভুলের জন্যে খান্‌জী এমন ক্ষেপে গিয়ে ওকে মারলেন। পড়ে যেতে যেতে মিল্‌খীর মুখ দিয়ে একটা আঁ-আঁ শব্দ হয়েছিল। তারপর থেকে সে চুপচাপ। ভয়ে ওর দম নিক্‌লে গেছে, না অজ্ঞান হয়ে গেল, নাকি শেষমেশ ঘাড়টাই মট্‌কে গেল?

শাহনওয়াজ ওকে ঐভাবেই ফেলে রেখে, গয়নার বাক্স বগলদাবা করে বাইরে এসে, মিল্‌খী যে বড় তালাটা আগে বাড়ির ভেতরে লাগিয়েছিল, সেই তালাটা বাড়ির বাইরে ঝুলিয়ে দিল।

সে রাতে জানকীর হাতে গয়নার বাক্সটা তুলে দেওয়ার সময় বিচলিত হওয়ার কোনো লক্ষণ শাহনওয়াজের মধ্যে প্রকাশ পেল না। বাক্সটা হাতে নেওয়ার সময় জানকীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সারা অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল। রঘুনাথ অন্তরে অন্তরে পঞ্চমুখে তার বন্ধুর চরিত্রগুণ আর বুদ্ধিবিচারের প্রশংসা করছিল—কেননা আজ যখন চারিদিকে আগুন জ্বলছে, তখন তার প্রতি তার এই মুসলমান বন্ধুর নিষ্ঠা অবিচল আছে।

'একটা খারাপ খবরও আছে বহুজী।'

'কী খবর? ও বাড়িতে চুরিটুরি হয়েছে?'

'না, তা নয়। মিল্‌খী বিচ্ছিরিভাবে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে, ওর হয়ত হাড়-গোড় ভেঙে গেছে। গোড়ায় ভেবেছিলাম ডাক্তার ডাকি। কিন্তু একে রাত্তির, তায় এই সময় ডাক্তার ডাকলেই কি আর আসবে? কাল দেখব একবার চেষ্টা-চরিত্র করে।'

'বেচারা!'

'যদি বলো তো ওকে এখানে পেঁছে দিয়ে যাব। ওখানে কোথায় একা পড়ে থাকবে? দেখাশুনোর জন্যে আমার কোনো লোকজন বরং ঐ খালি বাড়িতে রেখে আসব?'

শুনে বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রী দুজনেই আপত্তি করে উঠল। ওরা এ পাড়ায়

নতুন, কাউকেই চেনে না শোনে না। রুগী ঘাড়ে নিয়ে কী করে তারা সামাল দেবে? যেখানে শাহনওয়াজের মতন লোকের পক্ষেই ডাক্তার জোটানো কঠিন, সেক্ষেত্রে ওদের পক্ষে তো সম্ভবই নয়।

শাহনওয়াজ ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, সে একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। কিছু একটা করা যাবে খন। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

জানকী এ ব্যাপারেও শাহনওয়াজের কাছে কৃতজ্ঞ। তার প্রশস্ত ললাট, জ্যোতির্ময় মুখ দেখতে দেখতে জানকীর খালি মনে হচ্ছিল ও যেন সামনে একজন পুণ্যাত্মা পুরুষকে প্রত্যক্ষ করছে।

এগারো

নাওয়া-খোয়া সেরে দেবদত্ত হাত ডলতে ডলতে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। যখনই ও হাত রগড়াতে থাকবে, কিংবা ডান হাত যখনই মুখ আর নাকের ওপর বুলিয়ে এনে দুটো হাত ডলতে থাকবে, তখনই ধরে নিতে পারো যে, দেবদত্ত কী করবে না করবে আগে থেকে এঁচে রাখছে। ওর মাথাতেই ওর ডায়রি। ওর হাত রগড়ানো, নাক ঘষা—এর ভেতর দিয়ে একটা একটা করে কাজ মাথার মধ্যে টুকে রাখা হচ্ছে। রস্তা থেকে কমরেডদের কোনো রিপোর্ট এখনও এসে পৌঁছোয় নি। ওখানে ব্যাপার সুবিধের নয়। কাউকে পাঠাতে হবে।'

'শহরে দাঙ্গা রুখতে গেলে ফের আরেক বার কংগ্রেস আর লীগকে এককাট্টা করতে হবে। হায়াতবক্স আর বক্সীজীকে এক সঙ্গে বসাতে হবে।' দেবদত্ত কালকেও পরের পর অনেকের বাড়িতেই গিয়েছিল। রাজারাম ওকে দেখে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। রামলাল খিঁচিয়ে উঠেছিল, কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভালোমন্দ বলেছিল, তবে হায়াতবক্স দেখা করতে রাজী হয়েছিল; হায়াতবক্সের চোখ লাল হয়ে ছিল। ওকে দেখে স্লোগান দিতে লাগল: 'নিয়ে ছাড়ব পাকিস্তান!' 'বানিয়ে ছাড়ব পাকিস্তান!' ও তো দেবদত্তকে মুখ খোলারই কোনো সুযোগ দেয় নি। বক্সীজীকে হায়াতবক্সের কাছে পাঠাও, অটলকে সঙ্গে নিয়ে বক্সীজীর কাছে যাও আর আমিনকে নিয়ে যাও হায়াতবক্সের কাছে। পরে এ প্রস্তাব বাতিল করে দিল। লীডারদের বাদ দাও। কংগ্রেস, মুসলিম-লীগ আর সিং-সভা থেকে দশ জন করে লোক নিয়ে এক সঙ্গে বসাও। দেবদত্ত নিজের মনে মাথা নেড়ে সায় দিল। পার্টি আপিসে গিয়ে দলের লোকদের সঙ্গে বসে এটাকে বাস্তবে ফলিয়ে বলতে হবে। আরও একটি প্রশ্ন সামনে এসে হাজির হল: মজুর এলাকায় দাঙ্গা রুখতে গেলে একা-একা হবে না। রস্তা মুসলমান এলাকা। সেখানে কমরেড জগদীশকে পাঠানো হয়েছে। একা জগদীশ সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। গ্রামে অবিলম্বে দুতিন জন কমরেডকে পাঠানো দরকার, তারা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ছুটে বেড়াক। কমরেডের সংখ্যা বেশি নয়।

তাও যতদূর সম্ভব দাঙ্গা রোখার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নাকে আবার ওর হাত চলে গেল। হাতঘড়িতে সময় দেখল। দশটায় কমিউনে মিটিং আছে। কমরেডরা এসে যে যার এলাকার রিপোর্ট দেবে। এবার যাওয়া যাক। বলে দেবদত্ত চুপচাপ ভেতরে ঢুকে বারান্দা থেকে নিঃশব্দে সাইকেল বার করতে লাগল।

'কে ওখানে? দেবদত্ত?'

দেবদত্ত সাইকেল রেখে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

দেবদত্তের বাবা খাটে বসেছিলেন। মধ্যবয়সী স্থূলকায়। বললেন, 'আবার কোথায় চললে? মরবার জন্যে যদি পাখা উড়ে থাকে, আগে বাড়ির লোকদের মেরে তারপর যাও। তোর চোখ নেই? দেখছিস না শহরের কী অবস্থা?'

দেবদত্ত দালানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাত মলতে আর নাক ডলতে লাগল। হেঁসেল থেকে মা দোপাট্টায় হাত মুছতে মুছতে ভেতরে এলেন: 'আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে কী পাস্ তুই? দেখছিস্ না কাল কিভাবে আমরা রাত কাটিয়েছি! ওদিকে আগুন জ্বলছে, আর সেখানেই তুই রাতভর ডুব মারলি।'

দেবদত্ত হাত রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'পেছনে মরী রোড থেকে সামনে কোম্পানি বাগান পর্যন্ত সারা এলাকা হিন্দুদের। এ বাড়ির চতুর্দিকে খানদানী হিন্দুর বাস। আপনাদের কোনো বিপদের ভয় নেই।'

বাবা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'তুই বুঝি দিব্যজ্ঞানে জেনে গিয়েছিস আমাদের কিছু হবে না?'

'এ লাইনে দশটা বাড়িতে বন্দুক আছে। এ পাড়ার যুবক-সভার ছেলেরা তিন জনকে কোতল করেছে।...'

'এই অজ পাঁঠা, কে বলল আমরা নিজেদের বিপদের ভয়ে মরে যাচ্ছি? আমরা ভাবছি তোর বিপদের কথা।'

'তেমন কোনো বিপদের ভয় নেই।' বলে দেবদত্ত বারান্দায় ফিরে গিয়ে সাইকেল বার করতে লাগল।

মা গলায় দোপাট্টা জড়িয়ে দেবদত্তের রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন।

'কাল সারারাত বুক ধড়াস ধড়াস করে কেটেছে! দেখছিস না মাথায় আজ কী বিপদ ঘনিয়ে এসেছে?' দেবদত্ত দেখল ব্যাপার ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে। একবার হাত রগড়ে, একবার নাক মলে নিয়ে মার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল: 'আমি এখুনি এসে যাব। তুমি চিন্তা করো না।'

'আমায় ধোকা দিতে চাইছিস? কালকেও বলে গিয়েছিলি ফিরে আসব। তোকে আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করতে হবে বেলা পড়ার আগেই তুই ফিরে আসবি।'

'ফিরব তো বলছি। না, ওসব দিব্যি টিব্যিতে আমার বিশ্বাস নেই।' বলে সাইকেল টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে দেবদত্তের বাবার গলা ভেসে এল:

'ও সেই ছেলে? কথা শুনবে! আমাদের থোড়াই কেয়ার করে চলে গেল।

একটা শুয়োর পয়দা হয়েছে, মা বাপের দিকে তাকানো নেই—চললেন দাঙ্গা বন্ধ করতে। শুয়ার কঁাহা কা…।'

দেবদত্ত সাইকেল নিয়ে বাইরে চলে এল।

ভেতর থেকে ভেসে আসছে তখনও লম্ফ ঝম্প।

'সবাই যা তা বলে—কাজ নেই, কামাইও নেই। যত সব ভাট, কুলিকাবাড়ি আর মুটে মজুরদের উনি এককাট্টা করে বেড়াচ্ছেন, লেকচার ঝাড়ছেন। মুখে দাড়ি না গজাতেই ব্যাটা লীডার বনে গেছে। নচ্ছার শুয়োর।…'

দেবদত্ত চৌমাথায় পেঁাছে গেল।

অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। রাস্তার পর রাস্তা খঁা খঁা করছে, কোথাও দোকানপাট খোলা নেই, মোটর গাড়ি বা টাঙ্গা কোনোটাই চলছে না। কোনো দোকানের দরজা খোলা দেখলেই বুঝবে সে দোকান লুট হয়ে গেছে। লাঠি-ধারী লোক দঁাড়িয়ে থাকতে দেখলেই বুঝবে ওটা ঐ সম্প্রদায়ের পাড়া। যেখানে ওরা দঁাড়িয়ে, তার পরেই শুরু হয়েছে অন্য সম্প্রদায়ের বসতি। অবশ্য সব মহল্লাতেই এভাবে পাড়া আলাদা নয়। রাস্তার ধারে ধারে হিন্দুদের দোতলা পাকা দালান, ঠিক পেছনের গলিতেই মুসলমানদের মাটকোঠা। দেবদত্তের ভাষায়, রাস্তায় বাস মধ্যবিত্তের আর গলিতে বাস নিম্নবিত্তের।

'দেবদত্ত!' বলে চৌরাস্তার বঁাদিক থেকে কেউ ডাকল। না নেমে মাটিতে পা ঠেকিয়ে দেবদত্ত সাইকেলটা দঁাড় করাল।

'সামনে এগিয়ো না, একটা লাশ পড়ে আছে।' বলতে বলতে লাঠি হাতে বেঁটে খাটো একটা লোক এগিয়ে এল।

'কোথায়?'

'চৌরাস্তা পেরিয়ে ঢালের ওপর।'

'কে, জানো?

'মুসলমানই হবে! তাছাড়া আর কে হবে। তুমি এ সময় কোথায় চললে?'

'পার্টি আপিসে যাচ্ছি। কাজ আছে।'

বেঁটে লোকটা ঝঁাঝালো গলায় বলল, 'ঐদিকের কবরখানায় এক হিন্দুর লাশ পড়ে আছে। তুমি তো খুব মুসলমানদের হয়ে কথা বলো। তুমি এবার গিয়ে ওদের বলো, ওরা আমাদের লাশ দিয়ে গিয়ে নিজেদের লাশটা নিয়ে যাক।'

ডান হাতে ওপরের গাড়িবারান্দা থেকে একজন বলে উঠল, 'খবর্দার। যেয়ো না। ওরা তোমার লাশ ফেলে দেবে।'

'ও মুসলমানদের গায়ে গা দিয়ে থাকে, ওকে ওরা কিছু বলবে না।'

'হিন্দু তো বটে!' গাড়িবারান্দা থেকে আওয়াজ এল।

গোড়ায় যারা ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচত, তারা এখন বুক ঠুকে সামনে এসে গিয়েছে।

তারা বলল, 'গিয়ে ওদের বলে দাও—আমাদের একজন মারলে আমরা ওদের তিনজনকে মেরে শেষ করব।'

লোকটা সম্ভবত মরেনি, ধুঁকছিল। ঢালের ওপর ওর শরীরটা নিচের দিকে কিছুটা সরে এসেছিল। লোকটার দাড়ি ছিল। গোড়ায় দাড়িটা ধরে মনে হয় টানাটানি হয়েছিল। এখন রক্তের মতো লাল। খাকি কোটের ওপরে নিরেস বোতাম লাগানো, যা সবচেয়ে সস্তা—এক পয়সায় আটটা করে পাওয়া যায়। জুতোর ফিতে খোলা ছিল। বোঝা যায়, জ্ঞান বেরনোর আগেভাগেই সে নিজেই খুলে দিয়েছিল। দেখে মনে হয় কাশ্মীরী। দেবদত্ত ঘুরে রাস্তার দিকে দেখছিল। রাস্তার শেষ প্রান্তে একদল লোক দাঁড়িয়ে ওকে ঠায় দেখছে। দ্বিতীয়বার লাশটা দেখে দেবদত্ত চিনতে পারল। লোকটা কাশ্মীরী তো বটেই, কাজ করত ফতেহচাঁদের আড়তে। বাড়ি বাড়ি কয়লা আর কাঠ পেঁছে দেওয়া ছিল তার কাজ। ফতেহচাঁদের আড়ত সেখান থেকে বেশিদূর নয়।

দেবদত্ত নাক রগড়ে ঘাড় কাত করল। লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা, কিংবা তার লাশ স্বস্থানে পেঁছে দেওয়ার এটা সময় নয়। হিন্দুর লাশ দেখে আসারও তার সময় নেই। এখন তাকে পার্টি আপিসে পেঁছুতেই হবে।

পার্টি আপিস ঝান্ডাসর্বস্ব হয়ে পড়ে আছে। সবশুদ্ধ তিনটি লোক বসে রয়েছে। কমিউনে মোট আটজন লোক। পাঁচজন গিয়েছিল ডিউটিতে। একটা খারাপ খবরও ছিল। একজন মুসলমান কমরেডের বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ায় সে কমিউন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নিজের কথা বলতে বলতে তার ঠোঁট কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে আর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে।

'ইংরেজের শয়তানি! ইংরেজের শয়তানি! এরমধ্যে ইংরেজ আসছে কোথা থেকে। মসজিদের সামনে শুয়োর ফেলছে, আমার চোখের সামনে তিনজন গরিব মুসলমানকে কেটে ফেলল। ছাড়ো ওসব বাজে কথা।' দেবদত্ত সেই ক্ষুব্ধ কমরেডকে শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল, 'মাথা গরম করে কোনো কাজ করে বোসো না, কমরেড! আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, পুরনো সংস্কার আমাদের মধ্যে গিজগিজ করছে। যদি মজুর হতে তাহলে হিন্দু-মুসলমানের এই প্রশ্ন নিয়ে এমন স্বেরবার হতে না।' এ সত্ত্বেও সেই কমরেড বোঁচকা বাঁচকি উঠিয়ে কমিউন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'কমরেডের রাজনৈতিক ভিত খুব কাঁচা। আবেগের জোয়ারে ভেসে গিয়ে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। তার জন্যে সমাজবিকাশের ধারা বোঝা নিতান্ত দরকার।'

মিটিং শুরু হল। প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল, শহরের পরিস্থিতি। এক্ষেত্রেও মজুরদের বস্তি সম্বন্ধে আলোচনা সবচেয়ে বেশি জরুরী ছিল।

'রত্তার গন্ডগোলের খবরটা ঠিক নয়। কোনো মজুরবস্তিতে এখনও কোনো গোলমাল বাধেনি। তবে হ্যাঁ, উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। কমরেড জগদীশ মুসলমান মজুরদের বস্তিতে বসে আছে, লোকে এখনও তার কথা শুনে চলেছে। ওখানে বিশ ঘর শিখ মজুর থাকে। সেখানে একটাও কোনো দুঃখজনক ঘটনা এখনও ঘটেনি। কিন্তু কমরেড জগদীশ খবর পাঠিয়েছে যে, অবস্থা তেমন ভালো নয়।

দুজন মজুরের মধ্যে খুব খিস্তি খাস্তা হতে দেখে বাইরে থেকে আসা গুজবে কেউ কেউ কান দিতে আরম্ভ করল।'

ঠিক হল, কুরবানআলীকেও রস্তায় পাঠানো হোক্, যাতে কমরেড জগদীশ একা পড়ে না যায়। দেবদত্ত এই সিদ্ধান্ত কাগজে লিখে নিল।

দারা গ্রামে চলে গিয়েছে। তার কোনো খবর নেই। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। কেবল একটা মোটরগাড়ি, গাঢ় নীল রঙের গাড়ি গাঁয়ে গাঁয়ে যেতে দেখা গেছে। কার গাড়ি, কেন গিয়েছে, কী বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই। কেউ কেউ বলছে গাড়িটা শাহনওয়াজের।

মিটিং অনেকক্ষণ চলল, তিনজন কমরেড অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করল। কাগজে পেনসিল দিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোর পাশে টিক মারা হচ্ছিল। এরপর এল অন্তিম বিষয়: 'পার্টি'র সকল প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা ডাকতে হবে।'

একজন কমরেড বলল 'সে মিটিং হতে পারবে না। কংগ্রেস আপিসে তালা ঝুলছে। লীগওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ওরা পাকিস্তানের আওয়াজ তুলছে। তুমি যাই বলতে যাও ওদের এক কথা—আগে কংগ্রেসওয়ালারা মেনে নিক যে, কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন। তবেই ওদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারি। তাছাড়া এ-সময় তো কেউ নিজের পাড়া ছেড়ে বেরচ্ছেই না, মিটিং কাকে নিয়ে করবে?' নাক টেনে নিয়ে দেবদত্ত আগের মত বদল করে। 'দশজন করে প্রতিনিধি ডাকার কথা বাদ যাক। বাছা বাছা নেতাদের যেমন করে হোক একজায়গায় আনতে হবে। তাদের সঙ্গে আরও কিছু লোক এসে যাবে।'

অন্য একজন কমরেড বলল, 'ছাই আসবে, কমরেড। আর যদি আসেও কেবল তুইথুলি মুইথুলি হবে, ফল কিছুই দাঁড়াবে না।'

'কমরেড, ওদের একসঙ্গে বসাতে পারলেও লোকের মধ্যে তার একটা ভালো প্রভাব পড়বে। তবেই আমরা ওদের নাম করে শহরে শান্তিরক্ষার আবেদন জানাতে পারব। পাড়ায় পাড়ায় ঢোল সহরত করতে পারব। এখন কী হচ্ছে? এখন প্রকাশ্যে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে না, কিন্তু একটা দুটো লোক হাতের কাছে পেলেই মেরে দিচ্ছে। ওদের আপস আলোচনায় বসাতেই হবে…।'

আরও কয়েকটা দিক নিয়ে কথা হল। মিটিং কোথায় ডাকা যায়? ঠিক হল হায়াতবক্সের বাড়িতে হবে। 'আমি বক্সীজীকে নিয়ে আসব। মুসলমান পাড়ায় পৌঁছে কমরেড আজীজ পাড়ার দুতিনজন মুসলমান শহরবাসীকে নিয়ে আসবে। তারপর সবাই মিলে আমরা হায়াতবক্সের বাড়িতে গিয়ে বসব।'

'হায়াতবক্সকে বলেছ?'

'এখুনি গিয়ে বলব।'

'কমরেড, তুমি কোন্ জগতে বাস কর। তুমি হায়াতবক্সের বাড়িতে যাবে? ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে দেবে তোমায়?'

দেবদত্ত হেসে আজীজকে বলল, 'কেন, তুমি সঙ্গে থাকবে।'

'তোমার এই জলের ছিটেতে, কমরেড, এ আগুন নিভবে না।'

কিন্তু মিটিঙের পর দেবদত্ত আর আজীজ এ-গলি সে-গলি করে লুকিয়ে চুরিয়ে, কোথাও গালাগালি খেয়ে, কোথাও ধমকানি শুনে কোনোরকমে হায়াতবক্সের বাড়িতে পেঁছিল।

আর সত্যিত সেদিন দুপুরেই হায়াতবক্সের বাড়িতেই মিটিংও হল। বক্সীজীকে নিয়ে এসেছিল দেবদত্ত, অন্য কোনো কংগ্রেসীকে দেবদত্ত বললে সে হয়ত আসত না। দেবদত্তের বিশ্বাস ছিল বক্সীজী আসবেন, কেননা সব মিলিয়ে ষোলটা বছর ওঁর জেলে কেটেছে। ওঁর খুব চৌকস বুদ্ধি না থাকলেও, রাজনৈতিক জট ছাড়াতে অপারগ হলেও, উনি খুনখারাপি হোক চান না। গতকাল সবার সঙ্গে উনি রেগে রেগে কথা বলেছিলেন, কারণ উনি খুব ক্ষেপে ছিলেন। খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন অবস্থা তাঁর হাতের বাইরে চলে যাওয়ায়। দেবদত্তের সঙ্গে আসতে আসতে সারা কমিউনিস্টদের উনি গালাগালি করেছেন। তবু উনি এসেছিলেন আর সেইসঙ্গে আরও দুজন তরুণ কংগ্রেসীকে নিযে এসেছিলেন। মিটিং হল। মিটিঙে তুইথুলি মুইথুলিও হল! আর ঝাড়া আধঘণ্টা হায়াতবক্স জেদ ধরে রইলেন যে, বক্সীকে কবুল করতে হবে যে, বক্সী হিন্দুদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন এবং কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন। তখন দেবদত্ত বলল—দেখুন, এটা সে আলোচনার জায়গা নয়। বাইরে লোকে মারা পড়ছে, বাড়িঘর জ্বলছে, শুনেছি এ আগুন গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময় কী আমাদের কর্তব্য, আমি ব্যগ্রতা করে বলছি, আসুন আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর সময়ের কথা মনে রেখে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়তে না দিই।' এই বলে দেবদত্ত শান্তির আবেদনটি পড়ে শোনাল। আবার তর্ক বাঁধল। কংগ্রেস আর লীগের পক্ষ থেকে এটা হতে পারবে না। হায়াতবক্স আর বক্সীর নামে হতে পারে। না, এতে আরও অন্যদের সঙ্গে রাখা হোক...।

কিন্তু লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হায়াতবক্সের ছেলে ওর বাবার কানে কানে বলল এই আবেদনে সই করলে কিছু আসবে যাবে না। এটা তো শান্তির আবেদন, এতে সই করে দিন। বক্সীও সই করলেন। এরপর পাকিস্তান জিন্দাবাদের আওয়াজ উঠল। তার মাঝখানে বক্সীজী সবে জুতো পরেছেন, এমন সময় খবর এল যে রস্তায় মজুর বস্তিতেও হাঙ্গামা হযেছে। দুজন শিখ ছুতোরমিস্ত্রি খুন হয়েছে...। গোড়ায় তো দেবদত্ত খবরটা মিথ্যে বলে উড়িয়েই দিয়েছিল, মানতেই চায় না। 'ওখানে দাঙ্গা হতে আপনি দেখেছেন? নিজের চোখে? এ খবর কে দিল?' শেষ পর্যন্ত একই কথার সে পুনরাবৃত্তি করলেও, তার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। ওর মনে হল, মজুররাই যদি নিজেদের মধ্যে লড়ে, তবে বুঝতে হবে বিষ অনেক ভেতর অবধি চলে গেছে, সেক্ষেত্রে এই মিটিংকে জলে আঁক কাটা বলেই ধরে নিতে হবে।

এইসময় মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে, পার্টি আপিস থেকে সাইকেল নিয়ে সে সোজা রস্তায় চলে যাবে, যে করে হোক রস্তায় পেঁছিবে। ব্যাপারটা একা কমরেড

জগদীশের হাতে আর নেই। আমি গিয়ে পৌঁছুলে হয়ত অবস্থার মোড় ফিরবে, মজুররা নিজেদের মধ্যে আর লড়বে না।

এদিকে যো-সো করে দেবদত্ত আপিসে পৌঁছে দেখে ওর বাবা আগে থেকেই ওখানে বসে আছেন। ওঁর হাতে ছড়ি। দেবদত্ত অবস্থার মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে বলল দাঙ্গা রুখবার চেষ্টা হয়ে চলেছে। বলে যেই সে সাইকেল বার করতে গেছে অমনি রাগে ফেটে পড়ে বললেন, 'ব্যাটা নচ্ছার! কেউ যদি তোকে মারে তো লাশ টানবারও লোক পাওয়া যাবে না। তুই দেখতে পাচ্ছিস না, জল কোথায় গড়াচ্ছে, হারামজাদা! তুই একা হাতে দাঙ্গা রুখতে যাচ্ছিস...' বলে উনি গলির খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। ছেলেকে ওঁর খুনে দিতে ইচ্ছে করছিল। মারবেন বলে ছড়ি উঠিয়েও উনি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন: 'কেন আমাদের এভাবে কাঁদাচ্ছিস, তুই আমাদের একমাত্র ছেলে। একটু বুঝেশুনে চল বেআক্কিলে হোস নে। তোর মার কী দশা হচ্ছে একবার ভেবে দ্যাখ। ব্যগ্রতা করছি, তুই ঘরে চল।'

দেবদত্ত নাক মলল, হাত ডলল। ও বেশ ফাঁপরে পড়ে যাচ্ছে, ওর হয়ে একজন সালিশের দরকার। বাবাকে বাড়িতে পৌঁছুতে হবে।

তারপর বলল, 'আমাকে রাস্তায় যেতে হবে। আমি আর দেরি করতে পারব না। তবে আমি আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কমরেড রামনাথ আপনাকে নিয়ে যাবে।'

সেদিন দুপুরে আরও একটি মৃত্যু হল। মারা গেল জার্নাইল। গোড়া থেকেই তো ও ছিটগ্রস্ত ছিল। ছড়ি বগলদাবা করে, ঘাস-বিচালি-ঘাস করতে করতে ও বেরিয়ে পড়েছিল দাঙ্গা রুখতে। ওর যে মনে কী হত সে খোঁজ কেউ রাখত না। ও নিশ্চয় আবেগে টগবগ করত, ওর নিশ্চয় পা নিস্পিস্ করত, আর হয়ত ওর মাথার পোকাগুলো নড়ে উঠত। শহরে দাঙ্গা হচ্ছে, এটা মোটেই ভাল কথা নয় আর কংগ্রেসের যতসব বেইমান কিনা ঘরে বসে আছে।

জার্নাইল বেরিয়ে গিয়ে যেখানে সেখানে রাস্তার ধারে, হয় এ-চত্বরে নয়, ও-চত্বরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লেকচার দিয়ে বেড়াতে লাগল:

'ভদ্রমহোদয়েরা, আমার কাছ থেকে শুনুন, ইরাবতী নদীর তীরে শ্রীজওহরলাল নেহেরুজী পূর্ণ স্বরাজের শপথ নিয়েছিলেন, আর সেই ইরাবতীর তীরে নৃত্য করেছিলেন, আমিও নেচেছিলাম আর আমরা সবাই শপথ করেছিলাম। আর আজ যারা ঘরে সেঁধিয়ে বসে আছে তারা সব বেইমান, আমি তাদের প্রত্যেককে চিনি। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এঁরা কী করছেন ঘরে বসে? এঁদের উচিৎ ঘোমটা টেনে ঘরে বসে থাকা। এঁরা করছেন নেই-কাজ-তো-খই-ভাজ। ভদ্রমহোদয়েরা, গান্ধীজী বলেছেন হিন্দু-মুসলমানেরা ভাই ভাই। নিজেদের মধ্যে তাদের লড়াই করা উচিত নয়। আমি আবালবৃদ্ধবণিতা, আপনাদের সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করা বন্ধ করুন। এতে দেশের ক্ষতি হবে।

ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছে···'।

এক চত্বর থেকে আরেক চত্বর। গলির পর গলি, রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে জার্নাইল কমিটি-মহল্লায় গিয়ে পেঁাছুল। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ওর বক্তৃতার সময় কিছু গেঁায়ারগোবিন্দ প্রকৃতির লোক এসে দাঁড়িয়ে ছিল। জার্নাইলের হুঁশ ছিল না সেটা কোন্ জায়গা, কাদের এলাকা।

'ভদ্রমহোদয়েরা, আমি আপনাদের বলছি হিন্দুমুসলমান একে অন্যের ভাই। শহরে হাঙ্গামা হচ্ছে, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কেউ তা প্রতিরোধ করছে না। ডেপুটি কমিশনার সাহেব তার মেমসাহেবের গলা জড়িয়ে বসে আছে। আমার কাছে শুনুন, ইংরেজ আমাদের দুশমন। গান্ধীজী বলছেন, ওরাই আমাদের মধ্যে লড়াই বাধাচ্ছে। আমাদের তো ভাই ভাই সম্পর্ক। গান্ধীজী বলে দিয়েছেন, আমাকে পুঁতে ফেললে তার ওপর পাকিস্তান হবে। আমি বলছি, আমার লাশের ওপর দিয়ে ছাড়া পাকিস্তানের রথ যেতে পারবে না। আমরা ভাই ভাই। আমরা এক হয়ে থাকব···।'

'তেরি মা কী···' আশপাশের লোকের ভিড় থেকে একজন এই কথা বলে সজোরে লাঠির একটা ঘায় জার্নাইলের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। কোথায় গেল ছড়ি, কোথায় গেল উলিডুলি মুগার পাগড়ি। কোথায় গেল ছেঁড়া চটি! ওর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। আর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই জার্নাইল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বারো

'একজন চিলে-ছাদে পাহারায় থাক।' রণবীর ঘরে দাঁড়িয়ে বলল। মুর্গি ঘেটে দীক্ষা নেবার পর থেকে ওর মনের জোর বেড়ে গেছে। ও ছিল দলের সবচেয়ে চতুর, সবচেয়ে আটপিঠে, সবচেয়ে কর্মিতকর্মা সদস্য। ওর গলার স্বরেও একটা বাজখাঁই ভাব এসে গিয়েছিল।

লাঠি, কুড়ুল, ছুরি, তীরধনুক আর বাঁটুল—এত সত্ত্বেও 'অস্ত্রাগার' ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। ঘরের বাইরে সিঁড়ির কাছাকাছি চুলোর ওপর তেলের কড়াই চাপানো ছিল। কিন্তু কাঠ কম পড়ার দরুন তেল ফোটানোর মতলব কালকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

'জী আজ্ঞে, সরদার!' বলে শম্ভু চিলে-ছাদে চলে গেল।

চার বীরপুরুষের হাত নিস্পিস্ নিস্পিস্ করছিল। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার, নিজেদের বাহুবলের পরিচয় দেওয়ার সময় এসে গেছে। খাড়াইয়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিচে হলদিঘাটের রাস্তায় যবনদের আগমনের অপেক্ষায় থাকতে

ম্লেচ্ছদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এসে গেছে।

আকারে ছোট বলে রণবীর শিবাজীর ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে নিত। দুটো হাত বুকের কাছে সাপটে ধরে সে আড়চোখে রাস্তা আর রাস্তার আশপাশগুলো খুঁটিয়ে নজর করছিল। কখনও কখনও ওর লোভ হচ্ছিল—ইস্, কোমরে যদি তলোয়ার, চওড়া কোমরবন্ধ, গায়ে আংরাখা, মাথায় হলুদরঙের পাগড়ি আর তার ওপর যদি শিরস্ত্রাণ থাকত! ঢোল্লা পাজামা পরে এত বড় সংগ্রামে অংশ নেওয়াটা তার কাছে খুব বেখাপ্পা বলে মনে হচ্ছিল। পাজামা, সাদাসিধে কামিজ আর পায়ে ছেঁড়া চটি—এটা সৈনিকের কোনো পোশাকই নয়। বেশভূষার কর্তৃত্বের অভাবটুকু রণবীর কড়া হুকুম দেওয়া তার বাজখাঁই গলার আওয়াজ দিয়ে পূরণ করে নিয়েছিল। মিলিটারির কমান্ডারের ঢঙে রণবীর আদেশ দিচ্ছিল এবং কারো পান থেকে চুণ খসা সে বরদাস্ত করছিল না। পেছনে দুটো হাত বেঁধে একটু ঝুঁকে পড়ে গভীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সেইভাবে সে 'অস্ত্রাগারে'র ওপর টহল দিয়ে ফিরছিল, যেভাবে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধের আগে শিবাজী পায়চারি করতেন।

'সরদার!'

রণবীর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল। মনোহর দাঁড়িয়ে। একটু আগে ও গুলতি-গুলোর আশেপাশে বস্তাবন্দী পাথরকুঁচি সাজিয়ে রাখছিল।

'কাঠ কম পড়ে গেছে। তেল ফোটানো সম্ভব নয়।'

'কয়লাও কি নেই?'

'না নেই, সরদার।'

রণবীর পিঠের পেছনে হাত রেখে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। রণনীতিতে এটাই বলে যে, সিদ্ধান্ত নিতে যেন এতটুকু দেরি না হয়। অবস্থা ঠিক কী তা ধরতে হবে, গভীরভাবে তলিয়ে বুঝতে হবে আর চটপট সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এ গুণ না থাকলে নেতা হওয়া যায় না।

'নিজের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসো। কাঠ হোক, কয়লা হোক, যা পাবে। যতটা পাবে উঠিয়ে নিয়ে এসো। এ কাজে একটুও দেরি করলে চলবে না।'

মনোহর থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল?'

'কিন্তু মা যদি না আনতে দেন?'

শুনে রণবীর 'অস্ত্রাগারে'র মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মনোহরের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলল, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছ? যাও, যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো।'

'জী আজ্ঞা, সরদার!' বলে মনোহর পিছিয়ে গেল।

'আচ্ছা, থাক এখন। এ সময়ে না গেলেও চলবে।' তক্ষুণি তেল জ্বাল দেওয়ার প্রস্তাবটা স্থগিত হয়ে গেল।

'অস্ত্রাগার'টা খোলা হয়েছিল একটা দোতলা বাড়ির ওপরকার একটা খালি পড়ে থাকা ঘরে। নিচের তলায় থাকে শম্ভুর বুড়ো দাদু-দিদিমা। দোতলার চিলে-ছাদের মুখ রাস্তার দিকে। রাস্তার ধারে একটা অশত্থ গাছ থাকায় তার আড়ালে ছাদের অনেকখানি ঢাকা পড়ে থাকত। বাড়ির ভেতরে যেতে হয় একটা গলিতে ঢুকে। গলিটা অশত্থগাছের সামনে থেকে সোজা বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। শম্ভু এই বাড়িটির অবস্থান বোঝানোর সময় রণবীরকে 'চক্রব্যূহে'র সংজ্ঞার কথা বলেছিল। সেইসঙ্গে এও বলেছিল যে, দলকে সরগরম করবার পক্ষে এটা হবে সেরা জায়গা। গলিটা কিছুদূর গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছিল। মোড়ের মাথায় ছিল এক পীরের ভাঙাচোরা মাজার। মাজারের সামনে দুই বিবি নিয়ে থাকত এক বুড়ো মুসলমান। আরেকটু এগোলে রাস্তার জলের কল। দুপুরে তাতে জল থাকত না। বেলা চারটে অবধি কলতলায় জনপ্রাণী দেখা যেত না। জলকল পেরিয়ে সবাই ছিল হিন্দু বাসিন্দা। শুধু দুতিনটে মাটকোঠায় কিছু মুসলমান থাকে। একটাতে থাকে মামুদ ধোবী, আরেকটাতে রহমান হমামওয়ালা। এ বাদেও আশপাশ থেকে আরও অনেক গলি বেরিয়েছে। ম্লেচ্ছদের ওপর হামলা করতে হলে ঐ জলের কল আর গলির শেষ প্রান্ত—এর মধ্যের জায়গাটুকু থেকেই করতে হবে। বিপদ দেখলে কোনো না কোনো হিন্দুবাড়ির দেউড়িতে ঢুকে পড়তে পারা যাবে।

'গলির ভেতরে থাকা ম্লেচ্ছদের তুমি চেনো জানো?'

শম্ভুকে রণবীর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ জানি, সরদার। মামুদ ধোবী আমাদের বাড়ির কাপড় কাচে। আর পীরের দরগার সামনে যে মিঞাজী থাকেন, তাঁর সঙ্গে আমার দাদার খুব দহরম মহরম।'

'এ গলিতে তুমি কাজ করবে না।' রণবীর নির্দেশ দেওয়ার স্বরে বলল। শম্ভু খুব দমে গেল।

আজ ছিল ওদের প্রথম শিকারে থাবা বসানোর দিন। চার বীরপুরুষই উত্তেজনায় টান টান হয়ে ছিল। এতদিন শুধু তোড়জোড় চলেছে। শৌর্যবীর্য দেখানোর সময় হয়েছে আজ। 'আজ রণ যে জাকে ধুম মচ দে বেটা!' (আজ লড়াইতে নেমে তুমুলকাণ্ড কর, বাছা!) ধর্মদেবের কানে বীররসের এই গানের কলি বহুক্ষণ গুন্ গুন্ করে বাজছে। মনোহর একটু চিন্তায় ছিল। মাকে কিছু না বলেই ও চলে এসেছিল। এখন দুটো বাজতে চলেছে। মনোহরের ভয় ওর মা উনুন নিভিয়ে ওকে না খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে থাকেন। আর কে জানে শেষে খুঁজতে খুঁজতে সটান এখানে এসে না হাজির হন!

রণবীর অন্য তিন যোদ্ধাকে 'অস্ত্রাগারে' ডেকে নিয়ে এসে রণনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলল, 'দুশমনদের গায়ে ফুটন্ত তেল ঢালার সময় এখনও আসে নি। তেল ঢালার সময় আসে তখনই, শত্রু যখন সটান তোমার দুর্গে এসে চড়াও হয়েছে।

যখন অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আর উপায় নেই।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'আমরা এখানে ব্যবহার করব কেবল স্প্রিং দেওয়া ছোরা।'

এরপর ইন্দ্রকে ডেকে রণবীর বলল, 'আবার একবার পাঁয়তারা করে দেখাও। খাপ থেকে ছোরা ওঠাও।'

ইন্দ্র বিদ্যুৎগতিতে ছোরা তুলে নিল। ঘরের মাঝখানে দু-পা ফাঁক করে মুহূর্তকাল দাঁড়াল। ছোরার বাঁট ওর ডান হাতে ধরা। ফলার মুখ পেছন দিকে ফেরানো। এরপর বাঁ পা তুলে তুড়ি লাফ মেরে শূন্যে আধ চক্কর ঘুরে, তারপর আবার দু পা ছড়িয়ে দিয়ে রণবীরের পেছনের দিকে মুখ করে মেঝের ওপর নেমে এল। এরই ফাঁকে সে রণবীরের কোমর নিশানা করে ছোরার উল্টোপিঠ দিয়ে মারবার ইঙ্গিত করে দেখাল।

রণবীর ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বলল, 'শত্রুর বুক কিংবা পিঠ কক্ষনো নিশানা করবে না। সব সময় নিশানা করবে কোমর বা পেট। আর তারপর ঘুরে এসে ছোরা ঢুকিয়ে দেবার পর ভেতরে থাকতেই একটু মোচড় দেবে। তাতে ভেতরের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। যদি তুমি ভিড়ের মধ্যে শত্রুকে ছোরা মারো তাহলে ছোরা টেনে বার করার চেষ্টা করবে না। বেঁধানো অবস্থায় ছোরাটা রেখে দিয়েই ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেবে।'

রণবীর যা বলছিল, তার সবটাই দেবব্রতর মুখ থেকে শোনা।

কিছুক্ষণ বাদে ওদের দল দুভাগে ভাগ হল। প্রথম হামলা করা হবে ইন্দ্রকে দিয়ে। সে জন্যে ইন্দ্র, শম্ভু আর সর্দার রণবীর 'অস্ত্রাগার' ছেড়ে দেউড়িতে এসে গেল। মনোহর ওপরে প্রস্তুত হয়ে রইল। সিদ্ধান্ত হল, রাস্তার দিকের ছাদে দাঁড়িয়ে থেকে মনোহর পাহারায় থাকবে আর গলিতে যাতায়াত করা লোকদের ওপর নজর রাখবে রণবীর, ইন্দ্র আর শম্ভু। রণবীর হুকুম দিলেই ইন্দ্র দেউড়ি থেকে বেরিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গলির দিকের দরজাটা একটু খুললে রাস্তার খানিকটা নজরে আসে। অশথ গাছের একটু পরেই রাস্তার সেই অংশ, যা দুপুরের রোদে চকমক করে।

গলির সামনে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। রণবীর দরজাটা প্রায় বন্ধ করে সরু একটু ফাঁক দিয়ে বাইরে চোখ রাখল।

'কে এল' ? ইন্দ্র ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

রণবীর চুপ করে রইল। দলের অন্য দুজন এগিয়ে এসে দরজার পাশে চোখ রাখল।

'জালাল খাঁ। নবাবজাদা জালাল খাঁ'। শম্ভু বলল, 'এই রাস্তার ধারে সামনের বাড়িতে থাকেন। এ পাড়ার সবচেয়ে গণ্যমান্য লোক। ডি-সির সঙ্গে ওঁর খাতির আছে'। শম্ভু এক নিশ্বাসে বলে গেল।

দরজার ফাঁক দিয়ে জালাল খাঁর পাগড়ির তাক, তা-দেওয়া গোঁফ আর লাল টকটকে চেহারা এক পলক দেখা গেল। কিন্তু ওঁর প্রবেশ ও প্রস্থান চকিতে ঘটে গেল। ওঁর সালোয়ারের খসখস আওয়াজ আর জুতোর মসমস শব্দটুকু যা গলির

ভেতর থেকে শোনা গেল। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারার আগেই জালাল খাঁ বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। তিন বীরপুরুষ ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জালাল খাঁ আকৃতিতে এদের চেয়েও ঢের লম্বা। ওঁকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে ওরা কেমন একটু ভড়কে গেল। কিছু ভাববারও সময় পেল না।

মাস্টারজী বলেছিলেন শত্রুর দিকে কখনো ভালো করে তাকাবে না। তাকালে হাত না কেঁপে পারবে না। যেকোনো প্রাণীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে তার প্রতি তোমার মায়্যার ভাব জাগবে, কক্ষনো এটা করবে না।

পেছনের গলিতে কেউ দরজা খুলেই ঝট করে বন্ধ করে দিল। তিনটি ছোকরারই কান খাড়া হয়ে উঠল। রণবীর দরজার পর্দাটা এমনভাবে খুলে দিল যাতে তার মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে গলির আরো খানিকটা নজরে পড়ে।

'কে যায় ?' ইন্দ্র ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

রণবীর বলল, 'একজন ম্লেচ্ছ।'

দুই বন্ধু দরজার ফাঁকের ওপর নিচের চোখ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোক গলি দিয়ে রাস্তার দিকে আসছিল। শম্ভু তাকে চিনতে পেরে বলল, 'মিঞাজী। পীরের দরগার সামনের বাড়িতে থাকেন, এখন উনি মসজিদে নমাজ পড়তে যাচ্ছেন। এই সময় নমাজ পড়তে যান।'

'চুপ !'

মিঞাজী গলির কিছুটা অংশ পেরিয়ে অশথ গাছের কাছে এসে বাঁ দিকে ঘুরে গেলেন। মিঞাজীর গায়ে কালো রঙের ফতুয়া, পরনে সালোয়ার পায়ে ঢলঢলে চপ্পল। তাঁর ডান হাতে লটকানো ছোট মতন তস্‌বী। বুড়ো হওয়ার দরুন ওঁর পিঠ কুঁজো আর চলেনও আস্তে আস্তে।

'যাবো ?' ইন্দ্র ঝট করে রণবীরকে জিজ্ঞেস করল।

'না, এতক্ষণে ও রাস্তায় পোঁছে গেছে।'

'তো কী হয়েছে ?'

'না। রাস্তার ওপরে হামলা চলবে না। বারণ আছে।'

শম্ভু ইন্দ্রের গলার স্বরে একটু বিচলিত ভাব লক্ষ্য করল। শম্ভুর নিজের মনও খানিকটা এলিয়ে পড়ছিল। ইন্দ্রের প্রশ্ন শুনে মনে একটা অদ্ভুত ধাক্কা খেল। রণবীরের নিষেধাজ্ঞা শুনে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিছুক্ষণ পর ওরা ফের দরজার আড়োলে এসে দাঁড়াল। সময় বয়ে যাচ্ছিল। চারটে বাজলেই কলে জল আসবে। গলির মেয়েরা ঘড়া নিয়ে ভিড় করে আসবে জল নিতে। দুপুর পেরোলেই একজন দুজন করে আরো লোক বাইরে বেরিয়ে আসবে।

এর মধ্যে দুজন লোক একে একে গলিতে এসে গেল। একজনের হাতে সাইকেল, চোখে চশমা।

'ইনি বাবু চুনীলাল। কোনো এক দপ্তরে কাজ করেন। এঁর কুকুর আছে।'

অন্য যে লোকটি গলিতে এল, সে একজন শিখ সর্দারজী। তার কাঁধে ছিল

একটা বস্তা।

দুজনেই এককেবার এসে জুতো ফটফট করতে করতে গলি পেরিয়ে চলে গেল।

ঠিক সেই সময় ছেলের দল আর কারো পায়ের আওয়াজ পেল। ইন্দ্র দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে রণবীরকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিল।

'কে ?'

ইন্দ্র কিছু না বলে বাইরে দেখতে লাগল।

চটাস-পটাস করে জুতোর আওয়াজ আসছে। রণবীর ঝট করে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। শম্ভুও এসে দরজায় সেঁটে দাঁড়াল।

'কে ?'

ইন্দ্র ফিসফিসিয়ে বলল, 'কোনো ঝাঁকাওয়ালা।'

'না, ও লোকটা সেন্ট-আতর বিক্রি করে। দূরের কোনো জায়গা থেকে আসে। রোজ এই সময় এই দিক দিয়ে যায়। লোকটা ম্লেচ্ছ।'

গাবদা-গোবদা চেহারা, মেহেদিতে রাঙানো লাল গোঁফ, থুতনিতে ছাগল-দাড়ি, দু বগলে বিস্তর থলি লটকানো। অশত্থ গাছের নিচে দিয়ে এসে সে গলির ভেতর ঢুকলো। বোঝার ভারে তার মাথা থেকে ঘামের ফোঁটা ঝরে ঝরে পড়ছিল। তার ডান কানে তুলোর থুপি আর তার ওপর পাগড়িতে গোঁজা দুতিনটে লোহার শলা।

রণবীরের মনে হল, ওর পিঠের পেছনে একটা কিছু নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। রণবীর ঝট করে পেছনে ফিরল, দেখল ইন্দ্রের হাত তার পকেটের ভেতর প্যাঁচওয়ালা ছোরার দিকে চলে গেছে।

সুবর্ণসুযোগ পেরিয়ে যাচ্ছে! অপরিচিত, ঘাড়ে থলির বোঝা, ছুটে পালাবার ওর ক্ষমতা হবে না, আত্মরক্ষা করতে পারবে না, শ্রান্ত ক্লান্ত। সব গুণ মজুত। কিছু প্রশ্নের জবাব মস্তিষ্কে মেলে না, অন্তঃপ্রেরণা থেকে পাওয়া যায়। শুভক্ষণ পেরিয়ে যাচ্ছে আর লোকটা ক্রমেই গলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রণবীর চোখের ইশারা করতেই ইন্দ্র লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যে চোখ-ধাঁধানো আলো স্তূপাকারে ভেতরে ঢুকল। রণবীর দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরে টুঁ শব্দ নেই। রণবীর আর শম্ভু রুদ্ধ নিশ্বাসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। রণবীর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। ও আর থাকতে না পেরে আস্তে দরজা খুলে বাইরে মাথা বার করে দেখল। আতরওয়ালা গলির মধ্যে খানিকটা দূরে বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। আর ইন্দ্র, বালখিল্য ইন্দ্র, তার কিছুটা দূরত্বে পিছু নিয়ে চলেছে। ইন্দ্রের হাত নিজের জামার পকেটে। সে ডিঙি মেরে মেরে চলেছে। রণবীর না পারছিল দরজায় বাইরে উঁকি দিয়ে থাকতে, না পারছিল দরজা বন্ধ করে আড়ালে এসে দাঁড়াতে। আর সব কিছুকেই সে মুঠোর মধ্যে এনেছিল, কিন্তু তার নিজের বালসুলভ কৌতূহলকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিল না। এই সময় সে শম্ভুকে টান দিয়ে পেছনে

সরিয়ে দিল। শম্ভু ভড়কে গিয়েছিল আর ওর পা দুটো যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। যে দৃশ্যটা রণবীরের শেষ চোখে পড়েছিল তা হল—গাবদা-গোবদা সেই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র চলেছে গলির দু-দুটো মোড় পেরিয়ে।

শম্ভু শিকল টেনে দিল। তারপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজনে এ-ওর দিকে চেয়ে রইল। দুজনেই বিশ্রীভাবে হাঁফাচ্ছে। শম্ভু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। অন্যদিকে রণবীর বাইরে যাবার জন্যে ছটফট করছিল।

গলিটা থেকে মোড় নেবার পরই ছেলেটিকে আতরওয়ালার নজরে পড়েছিল। নিজের জুতোর চটাস-পটাস শব্দের দরুন পেছনের পায়ের আওয়াজ তার কানে যায়নি।

আতরওয়ালা হেসে ফেলল।

'এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছ, বাছা?' বলে আতরওয়ালা মুখ হাসি হাসি করে হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রের মাথায় রাখল।

ইন্দ্র থতমত খেয়ে অপলক চোখে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার অবচেতন মনে এই কথাগুলো ভেসে উঠলঃ এই লোকটার গাল ফুসো-ফুসো। মাস্টারজী একবার বলেছিলেন গাল-ফোলা লোকেরা হয় ভীতুর একশেষ, ওরা পেটের অসুখে ভোগে, ওরা পালিয়ে যেতে পারে না, একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ে। আর এই লোকটা সত্যিই হাঁফাচ্ছিল।

ইন্দ্র তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাল করছিল। সে ম্লেচ্ছের মুখে তার দৃষ্টি বিঁধিয়ে রেখেছিল।

ইন্দ্রকে সে ছেলের মত করে দেখেছিল। কী আর বয়েস, কোমল কিশোর। ছেলেটা বোধ হয় আশ্রয়ের খোঁজে তার পেছন পেছন এসেছে। বোধহয় ভয় পেয়েছে। পাবে না? ভয় তো সবাই পেয়েছে।

'থাকো কোথায়, বাছা? এসো, আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। এখন যা দিনকাল। বাইরে একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়।' কিন্তু ইন্দ্র তার সংকল্প থেকে একচুল নড়বে না। এ সময় ও সেই আতরওয়ালার মুখের দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি করছিল।

'তোলপাড়া পর্যন্ত তোমাকে আমি পেঁছে দেব। আরও যদি যেতে হয় তো তোমাকে আর কারো হাতে ভজিয়ে দেব। আজ শহরে বড় গোলমাল।'

ছেলেটির উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই আতরওয়ালা ঘুরে গিয়ে সামনে পা বাড়াল।

মুহূর্তের জন্যে কী করবে ভেবে না পেয়ে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর আবার সে আতরওয়ালার সঙ্গ নিল। আশপাশের বাড়িগুলো সব নৈঃশব্দ্যে ঢাকা ছিল। সেইসব বাড়ির দোরগোড়ায় এত অন্ধকার যে চোখ বড় বড় করে তাকালেও কিছুই নজরে আসে না।

'আমারও আজ ফেরী করতে বেরনো উচিত হয় নি,' ইন্দ্রকে সে বলল: 'আজ কি ফেরী করার দিন? সারা শহর ধু ধু করছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম

বাড়ি বসেই বা করবো কী, যা দু-চার আনা পাওয়া যায় মন্দ কী, বিক্রি করা যার কাজ ঘরে বসে থাকলে সে খাবে কী,' এই বলে আতরওয়ালা হেসে ফেলল।

জলের কলটা কাছে এসে যাচ্ছিল। কলে জল ছিল না। কলের নিচে যে শিলাপাথরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গিয়েছিল, সেটা শুকিয়ে খটখট করছে। আর তার আশপাশে দুতিনটে বোলতা উড়ছে। কদিন আগেও ইন্দ্র বোলতা ধরে বেড়াত।

'চার থুপি আতরও যদি কেউ আমার কাছ থেকে নিত, তাহলে আমার চার আনার রেড়ির তেল হয়ে যেত।' আতরওয়ালা যেন নিজেকে নিজে বলতে বলতে যাচ্ছে। ও চাইছিল কথা বলে সময় কাটাতে। শহরের জনশূন্য গলি দিয়ে যেতে যেতে বোধহয় ওর নিজের মনেই ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

'সব গলি আমার চেনা। গলির কোন্ কোন্ লোক আতর কেনে আমি সব জানি। যার দুই বিবি আছে সে নিশ্চয়ই আতর কিনবে। তারা সুগন্ধিও নেবে, সুর্মাও নেবে। আবার সেই বেশি-বয়সের লোকদেরও আতর কিনতে হয় যাদের রয়েছে ছুকরী বউ। শুনবে? আরো বলব?' ছেলেটিকে কথায় কথায় সে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

আতরওয়ালা যাই বলুক, তাতে ভবী ভুলছে না। ইন্দ্র মাটিতে শক্ত করে পা ফেলে চলছে—প্যাঁচওয়ালা চাবুটা মুঠোয় শক্ত করে ধরে। মনে ওর একটাই চিন্তা, আতরওয়ালার কোমরের দিকে ঠায় ওর দৃষ্টি। যে একাগ্র দৃষ্টিতে অর্জুন গাছের ওপর বসে থাকা পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি। আতরওয়ালার বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলন্ত থলিটা পেন্ডুলামের মতো ওর কোমরের কাছে দুলছে। বোতলের থলির নিচে তার মোটা কাপড়ের কুর্তা কিছুটা কিছুটা উঠে ছিল।

জলের কলটা পেরোতেই ইন্দ্রের সমস্ত চেতনা হাতে এসে ঠাঁই নিল। তারপর থেকেই তার মাথায় বিঘৎ হয়ে দাঁড়াল দূরত্বের মাপকাঠি। বোতলের থলিটা ঝুলে পড়েছিল, কোমর বার বার সামনে এসে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে তার চটি থেকে চটাস্ চটাস্ শব্দ উঠছিল।

'বাজারের থুপিই বেশি চলে, বাড়িতে বাড়িতে নেয় আতরের শিশি আর তেল।' আতরওয়ালা বলে চলেছিল। হঠাৎ ইন্দ্র লাফ দিয়ে উঠে এক পাঁয়তারা ভাঁজল। আতরওয়ালার মনে হল তার বাঁ হাতে কোনো একটা জিনিস জোরসে ঝটকা দিল। জিনিসটা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। তাতে সে ঘুরে যেই দেখতে গেল কিসের কী ব্যাপার, এমন সময় তার থলির নিচে কিছু একটা ফুটে যাওয়ার অনুভূতি হল। ইন্দ্রের নিশানা হয়েছিল অব্যর্থ। গাঁথবার পর সরদারের আদেশ মতো ছোরাটা একটু মোচড়ও দিয়েছিল। ইন্দ্র এই ভাবেই ফাঁসিয়ে দিতে পেরেছিল লোকটার ভুঁড়ি।

আতরওয়ালা পুরোপুরি ঘাড় ফেরাতে না পারায় দেখতে পায় নি। ছেলেটা তার আগেই পেছনদিকে দৌড় মেরেছে। ও এও বুঝতে পারছিল না যে ঠিক

কী ঘটেছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটাকে চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ঠিক সেই সময় ওর নজরে পড়ল ওর দু পা দিয়ে গল গল করে রক্তের ঢল বইছে। কোমরে কিছু একটা ঢুকে যাওয়ার, কিছু ডুবে যাওয়ার অনুভূতি হল। ব্যথাটা চিন্‌চিন্ করে উঠে তারপর তীব্র ছুরি-চালানোর ব্যথা হয়ে উঠল। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল।

'কে আছ, বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেলল! বাঁচাও!'

আতরওয়ালা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, ভয়ে তার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। সে মরে যাচ্ছিল যত না কোমরে চোট পেয়ে, তার চেয়ে বেশি ভয়ে আর আতঙ্কে। এক নিরীহ বালকের বিকৃত হামলায়। নিজের থলির বোঝা ওঠানো ওর পক্ষে আর সম্ভব হল না। ঐ বোঝারই তলায় সে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

একটুক্ষণ আগেও পালিয়ে যাওয়ার সময় ইন্দুর পা দুটো তার নজরে এসেছিল। কিন্তু এখন সেই গলিতে ছেলেটাব নামনিশানাটুকুও মুছে গেছে।

'কে আছ, বাঁচাও...!' ফিস্‌ফিস্ করে আতরওয়ালা বলে।

একটা শিথিল আর্তস্বর তার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল। আর তার দু চোখের দৃষ্টি গলির ওপর ছড়িয়ে পড়ে নীল আকাশের ছোট একটা টুকরোতে গিয়ে আটকে গেল। সেখানে দুটো তিনটে চিল উড়ছিল। ক্রমে দুইয়ের জায়গায় হয়ে গেল চারটে চিল। তারপর আকাশের নীলিমা টলমল টলমল করতে করতে শেষে অস্পষ্ট আবছা হয়ে এল।

তেরো

নাথু খুব ভাবনায় পড়েছিল। নিজের ঘরের বাইরে বসে কেবল ছিলিমের পর ছিলিম টেনে যাচ্ছিল। মারামারি কাটাকাটির যত বেশি গুজব ওর কানে আসছিল, তত বেশি ওর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এই বলে বারবার নিজের মনকে বোঝাচ্ছিল—আমি তো আর অন্তর্যামী নই, আমি জানব কী করে কেন আমাকে দিয়ে শুয়োর মারানো হচ্ছিল! কিছুক্ষণ পর ওর মন ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার কোনো নতুন ঘটনা কানে এলেই ফের ওর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এসবই আমার পাপের ফল। সকাল থেকেই চামার পট্টির লোকেরা এ-ওর ঘরের বাইরে বসে বিড়ি খেতে খেতে কথাবার্তা বলছিল। নাথু বারবার ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ও নিজেও ওদের আলোচনায় যোগ দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, হাঁটুর মধ্যে কাঁপুনি ধরছিল বলে। ফের ওর নিজের কুঠুরিতে ফিরে আসছিল। একবার বউকে সব খুলে বললে হয় না? ও খুব বুঝদার মেয়ে, ও সব বুঝবে, আমারও বলে মন হাল্কা হবে। কখনো ভাবছে এক বোতল মদ কোথাও থেকে পাওয়া গেলে খেয়ে কিছু

সময়ের জন্যে বেহ‍ুশ হয়ে থাকা যেত। কিন্তু এ সময় কোথায় পাওয়া যাবে? বউকে বলাতেও বিপদ আছে। কথায় কথায় ও যদি কাউকে বলে ফেলে? তো বললে কী হবে? আমায় কেউ ছাড়বে না। বলা যায় না, পুলিশ হয়ত আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন কী হবে? আমি যে মুরাদআলীর কথায় এ কাজ করেছি, তা বিশ্বাস করবে? মুরাদআলী মুসলমান। মসজিদের সামনে শুয়োর ফেলবার মতো কাজ ওর পক্ষে কখনো সম্ভব…? নাথুর মন যখনই হাঁচড়-পাঁচড় করতে থাকে তখনই সে মুক্তি পাবার জন্যে অন্য কোনো পথের কথা ভাবতে থাকে। মসজিদের সামনে যে শুয়োরটা ফেলা হয়েছিল, সেটা ওর মারা শুয়োরই নয়। আমি ওটাকে দেখিই নি। আমার মারা শুয়োরটা কালো ছিল। কালো শুয়োর তো আরও থাকতে পারে। দুটোই কালো রঙের শুয়োর হতে পারে না? এটা আমার ভুল। আমি খামাখা ভেবে মরছি। সত্যি ওটা অন্য শুয়োর ছিল। এটা ভাববার পর ওর বউয়ের সঙ্গে হেসে ও কথা বলতে লাগল। নিজেই উঠে প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে বসল। তারপর বাজারের আগুন লাগা নিয়ে কথা বলতে লাগল,…কিন্তু এতেও সে মনে বেশিক্ষণ শান্তি পাচ্ছিল না। রাত্তিরের কথা মনে করে ওর লোম খাড়া হয়ে উঠল। কেউ কোথাও নেই, স্যাঁতসেঁতে কুঠুরি, চুরি-করা শুয়োর, আর অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে আসা কালুর ঠেলাগাড়ি। একের পর এক ঘটনা দুঃস্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে সার বেঁধে এসে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে সলিতারি সাহেব কখনো শুয়োর কাটিয়ে নেন? 'পিগারির শুয়োর ওখানে ঘুরে বেড়ায়, তার একটাকে ধরে নিয়ে যাও…রাত্তিরে ঠেলাগাড়ি আসবে, তাতে উঠিয়ে দেরে…যতক্ষণ আমি না আসি, আমার অপেক্ষায় থাকবে।' কোনো কাজ এভাবে হয়ে থাকে? মুরাদআলীর যদি চোরের মন হয়, তাহলে গলা দিয়ে ওকে ঘর থেকে বার করে দেবে। অন্য দিকে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে, উল্টে ধাক্কা আমাকেই ধরিয়ে দিতে পারে…

আবার নাথু ছিলিম হাতে নিল। চুলোয় যাক মুরাদআলী আর তার শুয়োর! যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমি জেনেশুনে কিছু করিনি। আমি যা কিছু করেছি তা না জেনে। যারা আগুন লাগাচ্ছে, রাস্তা দিয়ে লোক গেলে মেরে ফেলছে, এসব তো তারা চোখ খোলা রেখে করছে। কেন তারা এসব পাপ কাজ করছে? আমি কেবল একটা শুয়োর মেরে কী এমন দোষ করেছি? আমি যদি অপরাধী হই তো এরা কি অপরাধী নয়? ঐ যারা বাজারে আগুন লাগিয়েছে? আমি জেনেশুনে কিছু করিনি। যা হওয়ার ছিল তা হয়েছে, এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই…।

বাপের কথা নাথুর মনে পড়ল। ওর বাপ ভগবানকে খুব ভয় করত। সব সময় এই শিক্ষাই দিত: 'বেটা হাত সাফ রাখবি, যার হাত সাফ থাকে সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না।…ইজ্জতের রুটি খাবি…' বাপের কথা মনে পড়ে গিয়ে নাথুর কান্না পেল। ওর বুক আবার ভারী হয়ে এল, ওর অসহ্য বোধ হতে লাগল।

ময়দানের ওপারে একজন লোক চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ঘুরে চামারদের ডেরার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। ওকে দেখে নাথুর বুক ধড়াস করে উঠল। ওর মনে হল, লোকটা ওরই খোঁজে এসেছে ওরা জেনে গেছে যে, নাথুই শুয়োরটাকে মেরেছে।

নাথুর বউ আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাইরে এল। ওকে দেখে নাথুর মন আবার আকুলি বিকুলি করে উঠল। ওর মনে হল, বউকে সব কথা খুলে বলবে। মনের কথা বলবার তো একজন লোক দরকার। নাথুর চোখ আবার গিয়ে পড়ল মাঠের ধারে দাঁড়ানো সেই লোকটার ওপর।

বউ নাথুকে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ ?' বলে সে মাঠের ধারে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল। 'লোকটা কে ? ওকে চেনো ?'

'না তো, কে জানে কে, আমার চেনা নয়।' বলে নাথু ফ্যাল ফ্যাল করে ওর বউয়ের দিকে তাকাল।

তারপর নাথু খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ? যাও নিজের কাজে যাও।

ওর বউ তখুনি হন্‌হন্‌ করে ভেতরে চলে গেল।

নাথু আড়চোখে রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল লোকটা চলে যাচ্ছে। মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে ও একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সিগারেটে টান দিতে দিতে এগিয়ে চলল।

নাথু নিজের মনে বলল, 'কাজের দিনে অমন কত লোক এদিকে আসে, কাজের ধান্দায়।'

ওর মন ঠাণ্ডা হল। বউকে অকারণে ঝাঁঝাল গলায় ডাকল, 'শুনছ ?' তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'একটু চা করে দেবে ?'

ওর বউ দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। ওর বউয়ের শরীরে কিংবা ওর ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যাতে বউয়ের সান্নিধ্যে সে কেমন যেন বলভরসা পায়। বউ ঘরে থাকলে ঘরটা যেন সুস্থির হয়। বউ চোখের বাইরে গেলে নাথুর মনে হয়, ঘরে যেন সারা সৃষ্টি টলমল করছে। আজও তার অন্তর চাইছে সর্বক্ষণ বউ তার পাশে থাকুক। বউ তার কিছুতেই বিচলিত, কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। ঘাবড়ায় না। ওর বুক কখনো ধড়াস ধড়াস করে না। কোনো কথা ওর ভেতরটাকে কুরে কুরে খায় না। তার কারণ, ওর গাবদা গোবদা শরীর। আমার মতন দড়ি পাকানো নয় যে, সমস্ত সময় তা দুঃখের আগুনে খাক হবে। ওর এলানো শরীরে নাথু স্নিগ্ধতার রেশ খুঁজে পায়। ওর চালচলনে, ওর প্রত্যেকটা নড়াচড়ার মধ্যে একটা স্থিতু ভাব আছে। আছে একটা সামঞ্জস্য। ওর বউ দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। একটা হাত চৌকাঠে রেখে আস্তে আস্তে মুচকে মুচকে হাসতে থাকল।

'আগে তো এসময়ে কখনো তুমি চায়ের কথা বলতে না ? আজ ছুটি। সেইজন্যে ?'

এতে নাথুর রাগ ধরে গেল : 'ছুটি করছি, খুব মজায় আছি, না ? বানাতে না পারবি তো আমি নিজেই বানিয়ে নেব। অত লম্বাচওড়া কথা কিসের।'

বলে নাথু উঠে পড়ে কুঠুরির ভেতরে চলে গেল।

'চা এক্ষুণি করে দিচ্ছি। চা করতে কতক্ষণ লাগে! রেগে গেলি কেন?'

নাথু রাগ দেখিয়ে বলল, 'সরে যা তুই, আমি নিজেই করে নিচ্ছি।'

'আমি থাকতে তুই চুলোয় আগুন দিবি? তার চেয়ে আমার মরা ভালো' বলে বউ এগিয়ে এসে নাথুর হাত ধরে ওঠাতে লাগল : 'উঠে পড়। আমার মাথা খাস, উঠে পড়।'

নাথু উঠে দাঁড়াল। একটা গভীর ব্যথার মতো ভাব ওর মনে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, এগিয়ে এসে বউকে জড়িয়ে ধরল।

'আজ তোর হল কী?' বলে ওর বউ হেসে ফেলল। নাথুর বুকের কাছে এসে ওর একটা ছটফটানি ভাব বউ টের পেল। নাথুর মনের মধ্যে কিছু একটা কাঁটার মত বিঁধে আছে। তার ফলেই, কাল রাত থেকে নাথু অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করে চলেছে।

বউ বলল, 'কাল রাত থেকে কী সব আগডুম বাগডুম বকে যাচ্ছ! অমন করো না। আমার ভয় হয়।'

কথার কোনো মাথামুণ্ডু না রেখে নাথু বলে বসল, 'আমাদের ভয় কিসের? আমরা তো কারো ঘরে আগুন দিই নি?'

নাথুর পিঠে বউয়ের হাত থেমে গেল। তারপর নাথুকে সে নিজের কোলে টেনে নিল।

নাথুর ক্ষোভ আর উত্তেজনা দুটোই উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। কাল রাত্রের মতোই নাথু পাগলেব কাণ্ড শুরু করে দিল।

হঠাৎ ওর চোখের সামনে শুয়োরের লাশটা ভেসে উঠল। মেঝের ঠিক মাঝখানে চার পা তুলে রয়েছে, নিচে পড়ে রয়েছে যেন তাল তাল রক্ত। নাথু শিউরে উঠল। বউয়ের কোলের মধ্যেও ওর শবীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। নাথুর কাঁধে মিন মিন করছে ঘাম। বউয়ের মনে হল নাথুর মন যেন এক ঝটকায় দূরে কোথাও চলে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাথুর মুখ দিয়ে একটা ফুঁপিয়ে-ওঠা কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল। তারপরই বউয়ের কাছছাড়া হয়ে সরে গেল।

'হায়! না, আজ নয়, আমার মন চাইছে না। দেখছ না, বাইরে কী কাণ্ড হচ্ছে? লোকের ঘর আগুনে পুড়ছে!'

আনমান ভাব নিয়ে উঠে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল?' বউ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'তুমি অমন গুম হয়ে গেলে কেন? সত্যি করে বলো কী হয়েছে। না বলো তো আমার মরা মুখ দেখবে।'

এরপর নাথু চুপচাপ পিছিয়ে গিয়ে খাটের কাছে বসল।

'কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

'কিছু একটা হয়েইছে। তুই চেপে যাচ্ছিস।'

'কিছু হয় নি।' নাথু আবার বলল।

বউ ওর কাছে এসে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'কেন বলছিস্ না?'

নাথু আস্তে আস্তে বলল, 'বলার কিছু থাকলে তো বলব!'

'চা করে দিই? দাঁড়া, এক্ষুনি চা করে এনে দিচ্ছি।'

'চা চাই না।'

'এখুনি তো বলছিলে নিজে বানিয়ে নেবে। আর এখন বলছ চাই না।'

'না, চা লাগবে না।'

'আচ্ছা, তাহলে ওঠ্, খাটে ওঠ্।'

'না, খাটেও উঠব না।'

'রাগ করেছিস?' নাথুর বউ অনুযোগের সুরে বলল।

নাথু চুপ করে রইল। ঠিক নাকে কাঁদা ছেলের মতো নাথুর হাবভাব।

'কাল রাত্তিরে গিয়েছিলি কোথায়?' বলে বউ নাথুর কাছে গিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

নাথু থতমত খেয়ে বউয়ের দিকে তাকাল। বউ নিশ্চয় জানতে পেরে গেছে। এক সময়ে না এক সময়ে সবাই জানতে পারবে। নাথুর মনে হল ওর যেন হাঁটু কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

'যদি না বলো তো এই আমি মাটিতে মাথা খুঁড়ে চেঁচাব বলে দিচ্ছি। মনের কথা তুই কক্ষনো আমার কাছে লুকোস্ না। আজ কেন লুকোচ্ছিস?'

নাথু অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওর সন্দেহ হল, বউ কী না কী ভাবছে—আমার সম্বন্ধে ওর কী ধারণা হচ্ছে! কিন্তু নাথু দেখতে পাচ্ছিল ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ওর বউয়ের চোখ। বিশ্বাসে আর মিনতিতে ভরা। হঠাৎ আপনা থেকেই নাথু বলে উঠল. 'সব্জী 'মন্ডীতে কেন আগুন লাগল, জানিস?'

'জানি। কেউ শুয়োর মেরে মসজিদের সামনে ফেলেছিল। এতে মুসলমানরা মন্ডীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।'

'ঐ শুয়োরটা আমি মেরেছিলাম।'

শুনে তো নাথুর বউ হতভম্ব।

'তুই করেছিস? এমন খারাপ কাজ কেন করেছিস তুই?'

নাথুর বউয়ের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে কেউ যেন সাদা করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে পুরো ঘটনাটা নাথু বলে গেল।

বউ বলল, 'শুয়োরটা ফেলতেও তুই গিয়েছিলি?'

'না। কালু ওটা ঠ্যালায় চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

'কালু তো মুসলমান! ও কী করে নিয়ে গেল?

'কালু মুসলমান নয়। খ্রীস্টান। গির্জায় যায়।'

বউ অনেকক্ষণ ধরে নাথুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'খুব খারাপ

কাজ করেছিস তুই। তবে তোর কী দোষ? তোকে ওরা ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। তুই একাজ করেছিস ভাঁওতায় পড়ে।' ও যেন বিড় বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু তার আপাদমস্তক কাঁপছিল। নাথুর বউয়ের মনে হল ভয়ানক এক শনির দৃষ্টি পড়েছে তাদের সংসারে—হাজার উপোস আর হাজার প্রায়শ্চিত্ত করলেও এই গ্রহের দোষ কাটবে না।

নাথুর বউয়ের বুকের ওপর একটা ভারী বোঝা চেপে বসল।

নাথুর অন্তস্তল থেকে একটা গভীর মর্মবেদনা উঠে এল। বউ নাথুর দিকে তাকাল। নাথুকে বিচলিত হতে দেখে ওর ভেতর থেকে একটা মমতার ফোয়ারা উপচে পড়ল। উঠে গিয়ে নাথুর পাশে বসে তার হাত ধরে বলল, 'তাই বলি, ও কেন এত উতলা হয়ে আছে। আমি কী করে জানব, আমাকে তুই বলিস নি কেন? মনে কখনও দুঃখ পুষে রাখতে হয়?'

নাথু বিড়বিড় করে বলল, 'জানলে কি আর এ কাজ আমি করতাম? আমাকে তো বলেছিল সলিতরী সাহেব শুয়োর চেয়েছে।' নাথু নিজের আরও ভেতরে ঢুকে কথা টেনে বার করতে করতে বলল, 'কাল রাত্তিরে মুরাদআলীকে আমি দেখেছিলাম। ও আমার সঙ্গে কথা বলে নি। আমি ওর পেছনে ছুটেছিলাম, কিন্তু লম্বা লম্বা পা ফেলে ও চলে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলে নি···।' নাথুর গলার আওয়াজ একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল—ওর সন্দেহ হতে লাগল, মুরাদআলীকে কি সত্যিই ও দেখেছিল? না দেখে নি!

'শুয়োর মারার জন্যে ক' পয়সা পেয়েছিলি?'

'পাঁচ টাকা। আগাম দিয়ে দিয়েছিল।'

'পাঁচ টাকা? এত বেশি? কী কী করলি তুই ঐ টাকা দিয়ে?'

'কিছু করিনি। চার টাকা ঐখানে ঐ তাকে তোলা আছে।'

'আমাকে বলিসনি কেন?'

'ভেবেছিলাম তোর জন্যে এক জোড়া কাপড় কিনে আনব।'

'ঐ পয়সায় কাপড় নেব? ও পয়সা আমি আগুনে ফেলব না?' নাথুর বউ রাগের মাথায় কথাটা বলে ফেলে পরে নিজেকে আবার সামলে নিল।

নাথুর বউ উঠে পড়ে তাকের কাছে গিয়ে ডিঙি মেরে টাকাটা দেখে নিয়ে তারপর নাথুর কাছে ফিরে এল।

ততক্ষণে নাথুর ঘাড় আরও ঝুলে পড়েছে। ও যেন এক গহন অন্ধকারে ডুবে গেছে।

নাথু ঘাড় তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ লোকটাকে তুই দেখেছিলি, মাঠের ধারে যে এসে দাঁড়িয়েছিল?

'হ্যাঁ দেখেছিলাম। তো কী হয়েছে তাতে?'

'আমার মনে হয় লোকটা বাগদী—যার শুয়োরটা আমি চুরি করেছিলাম। ও নিশ্চয় জানতে পেরেছে।'

'তুই যে কী হয়েছিস! জানলে তো তোর কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্যে

আসত। তুই কী পাগলের মত বকছিস?' নাথুর বউ গলা উচু করে বলল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'দেখ্ বাপু, আমরা করি চামড়ার কাজ। মরা জানোয়ারের ছাল ছাড়ানো, তাদের মারা আমাদের জাত-ব্যবসা। তুই শুয়োর মেরেছিস। তারপর সেটা নিয়ে কেউ মসজিদের সামনেই ফেলুক, কী হাটে-বাজারেই বেচুক—তাতে আমাদের কী? তাছাড়া তুই জানছিস কী করে যে, তোর মারা শুয়োরটাই মসজিদের সামনে ফেলা হয়েছে? এর মধ্যে তুই কেন নিজেকে টানছিস? এরপর ব্যাপারটা আরও গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার ভাব নিয়ে বলল, 'আমি এই পয়সায় কাপড় আলবাৎ নেব। কেন নেব না? তোর রোজগারের পয়সা। গতরে খাটা মজুরির পয়সা।' বলে উঠে তাকের কাছে চলে গেল আর তারপর খুশিতে ডগমগ হয়ে টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই আবার সেখানে রেখে দিল।

'হ্যাঁ, আমার কী? তুই ঠিক কথা বলেছিস। তাতে আমার কী! গোল্লায় যাক মুরাদআলী আর তার শুয়োর! আমিও কাল এই কথাই বলছিলাম…।'

কথাটা বলার পর নাথুর যেন প্রাণটা ঠান্ডা হল।

'এখন পুরো পনেরো টাকা আমার হাতে…তুইও এ থেকে নিজের জন্যে কিছু নে।'

নাথু আবেগে ভেসে গিয়ে বলল, 'আমি কিচ্ছু চাই না। তুই আমার পাশে থাকলে তুই হবি আমার সর্বস্ব।'

নাথুর বউ ঝট্ করে উঠে পড়ে চুলো ধরিয়ে চা করতে বসে গেল।

নাথুর বউ বলল, 'যার দিল্ সাফ, ভগবানের কাছে তার সাত খুন মাপ। আমাদের মন পরিষ্কার। আমরা কেন কাউকে ভয় করতে যাব?' তারপর বসে বসেই বলল, 'আমাকে তো বললিই, এরপর এ বাড়ির আর কাউকে এসব কথা বলিস না।'

'না, আমি কেন বলব? তুমিও যেন বলো না।'

নাথুর বউ গেলাসে চা ঢালছে। এমন সময় দ্রুত পায়ে ছুটে পালানোর আওয়াজ হল। বউয়ের হাত স্থির হয়ে গেল। তারপর নাথুর দিকে চোখ তুলে মুখে কিছু বলার বদলে হাসল।

কিছুক্ষণ বাদে শোনা গেল চামার-বস্তীর একজন আরেকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে, চাচা?'

'দাঙ্গা হয়ে গেল রাস্তায়।'

'কোথায়?'

'রাস্তায়। হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা। বলছে দুজন মারা গেছে।'

'যে লোকটা পালাচ্ছিল সে কে?'

'সে কে জানি না।…বাইরে থেকে আসা কোনো লোক বোধ হয়।'

কুঠুরির ভেতর বাইরে আবার একটা নৈঃশব্দ্য ঢেকে গেল। যে লোকটা কথা বলছিল, সে হয় ঘরের ভেতরে কিংবা পেছনের উঠোনে চলে গিয়েছিল।

নাথুর হাতে চায়ের গেলাস দিয়ে ওর বউ বলল, 'তুই যা, বস্তীর লোকদের সঙ্গে দেখা কর। তুই যা, আমি আসছি। এখানে বসে থেকে কী করবি?'

নাথুর বউ উঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করে দিল। ঘরের আনাচ-কানাচ, জিনিসপত্র উঠিয়ে উঠিয়ে তার তলাগুলো পরিষ্কার করতে লেগে গেল। কেন করছিল সে নিজেও জানে না। ঝাঁটা দিয়ে ও যেন ঘর থেকে কোনো বালাই দূর করতে চাইছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঘর ঝাঁট দেবার পর ভালো করে ঘষে ঘষে মেঝে ধোয়া-মোছা করল। শেষে যখন থকে গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল, তখন তার মনে হল যেন বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে একটা ছায়া আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এসেছে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। আর ছায়াটা ঘরের ভেতরে চারদিকে যেন মুচকে মুচকে হাসছে।

চোদ্দ

প্রথম বাস খানপুর থেকে সকাল আটটায় ছেড়ে গাঁয়ে পৌঁছে যায়। সে বাস এখনও এল না। এরপর যেমন শহর থেকে, তেমনি খানপুর থেকেও দু-একঘণ্টা অন্তর অন্তর আরও একটা-না-একটা বাস আছে। আজ দুপুর হয়ে গেল, একটাও এল না। চায়ের দোকানে কেট্‌লিতে জল সমানে ফুটে চলেছে। দোকানের সামনে দুটো বেঞ্চির একটাতেও খদ্দের নেই। আগে একটা বেঞ্চিও খালি থাকত না। গাঁয়ের এমন লোক নেই যে যাতায়াতের রাস্তায় হরনাম সিংয়ের দোকানে একবার বসে যায় না। বাসস্টপে দুতিনটে লম্বা রোঁয়াঅলা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে বিরাজ করছে একটা থমথমে ভাব।

মেয়েদের দৃষ্টি অনেক সূক্ষ্ম হয়। বন্তো কাল থেকেই বলতে শুরু করেছিল, এ গ্রাম ছেড়ে চলো এমন কোথাও চলে যাই যেখানে আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব আছে। এই গোটা গ্রামটাতে এই দুটি প্রাণীই হল শিখ পরিবারের। বাকি সব মুসলমান। কিন্তু হরনাম সিং বউয়ের কথায় রাজী হয় নি। চালু দোকান ফেলে রেখে কোথায় যাব? ঝগড়া মারামারি তো হয়েই থাকে। তাই বলে কাজ কারবার সব বন্ধ করে দেওয়া যায় না তো। আর বন্ধ করে যাবই বা কোথায়? শহরে যাব? সেখানে তো আগেই আগুন লেগে বসে আছে। খানপুরে যদি যাই, সেখানে কে আমাদের খাওয়াবার জন্যে বসে আছে? কেউ যদি সেই সুযোগে দোকান লুট করে, খাব কী করে? ছেলের কাছে যাবে? ছেলে বিশ মাইল দূরে বীরপুর গ্রামে গিয়ে বসেছে। আমাদের মতো ছেলেও সেখানে একলা। যেখানে গিয়েব সেছে, গুরু মহারাজের আশ্রয়ে সেখানেই থাক। যদি আমরা ওর কাছে যাইও, ও আমাদের বুড়োবুড়ির জান বাঁচাবে, না নিজের জান বাঁচাবে? নিজের পয়সাতে খেলেও কতদিন খাব? অন্যে খাওয়ালেও সেই বা কতদিন খাওয়াবে? এরপর কোলের ওপর হাতদুটো জোড় করে হরনাম সিং আওড়াত—

'জিস্‌কে সির উপরি তুঁ সুআমী সো দুঃখু কৈসা পাবৈ!'

(হে মালিক! যার মাথায় তোমার হাত সে কেমন করে দুঃখ পাবে!)

বন্তো এইসব শুনে চুপ করে যায়। তারপর আবার সেই ভেতর থেকে ডুবে যাওয়ার অনুভূতি হয়, তখন বলে: 'চলো না গো, আমাদের বোনেদের গ্রামে চলে যাই। কাছেই তো। গুরুদ্বারে গিয়ে পড়ে থাকব, বোনের ঘাড়ে থাকব না। ওখানে কত বড় শিখ সমাজ রয়েছে। নিজেদের লোকের কাছে আশ্রয় পাব।' কিন্তু

হরনাম সিং বউয়ের কথায় কান দেয় নি। ওর বিশ্বাস ছিল, আর যারই সঙ্গে ভালোমন্দ হোক, ওর সঙ্গে তেমন হওয়ার ভয় নেই।

'সুন ভাগে ভারিয়ে, অসাঁ কদে কিসে দা বুরা নহী চেতিয়া, বুরা নহী কীতা। ইথী দে লোকী বী সাডে নাল ভরাবাঁ বাঁগ রহে হন। তেরিয়াঁ অখাঁ সাহমণে করীম খান দস বারা কহ গিয়া হৈ: চুপচাপ বৈঠে রহবো, তুহাডে বল কোই অ'খ চুক কে বী নহী বেখণগা। করীমখান তো বডা মীতবর ইথে কোণ হৈ? ইক্কি ইক ইথে শিখ ঘর হৈ? কে গিরাবালিয়াঁ নুং সাঁডে তে হথ চুকাদিয়াঁ গৈরত নহী আয়েগী?'

'ভারী ভাগনেওয়ালা, শোন্। আমরা কারো কাঁড় ধারি না, কারো অহিত চিন্তা করি না, কারো কখনও অনিষ্ট করিনি। এরাও কখনও আমাদের পেছনে কাঠি দেয়নি। তোর সামনে করিম খান কম করেও দশ বার এসে এসে বলে গেছে: তোফা বসে থাকো। তোমাদের দিকে কেউ নজরই দেবে না। করিম খানের কথার ওপর কথা বলবে, তেমন লোক এ গাঁয় কে আছে? এ গাঁয়ে আছে তো মোটে এক ঘর শিখ। কোন্ মুখে এরা দুই নিরস্ত্র বুড়োবুড়ির গায়ে হাত তুলবে?'

বন্তো আবার চুপ করে গেল। যুক্তি দিয়ে যুক্তিকে কাটান দেওয়া যায়, কিন্তু যুক্তির কাছে বিশ্বাসের কোনো জবাব নেই। কোনো কোনো সময় বন্তো রণে ভঙ্গ দিলেও, হরনাম সিংয়ের বিশ্বাসে এতটুকুও চিড় ধরেনি। ওর মুখে কোনো সময় চিন্তার ছায়ামাত্র পড়েনি। সারাক্ষণ সে গুরু মহারাজের নাম নিচ্ছে। ওকে দেখে বন্তোও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচছে।

কিন্তু আজ একটা বাসেরও দেখা নেই। দোকানে একজনও খদ্দের আসেনি। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। এদিকে বারকয়েক উট্‌কো লোককে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখা গেল। তারা হরনাম সিংয়ের বাড়িটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর চড়াইয়ের দিক থেকে একটা পরিচিত পায়ের শব্দ ভেসে এল। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আসছিল করিম খান। শুনে হরনাম সিংয়ের প্রাণ ঠান্ডা হল। করিম খান কিছু বলবে, কোনো বুদ্ধিপরামর্শ দেবে, কোনো উপায় বাতলাবে। এখানে কোনো বিপদের ভয় থাকলে আমরা করিম খানের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেব।

করিম খান দোকানের কাছে এসেও দাঁড়াল না। এমন কি চোখ তুলে তাকালোও না। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শুধু চলার গতি কমিয়ে গলা ঝাড়ার ভান করে বিড়বিড়িয়ে বলে গেল:

'গতিক সুবিধের নয়, হরনাম সিং! তোরা চলে যা।' দু-এক পা এগিয়ে ফের বলল, 'গাঁয়ের লোকে তো তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু বাইরে থেকে আসা দাঙ্গাবাজদের নিয়েই আমার ভয়। ওদের ঠেকাবার আমার ক্ষমতা নেই।'

বলে ফের গলা খুক্ খুক্ করতে করতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করে চলে গেল।

এই প্রথম হরনাম সিংয়ের বিশ্বাসের খুঁটি নড়ে উঠল। করিম খানের না

দাঁড়ানোটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে একেবারে শিরেসংক্রান্তি। বিপদ মাথায় করে নিয়েই করিম খানকে আসতে হয়েছিল। হরনাম সিং যত না ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি জেগেছিল তার মনের মধ্যে হু-হু করে ওঠা একটা ভাব। ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়ের চেয়েও বেশি করে তার মনে জুড়ে বসে ছিল একটা ধুত্তোরি ভাব।

মিনিট পাঁচেক পরে করিম খান ফের ফিরে এল। চড়াই ঠেলে উঠতে উঠতে কোমরে হাত দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে, আবার ঠিক সেই গলা খুক্ খুক্ করতে করতে চলার গতি কমিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'দেরি করিসনে, হরনাম সিং। অবস্থা ভালো ঠেকছে না। বাইরে থেকে দাঙ্গাবাজদের হামলার ভয় আছে।'

বলে সেই একই ভাবে কোমরে হাত দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢিবির রাস্তায় উঠতে লাগল।

হরনাম সিং যাবে কোথায়? মাইলের পর মাইল পড়ে আছে রাস্তা, ধু-ধু প্রান্তর আর উপত্যকা। করিম খান তো চলে যাও বলে খালাস। আমরা এখন যাই কোথায়? এর মধ্যে কোথায় তারা মাথা গোজার ঠাঁই পাবে? ষাট বছরের বুড়ো। সঙ্গে বউ। যদি যায়ও, পালিয়ে কত দূরেই বা যেতে পারবে? পালিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবে?

ভেতরের মন যেন একবার বলে উঠল: কোথাও যেয়ো না। মাটি কামড়ে এখানেই পড়ে থাকো। গুন্ডারা এলে ওদের হাতে দোকান সঁপে দাও, প্রাণও সঁপে দাও। বরং এখানেই মরা ভালো। পরদেশে কোথায় পায়ের দড়ি ছিঁড়ে বেড়াবে? এখানে কে ওদের ওপর হামলা করবে? ভেবে ও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিল না, এ গাঁয়ের কোন্ লোক ওদের গায়ে হাত দেবে? এ গাঁয়ের লোক কেনই বা বাইরের লোককে তাদের ওপর হামলা করতে দেবে?

হরনাম সিং উঠে পেছনের কুঠুরিতে চলে এল। সেখানে বন্তো বসেছিল।

'করিম খান এসে বলে গেল এখান থেকে চলে যেতে। বাইরে থেকে দাঙ্গাবাজরা আসছে।'

শুনে মুহূর্তে বন্তোর রক্ত হিম হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াবার শক্তি হল না। শিয়রে রাত্তির। যাবারও কোনো জায়গা জানা নেই। অন্ধকার ঘরে হরনাম সিং যেন অবসাদের প্রতিমূর্তি।

কিন্তু এখন ভাববারও আর সময় নেই। বেশি দেরি করারও উপায় নেই। অন্ধকার হলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

'এখনও আমি বলছি, এখানেই বসে থাকো। কোথাও গিয়ে কাজ নেই।' তারপর একদিকের দেয়ালে ঝোলানো দো-নলা বন্দুকের দিকে ইশারা করে বলল, 'মরণের ডংকা যখন বেজেইছে, তখন সে রকম হলে আগে তোমায় মারব, তারপর নিজেকে।'

বন্তো চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। কীই বা সে বলবে? কী পরামর্শই বা দেবে? সে তো আর কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না।

হরনামসিং তার দোকানঘরে ফিরে এল। টাটের তলা থেকে নগদ টাকা পয়সা-

গুলো নিয়ে ভেতরে এল। বাক্স থেকে জমানো নোটগুলো বার করে আলাদা করে নিল। রেজগিগুলো বাক্সেই পড়ে রইল। টাকার থলিটা পকেটে রাখল। তারপর দেয়ালে টাঙানো বন্দুকটা নামিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। হরনাম সিং বুঝে উঠতে পারছিল না কোন্ কোন্ মাল সঙ্গে নেবে আর কী কী রেখে যাবে। দোকান রেজিস্ট্রির কাগজটা নেব? কিন্তু সে কাগজ খুঁজবার আর সময় নেই। বন্তোরও সেই এক দশা। ওর গয়নাগুলো নেবে? খাবার দাবার কিছু তৈরি করে সঙ্গে নিলে হয়। দুটো রুটি সেঁকে নেব? রাস্তায় কি খাওয়ার কিছু মিলবে? কাপড় বদলে নেব? ধোপদুরস্ত হয়ে বাইরে বেরনো উচিত। কী নেবে কী নেবে না, এ বিষয়ে বন্তো কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না।

বন্তো জিজ্ঞেস করল, 'গয়নার পুঁটুলিটা কী করি, বলো তো? গয়নাগুলো সব গায়ে পরে নেব?'

'গায়ে দিয়ে নে।' বলার পরই আবার কী ভেবে হরনামসিং মত বদলাল। 'উঁহু, তোর ঐ গয়না দেখেই কেউ হয়ত তোকে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে দোকানের পেছনে ওগুলো পুঁতে রেখে দে।'

বন্তো কামিজের তলায় গয়নাগুলো পরে নিল। কিছু গয়না রুমালে জড়িয়ে তোরঙ্গের ভেতরে ফেলে রাখল। বাকি গহনা দোকানের পেছনে বন্তো তার নিজের তৈরি তরকারির বাগানে মাটিতে পুঁতে রেখে এল। ঘরের মধ্যে রাখা সিন্দুকে মেয়ের বিয়েতে বানানো পোশক শতরঞ্চি সমেত পুরো এক প্রস্থ বিছানা, আরও কত কিছু ছিল—কিন্তু কিছুই সঙ্গে নেওয়া যাবে না।

'দুটো রুটি সেঁকে নেব? কখন কোথায় থাকি!'

'তুমি তো আচ্ছা লোক। তার কি আর সময় আছে? আগে এসব ভেবে রাখলেই তো হত!'

ঠিক সেই সময় দূরে কোথাও ঢোল বেজে উঠল। কর্তাগিন্নী এ ওর দিকে চাইল।

'দাঙ্গাবাজেরা এসে গেছে, মনে হচ্ছে। ওরা খানপুর থেকে আসছে।' ওদিকে ঢোল বাজছে আর এদিকে চড়াই পেরিয়ে গাঁয়ের মধ্যে থেকে স্লোগান দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

'ইয়া আলী!'

'আল্লা-হো-আকবর!'

হরনামসিং নিজের মনে বলল, 'এ সেই আশরফ আর লতি। এ গাঁয়ে লীগের লোক ওরাই। পাকিস্তানের আওয়াজ ওরাই তুলছে।'

সারা তল্লাট থরথর করে কেঁপে উঠল।

বেলা গড়িয়ে গেলেও অন্ধকার তখনও ছেঁড়া-ছেঁড়া। দাঙ্গাবাজদের আওয়াজ তখন বাঁদিকে ক্রোশখানেক দূরে থেকে ভেসে আসছিল।

এমন সময় ময়নার খাঁচার দিকে হরনাম সিংয়ের চোখ পড়ল।

'বন্তো, খাঁচাটা ঘরের পেছনে নিয়ে গিয়ে ময়নাটাকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দে।'

কিছুক্ষণ আগে বন্তো ময়নার খাঁচায় জল আর দানা দিয়েছিল। এখন খাঁচা নামিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ময়না রোজকার বুলি আওড়াল : 'রখ্বা রাখা, সরবন্ধ দা রখ্বা রাখা !' (ঈশ্বর রক্ষা করবেন. সবাইকে ঈশ্বর রক্ষা করবেন।)

শুনতে শুনতে বন্তোর গলা বুজে এল। সেও বিড়বিড় করে বলতে লাগল, রখ্বা রাখা, সরবন্ধ দা রখ্বা রাখা।'

হরনাম সিংই ময়নাকে এই বুলি শিখিয়েছিল। প্রায়ই দোকানের তক্তায় হরনাম বসে থাকত আর বন্তো বসত পেছনের ঘরে। দোকানে খদ্দের না থাকলে হরনাম সিং ঘরের ভেতরে বউয়ের পাশে বসে গুরুবাণী বলত আর ধর্মকথা শোনাত। বার বার উঠত : 'রখ্বা রাখা, সরবন্ধ দা রখ্বা রাখা !

আর ময়না প্রতিধ্বনি করে ঐ কথাটা আওড়াত।

ময়নার মুখে ঐ বুলিটা শুনে বন্তো মনে জোর পেল। যেমন ভরসা হল, তেমন মনটাও সুস্থির হল। ভাবো, ঐটুকুন পাখিও তাকে শিক্ষা দিচ্ছে।

পেছনের এক টুকরো ছোট্ট জমিতে হরনাম সিং সব্জীর বাগান করেছিল। সেখানে একটা আমগাছ বড় হয়েছে। আঙিনার মাঝখানে এসে বন্তো খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'যা ময়না, তেরা রখ্বা রাখা, সরবন্ধ দা রখ্বা রাখা।'

কিন্তু ময়না যে-কে সেই খাঁচাতেই বসে রইল।

'উড়ে যা রে, ময়না। বিশ্বাসে ভর ক'রে উড়ে যা।'

বলে বলে বন্তোর গলা ধরে এল। তখন খাঁচাটা মাটিতে রেখে দিয়েই ঘরে ফিরে এল।

সেই ঢোল বাজবার আওয়াজ হল। আওয়াজটা এবার অনেক কাছে এসে গেছে। গ্রামের দিক থেকেও জোরে গুঞ্জন শোনা গেল। অনেক লোক দলবদ্ধভাবে কোথাও থেকে এগিয়ে আসছে। গাঁয়ের ভেতর থেকে মাঝে মাঝেই ধ্বনি দেবার আওয়াজ সোজা কানে আসছে।

বন্তো আর হরনামসিং সঙ্গে তিনটে করে কাপড়, কিছু জমানো টাকা আর বন্দুক সামলে নিয়ে দোকানে তালা দিয়ে বাইরে এল। ঘরের বাইরে পা দিতেই তাদের কাছে সারা তল্লাট পর হয়ে গেল। কোথায় যাবে ? কোথায় ঘুরে বেড়াবে ? বাঁ-হাতে প্রসারিত গ্রাম। ঐদিকেই ছিল কসাইখানা। তার ওপাশ থেকে দাঙ্গাবাজদের ঢোল শোনা যাচ্ছিল। ডানদিকের পাকা সড়ক গেছে খানপুরের দিকে। ও রাস্তায় যাওয়াটা তেমন নিরাপদ নয়। সড়ক পার হয়ে কিছুদূরে গেলে একটা নালা পড়বে। নালাটা চওড়া। ওদিকের পাড়ও উঁচু। ওখানে গেলে ও-রাস্তা দিয়ে লোকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া যায়। সড়ক দিয়ে গেলে বিপদে পড়ার ভয় থাকে। নালায় বারোমাস জল থাকে না। হেঁটেই পার হওয়া যায়। নালার খাত বালি, কাঁকর আর পাথরে ভর্তি।

দুজনে সড়ক পেরিয়ে নালার দিকে নামতে লাগল। তার মধ্যে দাঙ্গাবাজেরা

গাঁয়ের কাছে পৌঁছে এইদিকেই এগোচ্ছিল। ওদের রণধ্বনিতে আর ঢোল করতালের আওয়াজে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

হরনামসিং আর ওর বউ নালার দিকে নামতে নামতে ওপরে কোথাও থেকে ক্ষীণ আওয়াজ এল;

'বন্তো তেরা রব্বা রাখা…
সরবন্ধ দা রব্বা রাখা।'

ময়না ওদের পেছনে পেছনে উড়ে এসে একটা গাছের ডালে বসেছিল।

সেই সময় দাঙ্গাবাজের দলটা টিলার ওপরে এসে পৌঁচেছিল। তার ঠিক নিচে হরনামসিংয়ের দোকান। লোকগুলো হল্লা করে আওয়াজ দিতে দিতে আর ঢোল বাজাতে বাজাতে নিচের দিকে নামছিল।

চাঁদ বেরিয়ে আসতেই চারদিকে ফিনিক দেওয়া জ্যোৎস্নায় মনে হতে লাগল যেন গাছ আর পাথরের আড়ালে আড়ালে যেন লুকিয়ে আছে অদৃশ্য শত্রু। নদী খটখটে শুকনো। জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে, নদীর খাতে যেন সাদা চাদর বিছানো। দুজনে উঁচু পাড় থেকে নেমে এসে তার আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে ডানদিক বরাবর এগোতে লাগল। নদীর ধারে ধারে ছোট-বড় পাথর ডিঙোতে গিয়ে ওদের হাঁফ ধরে গেলেও কান খাড়া করা ছিল দাঙ্গাবাজদের দিকে।

গোড়ায় শোরগোলটা কাছে এসে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ সেটা থেমে গেল। হরনামসিংয়ের মনে হল ওরা নিশ্চয় তার দোকানে পৌঁছে গেছে। ওরা ঠিক করতে পারছে না কী করবে। হরনামসিং মনে মনে করিম খানকে ধন্যবাদ জানাল। সময় থাকতে করিম খান খবর না দিলে ওদের পক্ষে পালানো অসম্ভব হত। এই সময়ে কোনো কিছুতে জোরে জোরে ঘা দেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। হরনামসিং বুঝতে পারল দাঙ্গাবাজেরা ওর দোকানের দরজা ভাঙছে। এগিয়ে যেতে গিয়ে ওদের পা কাঁপছিল। দুজনে দুজনকার হাত ধরে ওরা পা টিপে টিপে চলতে লাগল।

হরনামসিং বন্তোর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আহা, গুরুর নাম নিয়ে চলতে থাকো!'

এই সময়ে একটা কুকুরকে ডাকতে শোনা গেল। ওপর দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোয় ওরা দেখল এক বিকটদর্শন কালো কুকুর ওদের দেখে সমানে ডেকে চলেছে। ভয়ে হরনামসিংয়ের রক্ত জল হয়ে গেল। এবার কী হবে? গুরু মহারাজ কোন্ পাপে এমন ভয়ানক শাস্তি দিচ্ছেন? কুকুরের ডাক শুনে ওরা তো এদিকে চলে আসবে। তখন ওদের বুঝতে দেরি হবে না যে, কোথা দিয়ে আমরা পালাচ্ছি।

বন্তো বলল, 'তুমি চলতে থাকো। তুমি থেমো না গো!'

কুকুর সমানে ডাকছে। লম্বা রোঁয়াঅলা সেই কুকুর, তার দোকানের সামনে যেটা টহল দিত। এখানে সেখানে তাকে পাতা চেটে বেড়াতে দেখা যেত। খানিক দূর গিয়ে বন্তো পেছন ফিরে দেখল। কুকুরটা তখনও সমানে ডেকে যাচ্ছিল। কিন্তু আর এগিয়ে আসছিল না বা টিলা ছেড়ে ঢাল বেয়ে নিচেও নামছিল না।

ওরা এগিয়ে যেতে লাগল।

'আগে তো যো-সো করে গ্রামটা পেরোই। সামনে ভগবান মালিক।'

'কুকুরটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর আসছে না।

'ডেকে তো যাচ্ছে!'

একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ে দম বন্ধ করে কুকুরের ডাক শুনতে লাগল। ওদিকে দোকানের দরজা ভেঙে যাওয়ায় 'ইয়া আলী!' বলে হাঁক ছেড়ে দাঙ্গাবাজেরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

'লুট করে নিচ্ছে। আমাদের ঘরদোর সব লুট করে নিচ্ছে।'

এরপর আর কুকুরের ডাকও ওদের কানে পৌঁছুল না। ওরা দুজনে আগের চেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কুকুরের কথা মনে পড়লেই বা কী হবে। ও হয়ত আর পিছু নেবে না। মেরেই বা ওদের কাছ থেকে কী পেত। দোকানে গেলে কত কিছুই পেতে পারত।

বন্তো বলল, 'এখন কারই বা দোকান, কারই বা ঘর। ছেড়ে যখন এলাম তখন আর আমাদের থাকল কোথায়!'

চাঁদনিতে ঝলমল করা নদীর খাত, কোথাও কোথাও গাছের ঝোপঝাড়। টিলার ওপর সমানে ঘেউ ঘেউ করা লম্বা রোঁয়াঅলা কুকুর—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন। কী তাড়াতাড়ি সব কিছু বদলে গেল। বিশ বছর এক জায়গায় কাটাবার পর এক পলকে সেটা বিদেশ বিভুঁই হয়ে গেল। হরনামসিংয়ের হাত ঠাণ্ডা। ঘামে ভিজে গেছে। কিন্তু একটা কথাই সে বার বার আওড়ে চলেছে: 'বেরিয়ে যাই, চলো যে করে হোক এখান থেকে চলে যাই।'

গ্রাম পেছনে পড়ে রইল। কুকুর সেই পাড়েই থেকে গেল, আর এগিয়ে এল না। কিছুক্ষণ পরে নিজেই হয়ত ফিরে যাবে। দোকানে লুটপাট শেষ। দাঙ্গাবাজদের হল্লা থেমে গেছে। মনে হচ্ছে লুটের মাল পেয়ে এখন ওরা খুশী। এখন আর কেন ওরা এদের খুঁজতে বেরোবে? এখন শুধু কাঁকর আর পাথরে খড়মড় করে চলবার শব্দ উঠছে। চারদিকের আর সব কিছু নিস্তব্ধ।

কিছুদূর যাওয়ার পর বন্তোর মনে হল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে আলোর রোশনাই। ফিরে দেখে নালার উঁচু পাড়ের পেছনে গ্রামের দিকে আকাশটা লাল হয়ে আছে। বন্তো হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'দেখ গো। কী কাণ্ড!'

হরনামসিং বলল, 'দেখার আছে কী? দোকান পুড়ছে।' বলে দাঁড়িয়ে গিয়ে সেও কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো আগুনের শিখা দেখতে লাগল। নিজের ঘরের আগুনের শিখা নিশ্চয়ই অন্যের ঘরের আগুনের শিখার চেয়ে আলাদা হয়, নইলে ও কেন পাথরের মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে চেয়ে থাকবে!

হরনামসিং বিষণ্ণ গলায় বলল, 'সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল!'

'চোখের সামনে পুড়ে খাক হল।'

'সদ্‌গুরুর এই ইচ্ছে ছিল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরনামসিং আবার চলতে লাগল। দেয়ালের আড়ালে মানুষ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে শুধু টিলা আর

কোথাও কোথাও পাথরের চাঁই। মানুষ তার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাও কতক্ষণ? কয়েক ঘণ্টা পর রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যাবে। আলো এসে তাকে অনাবৃত করে দেবে। তখন আর লুকোবার কোনো জায়গা খুঁজে পাবে না।

বন্তোর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল আর হরনামসিংয়ের পা দুটো লগবগ করছিল। কিন্তু এই সময় শুধু তো ওরা দুজনই নয়, অসংখ্য গ্রাম থেকে অগণিত মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অনেকেরই কানে ভেসে আসছিল দরজা ভাঙার আওয়াজ। তাদের কাছে তখন ভাববার সময় নেই, ভবিষ্যতের কোনো ছবি আঁকার ব্যাপার নেই। তখন শুধু যেমন-তেমন করে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। যতক্ষণ না রাতের অন্ধকার আঁচলের তলায় তোমাকে টেনে না নিচ্ছে, ততক্ষণ চলতেই থাকো। একটু পরেই দিনের আলো ফুটে উঠবে। আর তখন প্রাণের ভয় ক্ষুধার্ত ভাল্লুকের মতো তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আরও খানিকক্ষণ পর ওরা ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু যখনই বুঝল ওরা বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, তখনই নিজের ছেলে-মেয়েদের মুখ ওদের চোখে ভিড় করে এল। ইকবাল সিং এখন কোথায়? ওর দিন কিভাবে কাটছে? আর যশবীর? কোথায় সে? যশবীরের জন্যে তত ভাবনা নেই। ও ছোট শহরে থাকে। ওর নিজের সম্প্রদায়ের লোক সেখানে বেশি। সম্ভবত গোটা শিখ জনসংঘ সেখানকার গুরুদ্বারে দল বেঁধে রয়েছে। ওরা হয়ত নিজেদের বাঁচার একটা পথ বার করে নিতে পারবে। কিন্তু ইকবাল সিং একেবারে একা। গাঁয়ে ওর ছোট মতো একটা কাপড়ের দোকান। সময় মতো পালাতে পেরেছে হয়ত। এখন হয়ত আমাদেরই মতন হন্যে হয়ে ঘুরছে। এসব ভাবলেই প্রাণ আনচান করে ওঠে। হরনামসিং চোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে গুরু মহারাজের নাম জপ করল। আর মনে মনে তাঁর এই বাণীটি আওড়াল:

> 'জিস্‌কে সির উপরি তূ সুআমী
> সো দুঃখু কৈসা পাবৈ।'

যখন তারা ছোট একটা ঝর্নার ধারে পাহাড়ের ওপর এসে বসল তখন রাত ফরসা হয়ে আসছে। হরনামসিংয়ের চেনা এলাকা এটা। ছোট একটা গ্রাম ঢোক-মুরীদপুরের কাছে ওরা এসে পড়েছে। মাথায় যত রাজ্যের চিন্তা, তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে পা ঘষ্টে ঘষ্টে চলা—সারারাত ওদের এইভাবে গেছে। কিন্তু ভোরের এই আলো-আঁধারিতে ওরা মনের শান্তি ফিরে পেল। হাওয়ায় দূর থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি লুকাটের গন্ধ। ঢোক-মুরীদপুরে লুকাটের বাগান আছে। সেই বাগানের মধ্যে আছে একটা ঝর্না। চাঁদের রং গোড়ায় ছিল কমলা, এখন তাতে পড়েছে হলুদের ছোপ। আকাশের গাঁদাফুল রঙে গোড়ায় হলুদের ছিটে ছিল, এখন তাও চাঁদের মতই ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আকাশ ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। আশেপাশে শুরু হয়েছে পাখিদের কিচিরমিচির।

'মুখ ধুয়ে নে, বন্তো!' তারপর জপ-জী মহারাজের পাঠ শেষ করে বেরিয়ে

পড়ল। সকালের সুষমা যেন মুহূর্তে হরনামসিংয়ের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনল।

বন্তো চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় যাবে? দিনভর কঁহাতক ঘোরা যাবে। যদি দুটো রুটি সেঁকে নিতে পারতাম তাহলে কোনো চিন্তা হত না। সারাদিন দিব্যি কোনো পাথরের ছায়ায় পড়ে থাকা যেত।'

সামনের গ্রামে পেঁছে কারো দরজায় কড়া নাড়া যেত। গৃহস্থের যদি দয়া হয় তাহলে একটু আশ্রয় দেবে। না দিলে গুরুমহারাজের মনে যা আছে তাই হবে।

'এই গ্রামে কেউ তোমার চেনা নেই?

হরনামসিং হাসল:

'যেখানে সবাই ছিল চেনা মানুষ সেখানেই কেউ আশ্রয় দিল না, মালপত্র লুট-পাট করে নিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। এখানেই বা চেনা লোকের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি। ওখানে তো একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হয়েছিলাম...।'

ভোরের কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর ওরা চলতে লাগল। গোড়ায় এল গাছের একটা ঝোপ। তারপর সেগুন আর সিসু। ঝোপের বাইরে একটা ছোট গোরস্থান। ভাঙাচোরা কবর, কোনোটা ছোট কোনোটা বড়। তার একদিকে একটা পীরের দরগাও আছে। তার ওপর টিমটিম করা পিদিম আর তাতে লটকানো সবুজ ঝান্ডা দেখে তা বোঝা যায়। তারপর চাষের ক্ষেত। গম পেকে গেছে, শিগ্গিরই কেটে নেওয়া হবে। এরপর সপাট ছাদওয়ালা একটা মাটির বাড়ির সামনে গরু-মোষ বাঁধা। কোথাও কোথাও মুরগীর দল তাদের ছানা নিয়ে খুদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'বন্তো, এরা যদি মারতে আসে তাহলে আমি আগে তোকে খতম করব, তারপর নিজেকে। প্রাণ থাকতে আমি তোকে আর কারো হাতে পড়তে দেব না।'

এই সময় তারা গ্রামটা পেরিয়ে এসে প্রথম যে বাড়িটা পেল তার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ ছিল। রংচটা মোটা কাঠের দরজা। কার বাড়ি, ভেতরে কারা থাকে কে জানে! হরনামসিং হাত তুলল, এক মুহূর্ত ওর হাত থমকে রইল। তারপর দরজায় ঠকঠক শব্দ করল।

পনেরো

গুরুদ্বার লোকে লোকারণ্য। সবাই বিভোর হয়ে দুলছে। সেটা ছিল এক আশ্চর্য সময়। কথক গান গাইছিলেন: 'তুম বিন কোন্ মেরে গোসাঁই—'

জমায়েতে সকলের হাতজোড় করা, চোখ বন্ধ আর আস্তে মাথাগুলো নড়ছে। কেউ কেউ হাতে হাত ঠুকে তাল দিচ্ছিল। এই আত্মবলিদানের আওয়াজ শত শত বছরের দূরত্ব পেরিয়ে এখানে ধ্বনিত হচ্ছিল। তিনশ বছর আগেও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার আগে এই রকমের গীত গাওয়া হত। আত্মোৎসর্গের চিন্তায়

ওতপ্রোত হয়ে এরা আর সব কিছু ভুলে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। এই বিশেষ ক্ষণে এদের আত্মা পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। এরা যেন দূরে অতীতে ফিরে গিয়েছে। তুরুকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় আবার এসে গেছে। জাতির সামনে নতুন করে সংকট দেখা দিয়েছে। এসেছেও সেই তুরুকদের তরফ থেকেই। এদের চেতনা শত শত বছর আগেকার আবহাওয়ায় যেন নিশ্বাস নিচ্ছে। শত্রুসেনা ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আসবে এখনও জানা নেই। শত্রুরা রণধ্বনি দিতে দিতে বাইরে থেকে ঢুকবে, না গ্রামের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে, এখনও সেটা স্পষ্ট নয়। শত্রুকে বিশ্বাস নেই, তাই জমায়েতের প্রত্যেকটি সিংহপুরুষ হাতের চেটোয় মাথায় রেখে বসে আছে।

গুরুদ্বারের ভেতরে আলো এসে পড়ছিল পেছনের জানলার লাল, সবুজ আর হলুদ রঙের শার্সি ভেদ করে। কাঠের চারটে খুঁটির মাঝখানে চৌকির ওপর গুরুগ্রন্থ সাহেব রাখা। আর চৌকির আশপাশে পিতলের কাঠগড়া। চৌকির ওপর লাল রঙের রেশমি কাপড়ের ঢাকা, তাতে সোনালি ঝালর। কাপড়ের ঢাকার একটা মুখ নিচের মেঝেতে পাতা সাদা চাদরে গিয়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় চৌকির সামনে মেঝের ওপর সিকি, দোআনি, একআনা ছিটিয়ে পড়ে আছে। একদিকে স্তূপাকার আটা।

গুরুদ্বারের প্রবেশদ্বারের বাঁদিকে মেয়েরা বসে ছিল। সকলেরই মুখ আর মাথা দোপাট্টায় জড়ানো। সকলেরই মুখ উজ্জ্বল। সকলেরই চোখে আত্মবলিদানের জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। কোনো কোনো মহিলার কোমরে কটারি ঝোলানো। প্রত্যেক নারীপুরুষের প্রতি রোমকূপে এই কথাই অনুভূত হচ্ছিল যে শিখ ইতিহাসের দীর্ঘ শিকলে যেন সেও একটি গ্রন্থী। সেও যেন তার পূর্বপুরুষের মতো আত্ম-বলিদানের ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনের লম্বা বারান্দায় আর গ্রন্থীর কুঠুরির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করা হচ্ছিল। গ্রামের সাতজন গুরুসিংয়ের কাছে দো-নলা বন্দুক আর পাঁচ বাক্স কার্তুজ ছিল। জাঠেদার বিষনসিং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করছিল। গত যুদ্ধে বিষনসিং বর্মায় লড়াই করেছিল। আর সে চাইছিল তেমনি রণকৌশল গ্রামের মুসলমানদের ওপরও চালাতে। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পেয়েই সে বাড়ি গিয়ে খাঁকি জামা পরে এসেছিল। সেই জামায় ইংরেজ সরকারের তিনটে তকমা আর নানা রঙিন ফিতে লাগানো ছিল। জামা কোঁচকানো মোচকানো ছিল। তখন ইস্ত্রি করার সময় ছিল না। দুটো বন্দুক নিয়ে একদল গলির বাঁদিকের মোড়ে একটা বাড়িতে মোতায়েন ছিল। আরো দুটো বন্দুক নিয়ে ছিল গলির ডানদিকের মাথায়। শেষ পর্যন্ত ডানদিকের দলটা ফালতু বলে মনে হল। কেননা সেই বাড়ির সর্দার হরিসিং নিজের প্রতিবেশীদের ওপর গুলি চালাতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। বাকি তিনটে বন্দুক রাখা হয়েছিল গুরুদ্বারের ছাদে। আর বিষনসিং নিজে সেখানে সারাক্ষণ ছাদে চেয়ার পেতে বসে রইল। বন্দুকগুলোর ব্যবস্থা এইভাবেই যা হল। বাকি অস্ত্র বলতে যেমন, বল্লম সড়কি তলোয়ার লাঠি ইত্যাদি। গুরুদ্বারের পেছনের দেওয়ালে এইসব অস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। নানারঙের মখমলের

খাপে ভরা তলোয়ার একের পর এক দেয়ালের গায়ে সাজানো ছিল। জানলা দিয়ে রোদ এসে সোজা তার ওপর পড়ছিল। তাতে জিনিসগুলো খুব জমকালো দেখাচ্ছিল। বল্লম আর বর্শার ফলায় রোদ পড়ে চিকচিক করছিল। কয়েকজন নিহাং-শিখের কাছ থেকে কয়েকটা ঢালও পাওয়া গিয়েছিল। দুজন নিহাং-সিং ছাদের ওপর পাহারা দিচ্ছিল। দুজনেরই হাতে নিজের নিজের বল্লম ছিল। দুজনের গায়েই নিজের নিজের জামা। নীল আলখাল্লা, নীল পাগড়ি আর পাগড়ির ওপব লোহার চক্র আর হলুদ কোমরবন্ধ। দুজনেই বুক টান কবে হাতের বল্লম তুলে ধরে ছাদের দু মাথায় দাঁড়িয়ে দূরে নজর রাখছিল। শত্রুসেনারা কোন্ দিক থেকে ছুটে আসবে কে জানে!

'নিহাং-সিংজী, বল্লমের মুখ নিচে কবো। রোদ্দুরে বল্লমের ফলা চকচক করে। শত্রুরা দূরে থেকে বুঝে ফেলবে।' বিষনসিং একবার তাদের বুঝিয়ে বলতে তারা চটে গেল।

'নিহাং-সিংয়ের বল্লম কখনো মুখ নিচু করে না।' এই বলে সে ঠিক তেমনি ভাবেই আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহাং-সিংয়ের চোখের সামনে পুরনো দিনের সেই লড়াইয়ের ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শত্রুসেনারা পাঁয়তারা কষত, তাদের তলোয়ার ঝকমক করত, ঘোড়া চিঁহি চিঁহি করত, নাকাড়া বাজত, আর শঙ্খধ্বনি হত। এইসব কল্পনা করতে করতে তার মনে শিখের সাহসের বান ডাকল।

দুজন নিহাং নিচে গুরুদ্বারের ঢোকার রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল। দুজনের হাতেই বল্লম। দুজনেই মিলিটারি মেজাজে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনের গোঁফেই তা দেওয়া ছিল। আর নীল আলখাল্লার ওপর হলুদ কোমরবন্ধ লাগানো। পুরনো যুগে খালসা হলদে আলখাল্লা পরে যুদ্ধে নেমেছিলেন। এই আবহাওয়ায় সবারই চেষ্টা ছিল যতদূর সম্ভব এমনকি নিজেদের পোশাকেও সেই অখণ্ড ঐতিহ্যের কোনো না কোনো চিহ্ন থাকে যা দিয়ে নিজেদের অতীতের সঙ্গে তারা গভীরভাবে নিজেদের যুক্ত করতে পারে।

বিষণসিং মনিহারিওয়ালার ওপর খালসা লঙ্গরের দায়িত্ব ছিল। সেও একটা হলদে রেশমী রুমাল তার পাগড়িতে গুঁজে রেখেছিল, বসন্তপঞ্চমীর মেলার পর ছেলের মাথা থেকে এই হলদে রুমালটা খুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখেছিল। আজ হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে এই রুমালটা পেয়ে গিয়েছিল। জমায়েতের কারো কারো কোমরবন্ধ বাঁধা ছিল। তবে বেশির ভাগ লোকেরই পরনে ছিল সালোয়ার কামিজ। এমনকি সর্দার বিষনসিংও তকমা লাগানো খাঁকি জামার নিচে পাজামা পরেছিল। কিন্তু পোশাকের দিকে কারো দৃষ্টি দেওয়ার অবসর ছিল না। মনের মধ্যে তখন বয়ে চলেছে বলিদনের ভাবনার ঢেউ। আর সে সময় পোশাক আর উর্দির দিকে যেটুকু নজর তা সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের গভীর চেতনার সঙ্গে শুধু নিজেদের মেলাবার জন্যে।

গুরুদ্বারের মধ্যেটা জলভরা মেঘের মতন থমথম করছে। কীর্তনের সুরে সবারই মাথা দুলছিল। সকলের মনেই সেই এক ভাবনা, যা দূর অতীতের সঙ্গে একসুরে

বাঁধা—বলিদানের চেতনা, মুসলমান শত্রু, ঢাল তলোয়ার, গুরুর প্রসাদ, অখণ্ড একতা। চেতনায় যেটা ছিল না, সেটা হল ইংরেজ। গঞ্জের মাইল পঞ্চাশেক দূরে ইংরেজদের ছিল এদেশে সবচেয়ে বড় ছাউনি। সেই শিবির ওদের চেতনার মধ্যে ছিল না। ছিল না শহর আর নানান প্রান্তে থাকা ইংরেজ অফিসারকুল। যেন সারা দেশে ইংরেজ বলে কারো অস্তিত্বই নেই। তাদের চেতনায় শুধু অস্তিত্ব ছিল তুরুকদের, অস্তিত্ব ছিল খালসাদের, আর আগুয়ান যোদ্ধাদের। অস্তিত্ব ছিল আত্মোৎসর্গের সেই মহাযজ্ঞের—যেখানে তারা প্রত্যেকেই নিজের প্রাণ আহুতি দেবার জন্যে তৈরি।

গোলাগুলির ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল গুরুদ্বারের পেছনের দিক থেকে। সেখানে সবুজ গাড়িবারান্দাওয়ালা শেখদের বাড়িতে গঞ্জের মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র জমা করছিল। শেখদের বাড়িতেও একই ধরনের ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছিল: এখানেও গ্রামবাসী সব মুসলমান—কিষাণ, তেলী, রুটিওয়ালা—সবাই ধর্মযোদ্ধা বনে গেছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে তারা তৈরি হচ্ছে, চোখ তাদের রক্তবর্ণ আর মনের মধ্যে বইছে কোরানো তুফান। গুরুদ্বারের ঠিক সামনে গলির ওপারে শুধু শিখদেরই সারি সারি দোকান। আর দোকানগুলোর পেছনে খাড়া ঢাল সোজা নদীতে নেমে গেছে। নদীর ওপরে লুকাট ফলের মস্ত বাগান। এই কারণে সামনে থেকে কোনো বেটার সাধ্য নেই আক্রমণ করে। যদি কেউ করেও, তাহলে ছাদে দাঁড়ানো বিষণসিংয়ের দলের বন্দুকধারী লোকেরা তাদের খতম করবে।

বাঁ-হাতের গলির মাথায় কয়েক ঘর মুসলমান থাকত। তার পেছনে খালসা ইস্কুল। তারপরেই চাষের ক্ষেত শুরু। গলির মোড় থেকে ডান হাতেও পুরো মুসলমান মহল্লার শুরু। কিন্তু এখানেও একটা দলকে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে।

গুরুদ্বারের পেছনে দুটো গলি পরে শেখ গোলাম রসুলের উঁচু দোতলা বাড়ি। গুজব, ঐ বাড়িটাকে মুসলমানরা তাদের কেল্লা বানিয়েছে। সেখানেই তারা অস্ত্রশস্ত্র জমা করেছে। গাড়িবারান্দার পেছনের সব দরজাই বন্ধ। তার ওপরে সবুজ জানলাওয়ালা চিলেকোঠাও বন্ধ। কাউকেই ছাদের ওপরে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাও এই ঘরটার ওপরেই সকলের নজর। তাদের ধারণা, এই এখান থেকেই প্রথম গুলি ছোঁড়া হবে।

এমনিতে গ্রামটা ভারি সুন্দর। শান্তির সময়ে এখানে কেউ এলে এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ভগবান যেন নিজের হাতে এই জায়গাটা গড়েছেন। ছোট একটা নদীর ধারে একটা ছোট পাহাড়ের কোলে ঘোড়ার খুরের মতন এই গ্রাম। নদীর নীল জলধারা পেরিয়ে লুকাট ফলের ঘন বন। সেখানে অনেক ঝর্না নেমে এসেছে। এখন লুকাট ফল পাকবার সময়। তোতার ঝাঁক গাছে গাছে এসে ভিড় করেছে। এই সময় নদীর জলেও যেন আকাশের গাঢ় নীল রং লাগে। মাটির রং লাল। গাঁয়ের বাইরে ক্ষেতের পর ক্ষেত দূরের

পাহাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়টা যেন এ জায়গায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারাক্ষণ পাহাড়ের রং বদলে যায়। কখনও হাল্কা নীল চাদরের মত, কখনও তার চেহারা তপ্ত তামার মত ঝলসে ওঠে। কখনও তার কাঁধে কাজল কালো মেঘ খেলা করে। কখনও তার গায়ে ছেয়ে থাকে শ্যামলিমা। এই পাহাড়ের আঁচলেও বিস্তর ঝর্না। আর বড় ঝাঁকড়া ইঞ্জির গাছ। এই প্রকৃতির কোলেই বংশানুক্রমে গ্রামের লোক ছোট থেকে বড় হয়েছে।

হঠাৎ গুরুদ্বারের ভেতরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সবার চোখ গিয়ে পড়ল দ্বারদেশে গ্রামপ্রধান সর্দার তেজাসিংয়ের ওপর। গুরুদ্বারের চাতালে তেজাসিং নতজানু হয়ে সামনে ঝুঁকে গুরুদ্বারের মেঝেতে মাথা ঠেকালেন। চাতালে রাখা তাঁর দুহাতের আঙুল কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

অনেকক্ষণ ধরে তেজাসিং মেঝেতে মাথা নুইয়ে থাকলেন। এমন কি তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। তেজাসিংজী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর দেহের প্রতি রোমকূপে পন্থের রক্ষার দৃঢ় সংকল্প।

তারপর তিনি উঠলেন, তাঁর হাতজোড় করা, ঘাড় নোয়ানো—সাদা দাড়িতে তাঁর বুক ঢাকা পড়েছে—তিনি এসে গুরুগ্রন্থ সাহেবের বেদীর সামনে প্রণাম জানাবার জন্যে মাথা নুইয়ে বসলেন। এখানেও অনেকক্ষণ ধরে তিনি মাথা নিচু করে থাকলেন। ওঁর মুখ টকটকে লাল। ওঁর চোখের জল টপটপ করে পড়ে সাদা চাদর ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

জমায়েতের সমস্ত লোক দমবন্ধ করে দেখছিল। সবারই তখন কণ্ঠাগত প্রাণ। তেজাসিং উঠে দাঁড়াতে গোটা সভাকক্ষে একটা ঢেউ খেলে গেল। উনি উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে খুঁটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। খুঁটির গায়ে একটা পুরনো তলোয়ার রাখা ছিল। তলোয়ার শক্ত করে ধরে তিনি সভাকক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। এটা ছিল তাঁর দাদামশায়ের তলোয়ার! তাঁর দাদামশাইয়ের বাবা ছিলেন মহারাজ রণজিৎ সিংয়ের দরবারের সভাসদ।

তিনি হাতে তলোয়ার নিতেই জমায়েতের সবার মধ্যে আত্মবলিদানের সংকল্পের জোয়ার উঠল। সকলের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়ানো তরুণ প্রীতমসিংয়ের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়াজ বেরিয়ে এল:

'যো বলে সো নিহাল!' গোটা জমায়েত সমস্বরে উত্তর দিল:

'সৎ সিরি অকা…ল।'

রণধ্বনির আওয়াজে গুরুদ্বারের সমস্ত দেয়াল কেঁপে উঠল। এমনিতে এ রকম আওয়াজ তোলার কারণ ছিল। কেননা সমস্ত শিখ জনতা যে গুরুদ্বারে এসে জমা হয়েছে এটা শত্রুরা জেনে যাক, সেটা জমায়েতের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে যার ওপর মানুষের কোনো হাত থাকে না। এক তীব্র অসহ্য মনোভাবকে একমাত্র রণধ্বনি দিয়েই ব্যক্ত করা যেত।

বুড়ো হাতে তলোয়ার মুঠো করে ধরে তলোয়ারটা গ্রামপ্রধান দুই চোখে ঠেকালেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাসুদ্ধ লোক হিস্ হিস্ করে উঠল। দ্বারদেশে দাঁড়ানো

নিহাংয়ের মাথা ডাইনে বাঁয়ে হেলতে দুলতে লাগল। সেই সঙ্গে আরও শয়ে শয়ে মাথা।

'আজ আবার খালসা পন্থের গুরুর সিংহদের রক্তের দরকার।' কাঁপা কাঁপা ভাবোদ্বেলিত গলায় তিনি বলতে লাগলেন :

'আমাদের অগ্নিপরীক্ষার দিন এসে গেছে। এসে গেছে বিচারের দিন। এক্ষেত্রে মহারাজের একটাই নির্দেশ—কোরবানি ! কোরবানি ! কোরবানি !'

তেজাসিংয়ের মাথায় তখন ধ্বংসের সোনালী ধূলিঝড়। এই ছিল সেই মত্ততা, এই ছিল চলতি হাওয়া—সমস্ত চেতনা একটি কথায় এসে কেন্দ্রীভূত হল। সেই কথা—কোরবানি !

'আরদাস পড়ো, গুরুর সিংহেরা ! গুরুবাণী পড়ো !'

জমায়েতের সবাই উঠে দাঁড়ালো। সবাই জোড়হাত। সকলেরই মাথা নোয়ানো। সবার কণ্ঠ মুখরিত। গুরুদ্বারে গুরুবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। অনেকক্ষণ ধরে আরদাস পাঠ চলল। শেষ বাক্যে এসে কণ্ঠস্বর আরো উচ্চগ্রামে উঠল ঃ

'রাজ করেগা খালসা, বাকী রহে না কো…'

সেই আওয়াজ সারা গুরুদ্বারের বায়ুমণ্ডলে যেন ঢেউ খেলিয়ে দিল।

আরদাস পাঠ তখনও শেষ হয় নি। এমন সময় নিহাং-সিং হাত ওপরে তুলে গলার শির ফুলিয়ে চোখ বন্ধ করে তীক্ষ্ণ আওয়াজে উঁচু গলায় ফের আওয়াজ তুলল :

'যো বোলে সো নিহাল…'

জবাবে সভাসুদ্ধ লোক হাত উঠিয়ে জোরসে বুকে দম ভরে নিয়ে বলে উঠল :

'সং সিরি অকা…ল !'

গলায় গলা মিলল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একতা আর আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আরও জোরালো হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময় বাইরে কিছু দূরে গগনভেদী আওয়াজ শোনা গেল ঃ

'নারা-এ-তকবীর ! আর তার জবাব এল।

'আল্লা-হো-আকবর !'

'নারা-এ-তকবীর !'

'আল্লা-হো-আকবর !'

দ্বারদেশে প্রহরারত নিহাং-সিং মুঠো-করা হাত কাঁধের ওপর উঁচিয়ে আওয়াজ তুলতে যাচ্ছিল, তাকে তেজাসিং থামিয়ে দিলেন।

'ব্যস্, ব্যস্। যথেষ্ট হয়েছে ! শত্রুরা জেনে গেছে…।'

এবার মুসলমানদের পাল্টা রণধ্বনিতে জমায়েতে কিছুটা বাস্তববোধ ফিরে এল।

'আমরা চাই না শত্রুরা আমাদের কী শক্তি তা টের পেয়ে যাক। গুরুদ্বারে শিখেরা সকলে এসে একজোট হয়েছে, এটাও তাদের আমরা জানতে দিতে চাই না। এটা হল নীতির কথা।'

এরপর জমায়েতের সবাইকে অবস্থার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন : 'আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই জেলার সর্বোচ্চ হাকিম ডেপুটি কমিশনার সাহেব বাহাদুরের কাছে নিবেদন জানিয়ে বলতে যে, মুসলমানেরা এখানে সাংঘাতিক বজ্জাতি শুরু করে দিয়েছে। রিচার্ড সাহেব আমার পরিচিত। উনি খুব মুনসেফী মেজাজের ভারি বিচক্ষণ সজ্জন লোক। আমরা আমাদের বক্তব্য জেলার সবচেয়ে বড় হাকিমের কাছে পেঁছে দেব—এর বেশি আমরা কিছু করতে পারি না। রকম রকম খবর আমাদের কাছে আসছে। আমরা জানতে পেরেছি রহিম তেলীর বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হচ্ছে। আমরা এও জেনেছি যে, একটা গাঢ় নীল রঙের মোটরগাড়ি দুপুর নাগাদ শহরের দিক থেকে এসেছিল। গঞ্জের বাইরে ফজলদীন স্কুলমাস্টারের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। কিছু মালপত্তর গাড়ি থেকে বার করে ফজলদীনকে দেওয়া হয়। এরপর সোজা সামনের দিকে বেরিয়ে গিয়ে সেই গাড়ি আরও কয়েক জায়গায় দাঁড়ায়। আরও জানা গেছে যে, এখানকার মুসলমানেরা মুরীদপুরের মুসলমানদের খবর দিয়েছে তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে চলে আসে। শেখ গোলাম রসুল আর স্থানীয় অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা বলতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করা যায় না…।'

'মিথ্যে কথা বলছেন। আপনি তার কোনো চেষ্টাই করেন নি।'

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে একজনের গলা শোনা গেল। শুনে সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত বড় কথাটা বলল—কে লোকটা? গুরুদ্বারে জমায়েত লোকেরা আড়চোখে তাকাল।

এক রোগাপটকা ছোকরা খাড়া হয়ে দাঁড়াল : 'এটা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানদের ওপর আমরা খাপ্পা হচ্ছি—তেমনি ওরাও আমাদের বিরুদ্ধে খেপে যাচ্ছে। কতকগুলো মিথ্যে গুজবে কান দিয়ে আমরা পরস্পরের ওপর রেগে গিয়ে মারমুখো হচ্ছি। আমাদের দিক থেকে আসুন আমরা পুরোদমে চেষ্টা করি গাঁয়ের মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে। আসুন আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করি যাতে গাঁয়ে দাঙ্গা না হয়।'

'বসে পড়ো। বসে পড়ো।'

'আমাদের মধ্যে বসে কে এই বেইমান?'

'আমি বসব না। আমি এখনও বলব—ভাইসব, শেখ গোলাম রসুল আছেন, গ্রামের অন্যান্য ঠাণ্ডা মাথার মুসলমানেরা আছেন—আসুন আমরা আলোচনায় বসি। যদি তাতে শেখ গোলাম রসুলের মত নাও থাকে, অন্যান্য বিবেচক মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে আসুন আমরা গ্রামে শান্তি বজায় রাখি। মানলাম ওরা মুরীদপুর থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনছে—কিন্তু আমরাও কি কহুটা থেকে অস্ত্র জোটানোর চেষ্টা করছি না? মারামারি কাটাকাটি হোক, কেউই তা চায় না। গঞ্জের শিখ আর মুসলমানেরা একসঙ্গে বসে গ্রামের শান্তি বজায় রাখুক। আমি আজই সকালে গোলাম রসুল এবং আরও কয়েকজন মুসলমানের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি।'

'তুমি ওখানে কী করতে গিয়েছিলে? ওরা কে হয় তোমার?'

'গোলাম রসুল কি তোর বাপ?'

'আমাকে বলতে দাও। কেউ যদি নষ্টামি করে তো করবে বাইরের লোক। আমাদের সব রকমে চেষ্টা করতে হবে গ্রামে যাতে বাইরের লোক না ঢোকে।. এর একটাই উপায়। তা হল, এখানকার শান্তিপ্রিয় শিখ আর মুসলমানদের এক হয়ে বাইরের লোকদের রোখা। ওরা আমাদের ভয়ে অস্ত্র যোগাড় করছে আর আমরা সেই জিনিসই করছি ওদের ভয়ে…'

'মুসলমানদের কোনো বিশ্বাস নেই। বসে পড়ো।'

'ওরা বলে, শিখদের বিশ্বাস নেই।'

'বসে পড়ো!' উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে সোহনসিংকে সম্বোধন করে বলে উঠল একজন বয়স্ক লোক: 'তুই কে রে? কথার মাঝখানে কথা বলিস? এখনও গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তার আবার পাকা পাকা কথা?'

তিন চারজন সরদার এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। তারা বলল, 'তোমরা জানো, শহরের সব জীমণ্ডীতে ওরা আগুন লাগিয়েছে… !'

'এসব ইংরেজদের বদমায়েশি।' সোহনসিংয়ের গলা আরও উঁচুতে চড়ল: 'আমাদের স্বার্থ এইটুকুই যে, দাঙ্গা যেন না বাধে। শোনো ভাইসব, শহর থেকে আজ একটাও বাস আসেনি। হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই গোটা তল্লাট মুসলমানদের। গ্রামের বাইরে থেকে লোক এসে যদি হামলা করে, তাহলে তোমরা কতটা তার মহড়া নিতে পারবে? সে কথাটাও মনে রেখো। কহুটা থেকে তোমরা কতটা সাহায্য পাবে? তোমাদের এত কিসের বারফাট্টাই?' এরপর কিছুক্ষণ গুরুদ্বারে কারো টু শব্দ শোনা গেল না।

তারপরই তেজাসিংজী গুরুদ্বারের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁপা গলায় বললেন, 'আমাদেরই ঘরের এক ছেলেকে বিপথগামী হয়ে এরকম কথা বলতে দেখে আমার মন ভেঙে যাচ্ছে। সে আজ তার পন্থের বিরুদ্ধে কথা বলছে। আমরা নাকি দাঙ্গা চাই? আমি নিজে শেখ গোলাম রসুলকে গিয়ে বলেছি। নিজের বুক ছুঁয়ে সে বলেছে, এ গ্রামে কিছু হবে না। আর যেই না আমি পেছন ফিরেছি, অমনি ওরা খালসা স্কুলে গিয়ে চড়াও হয়েছে। ওখানে ওরা পণ্ডিত চাপরাসিকে মেরে ফেলেছে আর তার বিবিকে মুসলমানেরা ভাগিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এসব খবর তো এখনও আমি আপনাদের দিইনি। কেননা আমি চাইনি এসব বলে আপনাদের উত্তেজিত করতে।' সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে আর রাগে গুরুদ্বার আন্দোলিত হয়ে উঠল।

'আপনাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।' ফের সোহনসিং বলতে উঠল: খালসা স্কুলে হামলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রামের মুসলমানেরা তা করে নি। ঢোক-ইলাহিবক্স থেকে কিছু গুণ্ডা এসেছিল। কিন্তু শহর থেকে আসা আমাদের সহকর্মী মীরদাদ সেই সময় সেখানে গিয়ে পড়ে। মীরদাদের সঙ্গে ছিল এ গ্রামের আরও দু-একটি ছেলে। তারাই মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা সামাল দেয়। চাপরাসি চোট

পেয়েছে। মরে টরেনি। ওর বউকেও ভাগিয়ে নিয়ে যায় নি। ওরা দুজনেই ইস্কুলে মজুত আছে।

এক সরদার জিজ্ঞেস করল, 'এই মীরদাদটি কে ?'

বলে সেই রোগাপাতলা সোহনসিংয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'একে আমি কফিখানায় ঐ মীরদাদের সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছি। ওরা দুজনে সেখানে বসে কী অত গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করে জানি না। মোছলার জাত যখন আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে, তখন আমাদেরই ঘরের ছেলে সেই মোছলাদেরই সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধছে। আমাদের কী জ্ঞান দিচ্ছ? মোছলাদের গিয়ে বোঝাও। শিখেরা কি আজ পর্যন্ত একজনকেও মেরেছে? কারো ঘরে আগুন দিয়েছে? কী এমন লোক, ও এসেছে আমাদের উপদেশ দিতে! হুঃ!'

হাওয়া ফের পাল্টে গেল। দরজায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ানো নিহাং-সিং কয়েক কদম এগিয়ে এসে রোগাপটকা সরদারের ঘাড় সই করে এক রদ্দা মারল।

'ব্যস্। ব্যস্। মারধর নয়। মারধর নয়।'

পাশে বসে থাকা কয়েকজন উঠে পড়ে নিহাং-সিংকে আটকাল।

যে সময়ে গুরুদ্বারে এইসব কাণ্ড চলছিল, ঠিক তখন মুসলমান মহল্লায় মীরদাদের প্রাণ যাওয়ার দাখিল।

পাশাপাশি ছিল তিন কসাইয়ের মাংসের দোকান। এই সময় দোকানগুলো বন্ধ ছিল। চাতালে বসে মীরদাদের সঙ্গে কয়েকজনের লেগে গিয়েছিল।

মীরদাদ হাত ঝটকা মেরে বলল, 'ওহে, এটা বোঝো। হিন্দুমুসলমানশিখ মিলে গেলে গড়ে উঠবে আমাদের সংহতি। ইংরেজের অবস্থা তখন হবে কাহিল। আর যদি আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করি, তাহলে এদেশে ইংরেজের মুঠো আরও শক্ত হবে।'

সেই একঘেয়ে তর্ক। শুনে শুনে এদের কান পচে গেছে। কিন্তু আজ অথৈ জলে পড়ে গিয়ে এসব আর এদের মনে দাগ কাটছে না।

মোটা কসাই বলল, 'আ বে যা, যা! মাথায় বাদাম তেল মালিশ কর্ গা! ইংরেজ এর মধ্যে কেন আসছে! আমাদের হিন্দুমুসলমানের শত্রুতা অনেক পুরনো দিন থেকে চলে আসছে। কাফের হল কাফের। যতদিন না দীন-ইমানে তাদের বিশ্বাস আসছে। ততদিন তারা আমাদের শত্রু। কাফের মারা পুণ্যকাজ।'

'আ বে, শোন্ চাচা।' মীরদাদ বলে, 'এ কার রাজ ?'

'কার আবার ? ইংরেজের! নয়ত কার ?'

'ফৌজ কার ?'

কসাই বলে, 'ইংরেজেরই তো।'

'ওরা যদি লড়াই রুখতেই চায় তো রোখে না কেন ?'

'ইচ্ছে করলেই পারে। কিন্তু ওরা আমাদের ধর্মীয় মামলায় ফাঁসতে চায় না। ওদের ন্যায় অন্যায় বোধ খুব চড়া।'

'ওদের মতলব হল, আমরা এ ওর মুণ্ডু কাটি, আর ওরা ধর্মের বাহানা তুলে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। কিন্তু এ কেমন হাকিম!'

এতে মোটা কসাই চটে গেল। বলল, 'শোন্ আ বে, মীরদাদ! এ লড়াই হিন্দুমুসলমানে। এর মধ্যে ইংরেজের স্থান নেই। এখানে তুই বেশি বকবক করিস না। তুই যদি বাপের ব্যাটা হোস যা, গুরুদ্বারে যা—গিয়ে ওদের বোঝা যেন অস্ত্রশস্ত্র জড়ো না করে। গিয়ে ওদের রাজী করা, ওরা যদি মেনে নেয় তাহলে গুরুদ্বারে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে ওরা যেন যে যার বাড়িতে চলে যায়। আমরাও লড়তে চাই না। যা, যদি মরদের ব্যাটা হোস, ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বল্—এখানে বকে বকে আমাদের মাথাগুলো খাস্ নে।'

যেদিন থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, সেদিন থেকেই জায়গায় জায়গায়, রুটিওয়ালার দোকানে, গণ্ডাসিংহের চা-খানায়, শেখের আড্ডায় কুয়োঝালার জায়গায়—যেখানেই দু-পাঁচজন লোক এসে জড়ো হয়—মীরদাদ সেখানেই বসে আলোচনা জুড়ে দেয়। লোকে ওর কথা শোনে, কেননা ওর পেটে বিদ্যে আছে, লাহোর-বোম্বাই-মাদ্রাজ সব ওর দেখা। ও এখন শহর থেকে এসে ছোট ভাই আল্লাদাদের কাছে আছে। কিন্তু গঞ্জে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর বাইরে থেকে উল্টোপাল্টা খবর আসার পর থেকে মীরদাদ কেমন যেন একলা পড়ে গেছে। আরও যে কারণে ওর কথায় লোকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না, সেটা হল ওর কোনো নিজের জমি নেই—না জমি, না বাড়ি। রুটির দোকানের বাইরে মীরদাদ খাটিয়া পেতে শোয়। একটা ইস্কুল খোলার ইচ্ছে নিয়ে এখানে সে এসেছিল। গ্রামের লোকে ধরে নিয়েছিল ইস্কুলটা হলে মীরদাদের তবু যা হোক রোজগারের কিছু একটা হিল্লে হবে। মীরদাদ একেবারেই তা ভাবেনি। সে দেখছিল ইস্কুলটা হলে গঞ্জের লোকদের একসঙ্গে বসাবার একটা জায়গা হবে। সবাই সেখানে যাওয়া আসা করবে, এসে বসবে, তাদের কাগজ পড়ে শোনানো হবে, নানান সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা হবে, তাতে অনেক কিছু ওরা জানতে বুঝতে পারবে। এই সময়ে দেবদত্তই ওকে পাঠিয়েছিল যাতে গঞ্জে গেড়ে বসে মীরদাদ দাঙ্গা ঠেকাতে পারে। হরবংসসিংকেও এই একই কাজে পাঠানো হয়েছিল। ওরা দুজনে একই পার্টির কর্মী। দুজনেরই কেউ না কেউ এখানে থাকে। কিন্তু দুজনের কারো কথাতেই তেমন চিঁড়ে ভিজছিল না।

এই সময় কসাইদের এই দোকানগুলোর কাছেই একটা ঘটনা ঘটে। দোকানগুলো থেকে পিছিয়ে এসে গলির একটা অন্ধকার মতো অংশ। সেখানে চটের পর্দার আড়ালে বসে একটা লোক এদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনছিল। গুরুদ্বারের চর হিসেবে তাকে পাঠানো হয়েছিল। আশপাশে সব মুসলমানদের বাড়ি। তার মাঝখানে থাকত বিধবা বুড়ি চন্নন দেই। তার বাড়িতেই গোপালসিং চটের পর্দার পেছনে এসে বসেছিল। পেছনের ঘরের দেয়াল টপ্‌কে এখানে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসে বসেছিল যে, মুসলমানেরা কী সব ফন্দিফিকির আঁটছে তার যেন সে হদিশ পেয়ে যায়। মীরদাদ আর কসাইদের মধ্যে কথা হচ্ছে দেখে গোপালসিং একবার

চটের পর্দা তুলে চুপিসাড়ে সরে গিয়ে লাগাও বাড়ির চাতালের পেছনে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে পড়ল। এখান থেকে কথাবার্তাগুলো আরও পরিষ্কার শোনা যায়। ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ ছিল। গলিটা ছিল অন্ধকার। গোপালসিং ভাবল. কারো পায়ের শব্দ পেলেই ঝট্ করে পর্দার আড়ালে সেই চলে যাবে। কিন্তু তার সুযোগ সে পেল না। যখন কান খাড়া করে কথাবার্তাগুলো শুনছে, তখন হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ হল। গোপালসিং ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, গলির আলো-আঁধারিতে পাশের বাড়ি থেকে একজন লোক চাতালের দুটো ধাপ নেমে এসে সটান তার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখে ভয়ে সরদারজীর হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অন্ধকারে লোকটাকে আসতে দেখে ওর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। লোকটি চাতাল থেকে নেমে আসছিল। তার দুটো হাত কামিজের নিচে। বোধহয় এখুনি পিস্তল বা ছোরা বার করবে। চর গোপালসিং হুটোপাটি ক'রে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার মুখ দিয়ে চিঁ চিঁ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। তখন ওর মাথায় উঠেছে চটের পর্দার আড়াল—পড়ি-মরি করে সে সোজা চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। এই তাড়াহুড়োতে সোজা সেই লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগল, যে লোকটা পিস্তল বার করার উপক্রম করছিল। আসলে ধাক্কা লাগার আগে ঐ লোকটা নিজের ইজেরের দড়ি খুলে নালাটার ধারে ইতিমধ্যেই বসে পড়েছিল। লোকটার ফোক্‌লা মুখ, ন্যাড়া মাথা আর না-থাকা মতো চোখ—কিছুর দিকেই চর গোপালসিংয়ের নজর পড়েনি। ধাক্কা খেয়ে নুরখান গলিতে ছিটকে পড়ল আর তার গলা দিয়ে একটা তীক্ষ্ন আর্তস্বর বেরিয়ে এল। 'মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল।'

এ সবই চোখের নিমেষে ঘটে গেল। এদিকে বুড়ো নুরখানের চিৎকার আর পলায়মান লোকের পদশব্দ শুনে কসাইয়ের দোকান থেকে দুজন লোক হাতে বল্লম উঁচিয়ে এক লাফে ছুটে এল। যে লোকটা পালাচ্ছিল, আশরফ কসাই সোজা তার পিছু নিয়ে তার দিকে লাঠি ছুঁড়ে মারল। চর গোপাল সিংয়ের গায়ে না লাগলেও ওর কাছাকাছি গিয়ে পড়তেই ভয়ে ওর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেও চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও! মেরে ফেলল গো!'

এই সময় আরও লোক গলির মধ্যে এসে পড়ল। বুড়ো নুরখান তখন নালার ধারে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাতে ধরা তখনও ইজেরের দড়ি। আর তখনও সে সমানে দোমড়াচ্ছে মোচড়াচ্ছে আর বলছে, 'মেরে ফেলল! মেরে ফেলল!'

গলি থেকে আশরফের গলা শোনা গেল, 'আগে যেয়ো না, ফিরে চলে এসো! এগিয়ো না!'

এই সময় মীরদাদ ভিড়ের ভেতর থেকে বার হয়ে এসে বুড়ো নুরখানকে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করছিল। তাই দেখে মোটা কসাই ক্ষিপ্ত হয়ে বলল. 'আ বে, মীরদাদের বাচ্চা! দেখলি তো? নুরকে ইংরেজ এসে মারল, না? চলে যা এখান থেকে! নইলে এই বলে দিচ্ছি, আমি তোকে আস্ত রাখব না। আমাকে তুই চিনিস্ না। যা, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।' মীরদাদকে একরকম ধাক্কা দিয়েই বার

করে দিতে দিতে বলল, 'না ঘরকা, না ঘাটকা। না এদিক, না ওদিক। শান্তি করতে এসেছে। আরে, কোথাকার কে তুই! নিজের মাও যাকে পোঁছে না, সে এসেছে আমাদের শেখাতে। পরের ঘাড়ে খায়, তার আবার কথা!'

গলির মাথায় এসে মীরদাদ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কসাই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওকে কড়কে দিল। 'যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে। হতচ্ছাড়া কোথাকার। এক চড়ে দাঁতের পাটি উড়িয়ে দেব। যা, গিয়ে নিজের বাপকে লেকচার শোনা।'

রোগাপটকা মীরদাদ ঘাড় নিচু করে চলতে আরম্ভ করল। গোড়ায় গোড়ায় কিছু লোক ওর কথা মন দিয়ে শুনত, ওর কথায় সায় দিত। তারা আর কেউ ওর কাছে ঘেঁষে না। আগে তো এই মোটা কসাইও হেসে হেসে ওর সঙ্গে কথা বলত। এখন সেও চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে।

পালাতে পালাতে গুরুদ্বারের কাছে এসেও চর গোপালসিংয়ের চ্যাঁচানি থামেনি। সন্ত্রস্ত লোকের মধ্যে আবার উত্তেজনার ঢেউ উঠল। লম্ফঝম্প করতে করতে লোকে বাইরে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ ধরে সে এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দুই নিহাং-সিংই তখন বাইরে—ছাদের নিহাংসিংও সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে। 'কী হল?' গুরুদ্বারের ভেতরে যারা ছিল, তারা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

দশ জন লোক গোপালসিংয়ের সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। না, কোথাও চোট লাগেনি। গোপালসিং হাঁফাচ্ছিল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টাতেও ও কিছু বোঝাতে পারল না ঠিক কী হয়েছে।

'মারবার জন্যে সোজা আমার দিকে ছুটে এসেছিল ··।'

তেজাসিংজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে?'

'বাবা নুরা।' গোপালসিংয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। যখন সে ছুট দেয় ঠিক সেই মুহূর্তে নুরখানকে সে চিনতে পেরেছিল।

'অন্ধ বাবা নুরা?'

'কী করে বলব? ওরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।'

'তারপর কী হল?'

'কসাই গলি থেকেও লোকজন বেরিয়ে এসেছিল। আমি পালাচ্ছি দেখে ওরা লাঠি ছুঁড়ে মারে।'

রাস্তায় লোকের ভিড় জমে যাচ্ছিল। একজন সরদারজী ভিড় সরাতে সরাতে বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। সিংহ-খালসা ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছে। শত্রুর ডেরা থেকে ফিরে এসেছে। বেঁচে গেছে এক চুলের জন্যে। ভেতরে যাও, জমায়েতে বসো।'

গোপালসিং একটু ধাতস্থ হলে তেজাসিংজী নিচু গলায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? কিছু শুনলে? ওদের কী প্ল্যান?'

'ওখানে তো মীরদাদই কেবল বকবক করে যাচ্ছিল। আর কারো কথা শুনতে দেয়? মোটা কসাই ওকে বলছিল: 'যা, এসব কথা গুরুদ্বারওয়ালাদের শোনা গে

যা। আমাদের কেন শোনাচ্ছিস? ওরা যদি যে যার ঘরে চলে যায়, আমরাও ঘরে ফিরে যাব…। ওরা এই সবই বলছিল।'

দরবার গুরুদ্বারে ফিরে এসেছে। কিন্তু গোপালসিংয়ের চিৎকার-চেঁচামেচিতে নতুন করে সবাই আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে সবার। কীর্তন চলতে থাকল। ঝাঁঝ, তবলা আর বাজনার আওয়াজ আরও জোর হল।

একজন গুরুদ্বারের মাঝখানে এসে সোহনসিংকে খুব তুড়ছিল: 'দেখলে? 'দেখলে তো, সরদার? খুব জোর প্রাণ নিয়ে ফিরেছে। মেয়েছেলারা তো আরেকটু হলে ওকে মেরেই ফেলেছিল। দেখলে তো? এতক্ষণ তো খুব উপদেশ ঝাড়ছিলে…।'

এরপর আরেক সরদারজী উঠে বলল, 'আমার প্রস্তাব, এই লোকটাকে নজরবন্দী করে রাখা হোক। ওকে অন্ধকূপে ভরে দাও। ওকে বিশ্বাস নেই। ও শত্রুর চর হতে পারে।'

এরপর নিহাং-সিং এগিয়ে এসে ওর ঘাড়ে আরও এক রদ্দা ঝাড়ল।

'ব্যস্, ব্যস্! মারধর নয়।'

'বোঝাতে চাইলে, যাও তোমার ঐ শেখ চাচাদের গিয়ে বোঝাও—যাদের সঙ্গে সমস্তক্ষণ তুমি ওঠাবসা করো। যাও, ভাগো এখান থেকে!' কীর্তন আবার চালু হয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে তখন। গুরুগ্রন্থ সাহেবের বেদীর ওপর ছাদের সঙ্গে লটকানো ফানুস-বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যাম্পের নিচে বসে ছিলেন তেজাসিংজী। আলোর রোশনাইতে তাঁর মাথার সাদা পাগড়ি, তার নিচে সাদা দোপাট্টা আর সাদা দাড়ি জ্বল জ্বল করছে। আলো এসে পড়েছে মেয়েদের ঝকঝকে মুখে। ভাবনায় উদ্বেলিত সব মুখ। তাদের চোখগুলোতে একাধে উৎকণ্ঠা, ভয়, অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের ছাপ। কোথাও কোথাও কোনো কোনো তরুণী চকিত দৃষ্টিতে গুরুদ্বারের এই অপরূপ দৃশ্য দেখে নিচ্ছিল। এই দলে বসে ছিল যশবীর —চা-ওয়ালা হরনামসিংয়ের মেয়ে। এ গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ি। বাপের কাছ থেকে যশবীর জন্মসূত্রে পেয়েছিল অটুট ধার্মিক প্রেরণা। যখন আরদাস গাওয়া হচ্ছিল, তখন ঐকতানের সঙ্গে যে গলাটা মিল ছিল না, সেটাই ছিল যশবীরের গলা। ফনফিনে গলায় চিলচিৎকার করে যশবীর অম্লানবদনে গেয়ে চলেছিল। একটা কৃপাণ কালো পট্টিতে বেঁধে সারাক্ষণ সে তার কোমরে ঝুলিয়ে রাখে। তার এই গলার স্বর জমায়েতের সবাই চেনে। যশবীরকে তারা গুরুকন্যা বলে ডাকে। যশবীরের গোলগাল খোলতাই মুখশ্রী যে কারো চোখে পড়বে। যশবীর নিজের হাতে গুরুদ্বারের সিঁড়িগুলো ধোয় মোছে। গুরুগ্রন্থসাহেবের ওপরকার রেশমী কাপড়ের ঢাকায় ছুঁচ-সুতোর যে বাহারী নক্সা, সেটা যশবীর কাউরের নিজের হাতে করা। ওর মাথায় একেক সময় একেকটা খেয়াল চাপে। কখনও উঠে সঙ্গতের লোকদের মাথায় হাওয়া করত, কখনও তাদের খাবার জল দিয়ে বেড়াত, কখনও সভাসুদ্ধ লোকের জুতো আগলাত আর তেমন ভাব এসে গেলে নিজের দোপাট্টার আঁচল

দিয়ে যার যার জুতো মুছে তাকে এগিয়ে দিত। ধৈর্যে কুলোলে যশবীর তাদের পাদস্পর্শ করে নিজে হাতে জুতো পরিয়ে দিত। সংকট শুরু হওয়া থেকে যশবীরা তেজাসিংজীর মুখারবিন্দের দিকে ঠায় চেয়ে রয়েছে, যেন অপেক্ষা করছে তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণীর জন্যে, প্রতি মুহূর্ত কান খাড়া করে আছে সেই দৈবাদেশের অপেক্ষায়। গুরুদ্বারে উপস্থিত সব নারীপুরুষেরই মনের তটে এই রকমের কিছু ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল।

এই সময় ছাদের ওপর মোতায়েন নিহাং-সিংয়ের নজরে এল গ্রামের প্রান্তে দিগন্তের কাছে এক ধুলো ওড়ার দৃশ্য। যেন এক ধূলিঝড়। ভালো করে তাকিয়ে দেখল সেই আঁধি ক্রমেই ধেয়ে আসছে। বিষনসিংকে সে-কথা বলতে সে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। হ্যাঁ, আঁধিই বটে। সত্যিই, ক্রমশ সেটা বড় হয়ে আসছে। গোড়ায় ওর নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু দেখতে দেখতে সেই সঙ্গে ক্ষীণ কটা আওয়াজও তার কানে এল। শুনে ওর টনক নড়ে গেল। সবাই ধরে নিয়েছিল যা কিছু গোলমাল তা গ্রামের ভেতর থেকেই হবে। অন্তেবাসী কালু মলঙ্গ, আশরফ কসাই আর নবী তেলী—এদেরই কাঠগোঁয়ার বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ যে দেখছি সত্যিই বাইরে থেকে দাঙ্গাবাজেরা আসছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর কানে ভেসে এল গম্ভীর চাপা ঢোলের আওয়াজ। দেখতে দেখতে অবস্থা হয়ে দাঁড়াল রীতিমত ভয়াবহ। ও দেখল এখুনি নিচে গিয়ে তেজাসিংজীকে খবরটা আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু এখানে মোতায়েন থেকে শত্রুর চালচলনের দিকে নজর রাখাটাও কম জরুরি নয়। সেইজন্যে বিষনসিং খবর দেওয়ার ভার দিল নিহাং-সিংকে।

নিহাং লাফ দিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে নিচে পেঁছুবার আগেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'তুরুকরা এসে গেছে! তুরুকরা এসে গেছে।'

গুরুদ্বারে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। ঠিক এই সময় স্পষ্ট শোনা গেল ঢোলের আওয়াজ।

তেজাসিংজী কিছুক্ষণের জন্যে থ হয়ে গেলেন। সত্যিই হামলা হবে উনি ভাবেননি। উনি ধরে নিয়েছিলেন যে, বড় জোর তেলীপাড়ার দিকে দু-একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে পারে। ভেবেছিলেন গঞ্জের সিংরা যদি উঠে দাঁড়ায় মুসলমানেরা হাত তুলতে সাহস পাবে না। শিখেরা দলে ভারী। তাদের অনেকের সঙ্গেই তাদের কাজ কারবারের সম্পর্ক। তাছাড়া শিখদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন, তাদের বন্দুক আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সব হিসেব উল্টে যাচ্ছে।

ঢোলের আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে। কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে 'ইয়া আলী' রণধ্বনি। সেই সময় পেছন থেকে আওয়াজ উঠল—

'আল্লা-হো-আকবর!'

মুহূর্তের জন্যে একটা চুপচাপ ভাব চারদিকে ছেয়ে ফেলেছিল। গুরুদ্বারের ভেতরে হঠাৎ উত্তেজনার ঢেউ আছড়ে পড়ল।

'জো বোলে…সো নিহাল !' শব্দে বাতাস ভরে গেল।

'গুরুর ভক্ত কোনো সিং যেন বাইরে না যায়! যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও।'

যশবীর কাউরের হাত তার কৃপাণের হাতলে গিয়ে ঠেকেছিল। সিংয়ের দল লাফ দিয়ে দিয়ে দেয়ালের গায়ে রাখা তলোয়ারগুলো উঠিয়ে নিচ্ছিল। জমায়েতের সবাই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

'তুরুক! তুরুকরা এসে গেছে! তুরুকরা এসে গেছে!' প্রত্যেকের মুখে এক কথাঃ 'তুরুক সেনারা এসে গেছে।'

যশবীর কাউর ভাববিহ্বল গলায় বলে উঠলঃ 'তুরুকরা এসে গেছে।' বলে নিজের মাথার উড়নি নামিয়ে গলায় বেঁধে নিল। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়াল।

ভাববিহ্বল গলায় সেও বলে উঠল, 'তুরুকরা এসে গেছে!'

মেয়েরা যে যার দোপাট্টা খুলে গলায় বেঁধে নিয়েছে। আর 'তুরুকরা এসে গেছে!' বলতে বলতে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়েছে। সিংরাও পরস্পরকে কোলাকুলি করে একইভাবে হেঁকে বলতে লাগলঃ

'যে যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও।'

সিংদের কয়েকজন চুল এলো করে দিয়ে খাপ থেকে তলোয়ার বার করে নিল।

'তুরুকরা এসে গেছে! তুরুকরা এসে গেছে।'

তিনটি কণ্ঠে আবার আওয়াজ উঠলঃ

'যো বোলে সো…নিহাল!'

আবার সারা গুরুদ্বার জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল।

'সৎ সিরি অকা…ল!

যুদ্ধ সমিতির সদস্য সরদার মঙ্গলসিং সুনার, প্রীতমসিং বজাজ আর ভগৎসিং পনসারি—এরা তিনজনই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে উঠে গেল, সেখানে তেজাসিং আর বিষণসিংয়ের সঙ্গে যুদ্ধনীতি নিয়ে আলোচনা হবে।

ঢোলকত্তাল বাজাতে বাজাতে তুরুকেরা ততক্ষণে গ্রামে পেঁছে গেছে। বোধহয় নিজেদের আগমনবার্তা জানাবার জন্যেই তারা ফাঁকা গুলির আওয়াজ করল। আকাশ মুখরিত করে রণধ্বনি উঠল:

'ইয়া আলী!'

'আল্লা-হো-আকবর!'

'সৎ সিরি অকা…ল!'

তখন কে একজন বলে উঠল যে, নদীর দিক দিয়ে ওরা গ্রামে ঢুকছে। তার মানে পেছন দিকের ঢালের ওপর দিয়ে এসে ওরা শিখদের ঘরবাড়ি লুট করবে, ঘরে আগুন দেবে—কারণ, এ সময়ে বাড়িগুলোতে থাকার মধ্যে আছে শুধু জনকয়েক বুড়োবুড়ি। ধর্মরক্ষার উত্তেজনায় ছেলেরা তাদের বাড়িতে একা রেখে চলে এসেছে। এই সুযোগে তাদের যথাসর্বস্ব অবাধে হাতিয়ে নেওয়া যাবে।

তখন সবে পড়ন্ত বেলা। অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়ে নদীর জল লাল হতে আরম্ভ করেছে। এই মুহূর্তে যে ঘরবাড়িগুলো বিপন্ন, বাঁদিকের গলির মাথায় সিংদের রণমহল থেকে তা অনেকখানি তফাতে।

এই সময়ে বলদেবসিংয়ের নিজের মার কথা মনে পড়ল। সেই যে সে মা-কে বাড়িতে একা রেখে বেরিয়েছে, তারপর আর সে মা-র কোনো খোঁজখবর নিতে পারে নি। ওখানে এখন তার মা-র প্রাণ যায় যায়। সঙ্গতের অনেকেরই এই ভেবে বুক দুর-দুর করছে যে, তাদের অসহায় বুড়ো মা-বাপদের এখন কী হবে!

বলদেবসিং আর থাকতে পারল না। মাথার চুল এলো করে দিল। পাজামা খুলে ফেলে খাপখোলা তলোয়ার মাথার ওপর নাচিয়ে গায়ে এইটুকু একটা ইজের আর ফতুয়া রেখে বলদেবসিং বাড়িমুখো ছুটল।

চেঁচিয়ে বলল, 'রক্তের বদলে রক্ত চাই!'

কিছু লোক চিৎকার করে ওকে ফিরে আসতে বলল। কিন্তু তখন সে নাগালের বাইরে চলে গেছে।

গলি দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ওর চিৎকার ভেসে ভেসে আসছিলঃ 'রক্তের বদলে রক্ত চাই!'

হাড়সর্বস্ব রোগা পাতলা বলদেবসিং যখন ছুটছিল ওর পা-দুটো দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছাগলের ঠ্যাং।

লোকে ভেবে পেল না বলদেবসিং কেন বাঁদিকের গলিতে গিয়ে ঢুকল। ও যদি ঢাল বারবার নামত তাহলে বোঝা যেত যে, দাঙ্গাবাজদের মহড়া নেবার জন্যে ও যাচ্ছে। ডান দিকে গেলে বোঝা যেত কসাইগলির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু বাঁ হাতে ওর মোড় নেবার উদ্দেশ্যটা কী?

একটু পরেই তাকে গুরুদ্বারের দিকে ফিরে আসতে দেখা গেল। তখনও হাতে তলোয়ার ধরে রয়েছে। কিন্তু সেটা নাড়াচ্ছে না। সন্ধ্যের ঝোঁকে তলোয়ারটা কালো দেখাচ্ছে। কাছে আসতে লোকে দেখল তলোয়ারে রক্ত লেগে। ওর ফতুয়া আর ইজেরেও রক্তের ছিটে। বলদেবসিং এখন আর চিৎকার করছে না। ছুটছেও না। ওর মুখেচোখে একটা অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি।

কিছু লোক বুঝতে পেরেছিল বলদেবসিং কাউকে খুন করে এসেছে। ঐ গলির এক কোণে থাকত এক বুড়ো কামার। করিমবক্স। বলদেবসিং তার বুকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিয়ে এসেছে। এই ভেবে যে, মাকে তো এখন বাঁচানো যাবেই না, তুরুকরা ওর মাকে এতক্ষণে নিশ্চয় বৈতরণী পার করে দিয়েছে—এ অবস্থায় হয়ত রক্তের বদলে রক্ত নেবার প্রশস্ত উপায় হিসেবে হাতের কাছে করিমবক্সকেই সে বেছে নিয়েছে।

গ্রামে তখন ঘনায়মান সন্ধ্যা। সমস্বরে তোলা আওয়াজ আরও জোরালো হচ্ছে। বাঁদিকে টিলের দিক থেকে সত্যিই দরজা ভাঙার শব্দ আর বিকট হুংকার ভেসে আসছে। গুরুদ্বারে তখন উত্তেজনা উঠেছে তুঙ্গে।

মোষ

হরনামসিং আরও একবার দরজার শিকলে খটখট শব্দ করল। এবার ভেতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠে সাড়া মিলল :

'বাড়িতে কেউ নেই, কর্তা বাইরে গেছে।'

হরনামসিং ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বন্তো আশপাশে তাকাল। কেউ ওদের দেখে ফেলে নি তো?

হরনামসিং একধারে সরে গিয়ে বলল, 'বন্তো, তুমি দরজা খুলতে বলো। ভেতরে বাড়ির গিন্নি আছে।'

বন্তো দরজা খটখটিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'বাড়িতে কে আছ, দরজা খোলো। খুব বিপদে পড়ে এসেছি।'

নিজের স্ত্রীকে এভাবে বলতে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে হরনামসিংয়ের মুখ নিচু হয়ে গেল। তার বউ আশ্রয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে, বেঁচে থেকে এও কিনা তাকে দেখতে হল।

দরজার পেছনে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভেতর থেকে কেউ শেকল খুলল। দরজা ফাঁক হল। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে এক লম্বা গড়নের বয়স্কা বাড়ির বউ, তার দুহাতে গোবর লাগা আর দোপাট্টা নামানো। তার পেছনে দাঁড়িয়ে লম্বা চুলের একজন কমবয়সী মেয়ে। তার আস্তিন গোটানো দেখে মনে হয় সেও বোধহয় গরুমোষের জন্যে জাব মাখছিল।

'কে তোমরা? কী চাও?'

বয়স্কা মহিলাটিই জিজ্ঞেস করল। যদিও এক নজরেই ওদের অবস্থাটা সে আন্দাজ করে নিয়েছিল।

'অদৃষ্টের ফেরে পড়ে এসেছি। থাকতাম ঢোক-ইলাহিবক্সে। দাঙ্গাবাজরা এসে পড়ে আমাদের ঘরবাড়ি সব লুট করে নিয়েছে। সারারাত ধরে হেঁটে এখানে এসেছি।'

মহিলাটি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ হল সেই মুহূর্ত, যার মধ্যে মানুষ তার জমানো সংস্কার, বিচারবোধ, মান্যতা মনে মনে এই সব কিছুর হিসেব কষে নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। মহিলাটি কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর দরজা হাট করে খুলে দিল।

'এসো, ভেতরে এসো।'

হরনামসিং আর বন্তো সঙ্গে সঙ্গে দলিজ পেরিয়ে উঠোনে এসে গেল। ওরা ভেতরে এলে বাড়ির গিন্নি একবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে বাড়ির বাইরেটা দেখে নিয়ে দরজায় শেকল তুলে দিল।

কমবয়সী মেয়েটি একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

'খাটিয়া বিছিয়ে দে রে, অকরাঁ !' বলে বাড়ির গিন্নি নিজে মাটিতে বসে আগের মতো থাবায় গোবর নিয়ে ঘুঁপি বানাতে লাগল।

অকরাঁ ঘরে গিয়ে পাল্লা কাঁধে ফেলে বাইরে এসে দেয়ালের ধারে খাটিয়া বিছিয়ে দিল।

'তোমার ভালো হোক, বোন! আমরা একদিনে ঘর হারিয়ে হা-ঘরে হয়ে গেলাম।' বলতে বলতে বন্তোর চোখে জল এসে গেল।

হরনামসিং বলল, 'ঢোক-ইলাহিবক্সে সারা জীবন কেটেছে। দোকান ছিল। ঘর ছিল। গোড়ায় সবাই বলল, এখানেই চুপচাপ বসে থাকো, কিছু হবে না। কিন্তু কাল এসে করিমখান পরামর্শ দিল, গ্রামে যদি থাকো বিপদে পড়ে যাবে। তার চেয়ে এই বেলা চলে যাও। করিমখান ঠিকই বলেছিল। আমরাও বেরিয়েছি আর ঠিক সেই সময়ে গ্রামে এসে পড়ল দাঙ্গাবাজেরা। দোকানও লুট করল, ঘরও জ্বালিয়ে দিল।' বাড়ির গিন্নি চুপ করে সব শুনলেন। ইতিমধ্যে বন্তো খাটিয়া থেকে নেমে বাড়ির গিন্নির কাছে বসে পড়ল।

অকরাঁ এসে বড় তোসলায় গোবরের ঘুঁপিগুলো রেখে তারপর উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটে দিতে লাগল। বাড়ির গিন্নি চুপচাপ বসে গোবরের তালের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে ঘুঁপি বানিয়ে যেতে লাগল। মুখে টুঁ শব্দ করল না।

হরনামসিং জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির কর্তা কোথায় গেছে ?'

মহিলা শুধু পাশ ফিরে হরনামসিংয়ের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। হরনামসিং হঠাৎ আঁচ করতে পারল লোকটা কোথায় গিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার থরহরি কম্প শুরু হল।

বন্তো বলল, 'আমরা তো এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছি। ভালো থাকুন করিমখান —উনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ভালো থাকো তুমি, বোন—তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছ।'

ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা নীরব নিথর ভাব নেমে আসায় হরনামসিং কয়েকবার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কমবয়সী মেয়েটি ভেতরে গিয়েছিল। হরনাম-সিংয়ের কেন যেন মনে হচ্ছিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অকরাঁ ওদের দিকে বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

গিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে মালসার জলে হাত ধুয়ে, যেদিকে রান্নার বাসনপত্র রাখা ছিল সেইদিকে গিয়ে মাটির ভাঁড়ে লস্যি ঢেলে নিয়ে এল। তখন হরনাম সিংয়ের কাঁধে বন্দুক লটকানো ছিল। তার কার্তুজের পেটি ঘামে ভিজে তার কামিজে সেঁটে গিয়েছিল।

'নাও, একটু লস্যি খেয়ে নাও। কাল সারা রাত কষ্টে গেছে।'

হাতে লস্যি দেখে হরনাম সিং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। সারা রাতের ক্লান্তি, উত্তেজনা আর চাপা দুশ্চিন্তা সব যেন একসঙ্গে ফেটে বেরিয়ে আসায় বাচ্চা ছেলের মতন সে কেঁদে ফেলল। যত যাই হোক, সে তো একজন সচ্ছল দোকানদার।

কোমরের গেঁজেতে আছে এখনও কোন্ না দু-এক শো টাকা। জীবনে কোনোদিন কারো কাছে হাত পাতেনি। আর আজ কিনা তাকে এ-দুয়োর সে-দুয়োর করতে হচ্ছে।

'এখানে অত জোরে কেঁদো না, সরদারজী। শুনলে গলি থেকে, পাড়া থেকে লোক ছুটে আসবে। মুখ বুজে বসে থাকো।'

হরনামসিং কান্না সামলে নিয়ে চুপ করে গেল। তারপর পাগড়ি থেকে রুমাল বার করে নিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

'তোমার ভালো হোক, বোন। তুমি যা করেছ, কখনও ভুলব না।'

'খোদা যেন কোনো ঘরের মানুষকে ঘরছাড়া না করেন। খোদার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গিন্নি তখনও লস্যি হাতে নিয়ে বন্তোর সামনে দাঁড়িয়ে। বন্তো লস্যির বাটির দিকে তাকিয়ে একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। চোখ তুলে দেখল ওর স্বামীও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মুসলমানের বাটিতে সে খাবে কেমন করে? এদিকে সারা রাতের ক্লান্তিতে গলা শুকিয়ে গেছে। ওকে ইতস্তত করতে দেখে বাড়ির গিন্নি বুঝতে পারল।

'তোমার কাছে কোনো পাত্র থাকলে তাতে ঢেলে নিয়ে খাও। নইলে এখানে পণ্ডিতের দোকান আছে। যদি ওর কাছে থাকে, তাহলে এক্ষুণি আমি দুটো বাসন আনিয়ে নেব। কিন্তু ওর কাছে পাওয়া গেলে হয়। আমার হাত থেকে না নিলে সারাদিন কোথায় ভোঁচকানি লাগিয়ে বেড়াবে?'

হরনাম সিং তখন হাত বাড়িয়ে লস্যি নিল।

'তোমার হাতের দেওয়া অমৃততুল্য, বোন! তুমি যা করেছ, কখনও ভুলব না।'

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। হরনাম সিং অর্ধেক লস্যি খেয়ে বাকিটা বন্তোর দিকে বাড়িয়ে দিল।

এ-বাড়ির গিন্নি বলল, শোনো সরদারজী, আমি তোমার কাছে কিছু লুকোব না। আমার কর্তা আর আমার ছেলে, দুজনেই গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে বাইরে গেছে। ওরা এক্ষুনি ফিরে আসবে। আমার কর্তা ধর্মভীরু মানুষ, ও তোমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু আমার ছেলে আছে, আরও অন্যান্য লোক আছে। ওরা তোমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে জানি না। নিজের ভালমন্দ তোমায় নিজেকেই বুঝে নিতে হবে।'

হরনামসিংয়ের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠল। এখুনি না বলছিল আলাদা বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে! এখন আবার উল্টো গাইছে। হাতজোড় করে হরনাম সিং বলল:

'এই ভরা দিনে দুপুরে আমরা কোথায় যাব?'

'আমি কী জানি! অন্য দিন হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু এখন কেউ কারো কথা শোনে না। আমি তোমাকে তো বলেইছিলাম কর্তা বাড়িতে নেই। এখন ওদের ফিরে আসার সময় হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে ওরা কি রকম ব্যবহার

করবে আমি জানি না। তেমন খারাপ কিছু ঘটলে আমাকে দোষ দিও না।'

হরনামসিং অনেকক্ষণ ধরে আকাশপাতাল ভাবল। তারপর হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাব করে বলল, 'ধর্ম' কথা, বাহগুরুর মনে যা আছে তাই হবে। মনে তোর করুণা জেগেছিল, দরজা খুলে দিয়েছিলি। এখন বলছিস বাইরে যেতে, বাইরে চলে যাব। চল বন্তো, উঠে পড়...'

হরনামসিং বন্দুকটা সাবধানে কাঁধে নিল। তারপর দুজনে দরজার দিকে এগোল। ওরা জানত দরজার বাইরে ওদের অপেক্ষায় সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে। কিন্তু এর তো কোনো চারা নেই।

বাড়ির গিন্নি সেই একভাবে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

হরনামসিং যখন হাত বাড়িয়ে দরজার শেকল খুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় পেছন থেকে সে বলে উঠল, 'যেয়ো না গো, দাঁড়াও! শেকল দেওয়া থাক।' তারপর বলল, 'আমার বাড়ির দরজায় এসে তোমরা ডেকেছ। অনেক আশা নিয়ে এসেছ। যা হবার হবে। তোমরা ফিরে এস।'

পেছনে অন্ধকার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অকরোঁ তার শাশুড়ির দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। সে এবার এগিয়ে এসে বলল, 'যেতে দাও না, মা! আমরা তো বাড়ির ছেলেদের মত নিইনি। এটা ওরা মোটেই ভালোভাবে নেবে না।'

'যা বলবার আমি বলব। যা, তুই ভেতর থেকে মইটা নিয়ে আয়। জলদি কর। বাড়ি বয়ে এসেছে, তাড়িয়ে দেব? আল্লার দরগায় সবাইকেই যেতে হবে। যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দাঁড়িয়ে আমার মুখ না দেখে মইটা নিয়ে আয়।'

সস্ত্রীক হরনামসিং দরজা ছেড়ে ভেতরে এল। হরনামসিং পেছন ফিরে হাতজোড় করল।

'বাহগুরু তোমার ভালো করুন, বোন। তুমি আমাদের যা বলবে আমরা তাই করব।'

ততক্ষণে বেশ বেলা হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ির বউঝিরা এ ওর বাড়িতে যেতে আরম্ভ করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে খবর চালাচালি হচ্ছে। কাল সন্ধ্যেবেলায় এ গ্রামেরও বিস্তর লোক মুখে আওয়াজ তুলে, বল্লম-সড়কি উঁচিয়ে উঁচিয়ে, ঢোল বাজাতে বাজাতে হুন্দমুন্দ ঘুরে তারপর পুবের দিকে পাড়ি দিয়েছিল। সারা রাত কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কী করে বেড়িয়েছে কে জানে! এখন সকাল হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে বাড়িতে সবাই তাদের ফেরার অপেক্ষায়।

অকরোঁ মই নিয়ে এল। শাশুড়ি অকরোঁর হাত থেকে মই নিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল। সেখানে ঘরের মাথায় ছোট একটা টঙের ঘর ছিল।

'এইদিকে এস গো, ওপরে উঠে দুজনে মাচানে বসে থাক। কোনো শব্দ করবে না, কেউ যেন না জেনে যায় তোমরা ওখানে আছ। তারপর আল্লা যা করেন।'

হরনাম সিংয়ের উঠতে খুব কষ্ট হল। একে তো ভারী শরীর, তার ওপর কাঁধের বন্দুকটা বারবার পায়ে ঠুকে ঠুকে যাচ্ছিল। কোনোরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে

সে ওপরে পৌঁছুল, পেছনে পেছনে বস্তোও উঠে এল। মাচানটা ছিল ছোট, কোনোমতে উবু হয়ে বসা যায়, পেছনে ছিল ঠাসা মালপত্র। হরনাম সিং যখন কবাট বন্ধ করে দিল তখন কিছুটা অন্ধকার হল। দুজনে চুপচপে বসে অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তাদের সব ভাবনা, সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। একটা সরু সুতোয় তাদের ভাগ্য বিপজ্জনকভাবে ঝুলছিল।

হরনামসিং অনেকক্ষণ ধরে হাঁফাতে লাগল। মাচার মধ্যে ভয়ানক গুমোট অন্ধকার। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আর না পেরে হরনামসিং কবাটটা একটু খুলে দিল। ঘরে তাতে সামান্য হাওয়া আর আলো পাওয়া যাবে। কবাটের ছোট্ট ফুটো দিয়ে বাইরের দিকে যাবার দরজা আর কিছুটা উঠোনের অংশ নজরে আসছে। নিচে সব চুপচাপ।

ওর মনে হল যেন শাশুড়ি আর বউ কাউকেই উঠোনে দেখা যাচ্ছিল না।

'যদি কোনো অঘটন ঘটে, আমাদের প্রাণসংশয় হয়, বস্তো, তাহলে আমি প্রথমে তোমাকে নিজের হাতে খতম করব।' হরনামসিং ফিসফিস করে তৃতীয়বার একথা বলল, 'আমাদের যদি ধরে ফেলে তো এছাড়া আর উপায় নেই।'

বস্তো চুপ করে থাকল। এখন কী হবে, এখন কী হবে। প্রতিমুহূর্তে তার ছিল এই চিন্তা। এছাড়া আর কিছু সে ভাবতেই পারছিল না।

নিচে পেছনের ঘরে শাশুড়ি বউয়ের বাক্যালাপ চলছিল। অকরেণার মুখ হাঁড়ি হয়ে ছিল।

'কাফেরদের থাকতে দিয়েছ, খুব খারাপ কাজ করেছ। বাড়ির ছেলেরা এসে কিন্তু তোমাকেই ধরবে।'

শাশুড়ি তাতে মোটেই ঘাবড়ালো না।

'চুপ কর তুই, কপালের ফেরে কেউ যদি আসে, আশ্রয় চায়—তাকে কি গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব?'

'জানা নেই, শোনা নেই। কে হয় ওরা আমাদের? এটা আব্বারও মোটে ভাল লাগবে না, রমজানেরও ভাল লাগবে না। ওপরে দুজনে চড়ে বসে আছে। আর ঐ শিখটার হাতে বন্দুক আছে। যদি বাড়ির পুরুষেরা এলে লোকটা ওপর থেকে গুলি চালিয়ে দেয়, তাহলে? তুমি তো বিশ্বাস করে ওদের খুব ওপরে তুলে দিলে।'

শাশুড়ি অকরেণার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব কিছু উল্টে যাবে যখন বাড়ির ছেলেরা ফিরে ব্যাপারটা জেনে ফেলবে। তখন দুদলে শুরু হয়ে যাবে তুইথুলি মুইথুলি, গালমন্দ। আর রমজান তো অনেকদিন থেকেই খাপ্পা হয়ে আছে। এই সময় যদি ওপরে বসে থেকে গুলি চালিয়ে দেয়? নিচে দাঁড়ানো লোকগুলো মরে ভুত হয়ে যাবে। কাউকে আশ্রয় দেওয়া এক জিনিস, নিজের ঘরের মানুষদের বিপদ ডেকে আনা আলাদা কথা। এ কী বেআক্কেলের মতো কাজ করে ফেলেছে সে, কেন তখন একথা ওর মনে আসেনি?

এইভেবে তখন সে মাচানের নিচে এসে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, 'সর্দারজী, একটা কথা শোনো। শোনো একবার।'

হরনামসিং কবাট একটু ফাঁক করল।

'কী বলছ, বোন।'

'তোমার বন্দুকটা আমাকে দিয়ে দাও। এদিক থেকে নামিয়ে দাও, আমি ধরে নেব।'

হরনামসিং উত্তর দেবার আগে সিঁটিয়ে গিয়ে একটু চুপ করে রইল।

'বন্দুক আমি দিই কী করে, বোন?'

'না, বন্দুক তুই দিয়ে দে। বন্দুক নিয়ে ওপরে বসে থাকতে পারবে না।'

দুজনের মধ্যে আবার স্তব্ধতা নেমে এল। বন্দুক দিয়ে দেওয়া মানে নিজেদের প্রাণ ওদের হাতে তুলে দেওয়া। এদিকে ও যদি দিতে আপত্তি করে, তাহলে এখুনি সে ওদের বাড়ি থেকে বার করে দেবে। আর বাইরে, এই দিনদুপুরে, কাঁধে বন্দুক থাকলেই বা কী? তাতে বাঁচা যাবে না।

'শোনো সর্দারজী, বন্দুক দিয়ে দাও। তুমি তো আমার বাড়িতেই আছো, এখন তোমার বন্দুকের কী দরকার?'

'বন্দুক দিয়ে দিলে তো বোন, তখন আমি একেবারে নিরস্ত্র হয়ে পড়ব। কোথায় মাথা কুটে কুটে বেড়াব, আমার এটাই তো একমাত্র মনের বল।'

'তুই বন্দুক দিয়ে দে, এইদিকে নামিয়ে দে। যাবার সময় ঠিক আমি ফিরিয়ে দেব।'

হরনামসিং বন্তোর মুখের দিকে একবার তাকাল তারপর নিঃশব্দে বন্দুকটা নিচের দিকে নামিয়ে দিল।

বন্দুক দিয়ে ফেলার পর হরনামসিংয়ের হুঁশ হল, দেওয়ার আগে গুলিগুলো বার করে নেওয়া উচিত ছিল। গুলিভরা বন্দুক যে ওদের হাতে তুলে দিলাম। তারপর সে মাথাটা নুইয়ে দিল, যেখানে জীবনটাই সংশয়ের দোলায় দুলছে সেখানে বন্দুক খালি কী গুলিভরা, তাতে কীই বা আসে যায়। গুলি যদি বার করে নিতাম তাহলে মৃত্যুর একটা ফাঁড়া কাটানো যেত। যখন বার করে নিইনি, তার মানে মৃত্যুর হাজারটা ফাঁড়ার সঙ্গে মাত্র আরও একটা যোগ হচ্ছে। হরনামসিং দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই দীর্ঘশ্বাস ছিল এতই অতলস্পর্শ যে, নিচে দাঁড়িয়ে থাকা শাশুড়ি-বউয়ের কানেও বোধহয় তা পৌঁছুল।

মাচান আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

কোথা থেকে যে কী সব হয়ে গেল। কাল এমনি সময় বন্তো নিজের ঘরে বসে সিন্দুকে কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখছিল। আর আজ তারা স্বামীস্ত্রীতে ইঁদুরের মতন অন্ধকার মাচানের গর্তে ঢুকে বসে আছে। সে আর করিমখান কাল দাঙ্গার বিষয়ে ভালমন্দ কথা বলছিল। যারা চোখের পর্দা খুইয়ে ফেলেছে তাদের নিয়ে কথা হচ্ছিল। মনে হয়েছিল, যা কিছু ঘটছে সবই তাদের সীমানার বাইরে। তা নিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তারা কথা বলতে পেরেছে। তাতে নিজেদের টীকা-

টিপ্পনী জুড়তে পেরেছে। আর আজ দাঙ্গার একটিমাত্র ধাক্কায় তারা কোথা থেকে কোথায় ছিটকে এসে পড়েছে।

হঠাৎ এই ভেবে তার মন ভেঙে গেল যে, এ আমি কী করলাম—বন্দুকটা আমি হাতছাড়া করে দিলাম! আর তা ফেরত পাওয়া যাবে না। নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম। বন্দুক ছিল আমার কাছে অন্ধের যষ্টি, এখন আর আমি তা কোথায় পাব? ভাবতে ভাবতে হরনামসিং ঘেমে নেয়ে উঠল। ওর প্রাণাধিক প্রিয় পত্নীর অবস্থা শোচনীয় হল। এখন আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব কিসের জন্যে। এখন তো লোকে আমাদের ইটপাটকেল ছুঁড়েই মেরে ফেলে দেবে। ভক্তি, জ্ঞান আর মানবপ্রেমের এতদিনের এত সঞ্চয় সত্যি যেন একটা চড় খেয়ে সব ভুলে গেল।

হঠাৎ বন্তো বিড়বিড় করে বলল:

'ইস্, এইসময়ও যশবীরের যদি একটা খবর পেতাম।'

হরনামসিং চুপ করে থাকল। কীই বা সে বলবে। থেকে থেকে কোনো কোনো সময় বন্তোর মায়ের মন কেঁদে ওঠে। কাল রাত্তিরে নালার ধার দিয়ে চলতে চলতে বন্তো তখনও দু-একবার নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে করেছিল। আবার এখন তাই শুরু করেছে। যখনই কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের বিপদের ভাবনা কিছুটা চলে যায়, তখনই ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে ওর মন পুড়তে থাকে।

গ্রামে একটা শোরগোল শোনা গেল। আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে। মেয়েপুরুষেরা একসঙ্গে কথা বলছে। ঠিক সেই সময় দরজায় জোরে খটখট আওয়াজ আর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকণ্ঠে ডাক শোনা গেল:

'এই অকরাঁ, বাইরে আয়। ওরা এসে গেছে, দ্যাখ্।'

অকরাঁর বন্ধুস্থানীয় কেউ বলছিল। অকরাঁ ছুটতে ছুটতে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

ওপরে বসে-থাকা হরনামসিংয়ের বুক আবার ধড়াস করে উঠল। বন্তো চোখ তুলে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার কাপড় কোঁচকানো মোচকানো আর ময়লা হয়ে আছে।

মাচানের আধখোলা কবাট দিয়ে বাড়ির গিন্নিকে চোখে পড়ল। উঠোনের খোলা দরজার সামনে কোমরে দুহাত রেখে সে দাঁড়িয়ে। তার উঁচু লম্বা গড়ন আর সোজা ঋজু চেহারা দেখে ওর মনে ভরসার ভাব জাগল। হারানো বিশ্বাস আবার যেন সে ফিরে পেল। এই মহিলা থাকতে বলা যায় এখনও সব কিছু মরে যায়নি।

বন্তো তার স্বামীকে আশ্বাস দেবার জন্যে বলে, 'বাহগুরুর কৃপা থাকলে আমাদের গায়ে আগুনের আঁচ লাগবে না। তুমি তো ভক্ত মানুষ, কেন তুমি ভয় পাচ্ছ?' হরনামসিং চুপ করে থাকল।

বাইরে আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে। হাসিঠাট্টার গুঞ্জন। এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ। উঠোনের দরজা হাট করে খোলা! এই সময় অকরাঁর গলার স্বর আর জোরে জোরে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। হরনামসিং বুঝল রাতভর কেল্লা ফতে করে বাড়ির পুরুষেরা ফিরে আসছে।

কিছুক্ষণ পর আকরাঁর শ্বশুর আর অকরাঁ একটা কালো রঙের বড় ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে ভেতরকার উঠোনে এল। শ্বশুরের পাগড়ি চেপ্টে যাওয়া থেকে বোঝা যায় গ্রাম অবধি ট্রাঙ্কটা সে মাথায় করে এনেছে।

হরনামসিং হাত বাড়িয়ে বন্তোর হাঁটু ছুঁলো।

'আমাদের তোরঙ্গ। বড় কালো তোরঙ্গ। এরাই আমাদের দোকান লুট করতে গিয়েছিল।'

বন্তো বাইরে উঁকি দিয়ে দেখা কোনো চেষ্টা করল না।

হরনামসিং বিড় বিড় করে বলল, 'তালা এখনও লাগানো রয়েছে।'

অকরাঁর শ্বশুর ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়ে মাথার পাগড়ি খুলে গায়ের ঘাম মুছছিল। ওর শাশুড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

'রমজান আসে নি ?'

'রমজানা গেছে ধর্মপ্রচারের কাজে।'

ওপরে বসা হরনামসিং বন্তোর হাঁটু ছুঁলো! 'এ এহসানআলী। একে আমি চিনি। এর সঙ্গে আমার লেনদেন ছিল।'

'বন্ধ তোরঙ্গটাই তুলে এনেছ, আব্বা? ভেতরে কিছু থাকলে হয়!'

'তা কেন? কী ভারী! ওটা বয়ে আনতে আমার মাজা বেঁকে গেছে। কাপড় চোপড়ের তোরঙ্গ। কিছু কি আর থাকবে না?'

'ব্যস্, শুধু এই একটা তোরঙ্গ? রমজান কিছু আনেনি?'

'ঐ তো এটা টেনে বাইরে এনেছিল! আস্ত একটা তোরঙ্গ আনা হয়েছে। আর কী চাস্?'

'এসো, এটা খোলা যাক। তালাটা ভেঙে ফেলি?' বলে অকরাঁ ঘরের ভেতর থেকে একটা হাতুড়ি নিয়ে এল। ভেতরে কী আছে দেখবার জন্যে ও তখন এতই মত্ত যে, মাচানে লুকিয়ে থাকা লোকগুলোর কথা শ্বশুরকে সে বলতেই ভুলে গিয়েছিল। ওর শাশুড়ি তখনও চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে।

'লস্যি নিয়ে আয়, রাজো। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।' বলতেই ওর বউ রাজো লস্যি আনতে চলে গেল।

তারপর তালার ওপর ঠকাঠক শুরু হয়ে গেল।

এহসানআলী বাটি হাতে নিয়ে যখন লস্যি খাচ্ছে, এই সময় ওর বউ রাজো বলল ওদের বাড়িতে একজন শিখ আর তার বউ আশ্রয় নিয়েছে।

ঠিক সেই সময় হরনামসিং কবাট খুলে গলা বার করে বলল, 'তালা কেন ভাঙছ, মা! এই নাও চাবি। ওটা আমারই তোরঙ্গ।' তারপর এহসানআলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এহসানআলী, আমি হরনামসিং। তোমার বউ এখানে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। গুরু মহারাজ তোমাদের ভালো করুন। এ তোরঙ্গ আমার। কিন্তু এটা এখন থেকে তোমাদেরই হল। ভালো হল যে, এটা অন্য কারো হাতে না পড়ে তোমাদেরই হাতে পড়েছে।'

ওপরদিকে চোখ পড়তেই এহসানআলীর লজ্জায় মাথা কাটা গেল। ও যেন চোর হিসেবে বমাল ধরা পড়ে গেছে।

অকরাঁ তালা ভাঙা থামিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আম্মাই ওদের থাকতে দিয়েছে। আমি তখনই বলেছিলাম ওরা কাফের। ওদের ভেতরে ঢুকতে দিও না। তা আম্মা আমার কথা শুনল না।'

অকরাঁ বলছিল শ্বশুরের মন রাখার জন্যে। কিন্তু এহসান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ও খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এক সময়ে হরনামসিংয়ের সঙ্গে ওর লেনদেন ছিল। দুজনে দুজনকে ভালোমতন চিনত। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এখন তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে। এভাবে যে দুজনের দেখা হয়ে যাবে ও কখনও ভাবতেই পারেনি। তাছাড়া ও কখনই কাঠগোঁয়ার নয় যে, হিন্দু বা শিখ দেখলেই ওর মাথায় রক্ত চড়ে যাবে।

রাজোর মুখ ছোট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এহসান নিজের চোর বদনাম কাটানোর জন্যে মুখে বলল, 'নিচে নেমে এস, হরনামসিং। ভালো হয়েছে, তুমি আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছ। নইলে অন্য কোথাও হলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে।'

অকরা তালা খোলার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছিল কিন্তু রাজো ওর হাত থেকে চাবি নিয়ে নিয়েছিল। অকরাঁ মিনতি করা সত্ত্বেও রাজো ওকে দিচ্ছিল না।

'আমি তোমাদের কিছু বলব না, হরনামসিং! কেননা তোমরা আমার ঘরে এসে উঠেছ। কিন্তু এখান থেকে তোমরা চলে যাও। আমার ছেলে যদি জেনে যায় যে, তোমরা এখানে আছ তাহলে সে তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে না। গাঁয়ের লোকও যদি জেনে যায় আমি তোমাদের জায়গা দিয়েছি সেটাও আমার পক্ষে খারাপ হবে।'

'সবই মানছি, এহসানআলী! এতে আমাদের কি কোনো হাত আছে? এখন এই দিনে দুপুরে বাইরে গেলে কেউ আমাকে ছেড়ে দেবে?'

এহসানআলী চুপ করে গেল। রাজোর মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন বলছে, এ কী মুশকিলে তুমি আমাদের ফেলে দিলে?

এহসানআলী বলল, 'কাল রাত্তিরেও লোকে তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছে। এখন কোনো রকমে লোকে যদি জেনে যায় যে, তোমরা এখানে আছ লোকে আমাকে ছাড়বে না। তোমরা এখান থেকে চলে গেলে সেটা আমাদের পক্ষেও মঙ্গল তোমাদের পক্ষেও মঙ্গল।'

অকরা নিজে থেকেই মই উঠিয়ে এনে মাচানের নিচে লাগিয়ে দিল। হরনামসিং ও বন্তো নিঃশব্দে নিচে নেমে এল। তাদের দেখে বলির পাঁঠার মতো মনে হচ্ছিল।

কিন্তু আবার সেই সকালের নাটকের পুনরাবৃত্তি হল। দুজনে নিচে নেমে এসেছিল। দুজনের কেউই উচ্চবাচ্য করে নি। দুজনে শান্ত নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। হরনামসিং নিজের বন্দুকটা চেয়ে নিতে যাচ্ছিল। উঠোনের

মাঝখানে রাজো চুপচাপ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় এহসান আলী বলল, 'রাজো, এদের ভুষির ঘরে বসিয়ে রাখ। আর বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দে। নে, এই তালাটাই খুলে দরজায় লাগিয়ে দে। যা, জলদি কর।' তারপর হরনামসিংয়ের দিকে ফিরে এহসানআলী তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'এটা মনে রেখো, হরনামসিং! কাফেররা কিন্তু শহরে যা করছে, খোদার' কসম, মনে করলে তাতে মাথায় খুন চেপে যায়।'

রাজো আগে আগে যাচ্ছিল। তার পেছনে সপত্নীক হরনামসিং। কুঠুরিগুলো পেরিয়ে তারা পেছনের এক আধো-অন্ধকার দালানে পেঁছুল। সেখানে গোবর, জাব আর খাটালের ঝাঁঝালো গন্ধ। এইখানে এসে রাজো ঘরের দরজা খুলল। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ অবধি খড়বিচুলিতে ঠাসা।

'এইখানে বসে থাকো। রমজানের বাপ মানুষ ভালো, তোমাদের দুজনের চেনাপরিচয় আছে আমি জানতাম না। এখানে বসে কোনো রকমে সময় কাটিয়ে দাও।'

হরনামসিংরা মাচানে যেভাবে বসেছিল, এখানেও সেইভাবেই বসে পড়ল। এরপর রাজো দরজা টেনে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল লাগিয়ে দিল।

সময় কাটতে লাগল। দুজনের এইভাবে কিছুটা মনে ভরসা এল যে, সন্ধে পর্যন্ত এখানে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা একটা হল। দিনমানে একটা সময়ে রাজো তাদের রুটি আর লস্যিও দিয়ে গেল। পেটে রুটি পড়ে দুজনের ধড়ে প্রাণ এল। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারে বসে বসে চোখ বড় বড় করে তারা দুজন দুজনকে দেখতে লাগল। বন্তো আবার হরনামসিংকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয়? ইকবালসিং গাঁয়েই থেকে গিয়েছে না গাঁ ছেড়ে বাইরে কোথাও পালিয়ে গিয়েছে?'

'বাহগুরুর মনে যা আছে তাই হবে। তার ভাগ্যে কোনো সাচ্চা লোক জুটলে সেও বেঁচে যাবে।'

যশবীর একা নয়, এটাই যা বাঁচোয়া। ওদের গাঁয়ে ওর নিজের সঙ্গতের প্রচুর লোক আছে। তারা সবাই এক জায়গায় নিশ্চয় একজোট হয়েছে।'

এরপর হরনামসিংকে বন্তো জিজ্ঞেস করল, 'এরা আমাদের বন্দুক ফিরিয়ে দেবে নিশ্চয়! তোর কী মনে হয়? আমার কিন্তু মন বলছে না।'

ওরা অনেকক্ষণ ধরে এইসব কথাই বলছিল। তবে জায়গাটা মাচানের মত অতটা দমবন্ধ করা নয়। গরুর খোলের নাদার পাশে বসে বসে দুজনের চোখ পিটপিট করতে লাগল। সারা রাত একটুও তারা জিরোতে পারে নি। ক্লান্তিতে দুজনেরই চোখ জুড়ে এল।

দরজায় কুড়ুলের ঘা পড়ছে শুনে ওদের ঘুম উড়ে গেল। ওরা শুনল কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'আয় বাইরে বেরিয়ে আয়, কোথায় ঢুকে বসে আছিস, তোমার মাকে…আয় বাইরে। তোমার…।'

সমানে দরজায় কুড়ুল পড়ছে। হরনামসিং আর বন্তো ধড়মড় করে উঠে

বসল। যেন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওদের শিউরে উঠল।

'বার কর চাবি! কাফেরদের ঘরে জায়গা দেওয়া হয়েছে?' তারপর আবার দরজায় ঘা পড়তে লাগল।

'আস্তে বল, রমজানা।' কোনো মেয়ের গলা। অকরাঁ বোধহয় তার স্বামীকে গলা নামাতে বলছিল। গলার স্বর নিচু করাতে বলছিল।

দরজায় আবার কুড়ুল পেটানোর শব্দে দরজার ওপর দিকে চিড় খেয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে একফোঁটা আলো ভেতরে আসছে।

আবার অন্য কোনো স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, 'কেন গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছিস! তোর হয়েছে কী?' গলাটা রাজোর: 'কোথায় সেই ডাইনি? আমি তোর জিব ছিঁড়ে নেব, হারামজাদী! আমি তোকে বলেছিলাম না একে না বলতে? কেন বললি তুই? পেটে ভাত হজম হচ্ছিল না...। তুই কী চাস, রমজানা? ঘরের মধ্যে খুন করবি? ঘরের আশ্রিত মানুষকে মারবি? এ মানুষটা আমাদের চেনা পরিচিত লোক। এদের কাছে আমরা ঋণী।'

'বেশি বকবক কোরো না মা, শহরে এই কাফেরেরদল দুশো মুসলমানকে কচুকাটা করেছে।' এরপর আরেকবার দরজায় কুড়ুলের ঘা মেরে বলল, 'এই কাফের, বেরিয়ে আয়। তোমার...' দুবারের বারে দরজার কড়া ভেঙে গেল আর দরজা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ আলো ভেতরে এসে ঢুকল। রমজান হাঁফাচ্ছিল। কুড়ুলটা ছিল হাতে। পাশে দাঁড়িয়েছিল অকরাঁ। আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে ছিল রাজো কোমরে দুহাত রেখে।

'বেরিয়ে আয়!......'

রমজান উঁকি দিয়ে ভেতরে দেখল। হরনামসিং আর বন্তো অন্ধকারে দুজনে জড়াজড়ি হয়ে বসে দরজার দিকে ধন্দমারা চোখে তাকিয়ে ছিল। দরজা খুলতেই উঠে খাড়া হয়ে চুপচাপ বাইরে এল।

হরনামসিং কাঁপা গলায় বলল, 'মেরে ফেল...'

'তোর মার...' বলে রমজান বাঁ হাত বাড়িয়ে হরনাম সিংয়ের গলা চেপে ধরল। তাতে হরনামসিংয়ের মোটা কামিজের ওপরকার বোতামগুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল। ধাক্কা খেয়ে হরনামসিংয়ের পাগড়ি আলগা হয়ে গেল। তারপর যেরকম রোখ দেখিয়ে রমজান তার গলা চেপে ধরেছিল, তেমনিভাবেই ঝট করে তাকে ছেড়ে দিল। হরনামসিংয়ের গলায় রমজানের আঙুলের লাল দাগ পড়ে গিয়েছিল।

হরনামসিংকে সেও চিনতে পেরেছিল। ওর দোকানে সেও দুএকবার চা খেয়েছে, ওর দাড়ি এখন আগের চেয়ে আরো সাদা হয়ে গেছে। শরীরটাও আগের চেয়ে অনেক ভেঙে গেছে।

রমজান দুতিনবার চেষ্টা করেছিল কুড়ুলটা ওঠাতে। কিন্তু কুড়ুলটা হাতে করেও শেষ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। কাফের মারাটা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু

এ লোকটা ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, তাছাড়া চেনাজানাও বটে। এমন একজনকে মারা পর্বতলঙ্ঘনের চেয়েও কঠিন কাজ। ধর্মে মতি আর ঘৃণা—এ দুয়ের মাঝখানে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম দণ্ডিরেখা রয়ে গেছে, যেটা পার হওয়া খুব দুঃসাধ্য। রমজানও সেটা পেরোতে পারে নি।

রমজান ওদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকল। তারপর গালি-গালাজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তখন বোধহয় মাঝরাত। লম্বা ঢ্যাঙা রাজো আগে আগে চলেছে আর তার পেছন পেছন চলেছে হরনামসিং ও বন্তো। গাছের ঝোপ পর্যন্ত রাজো ওদের সঙ্গে এল। গাছের ঝোপের মাথায় চাঁদের আলো। আবার সেই অলৌকিক রহস্যময় স্বপ্নের মতো দৃশ্য, আবার সেই আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। গাছের এই ঝোপ আর সেই ঝোপ পেরিয়ে অনন্ত বিস্তার চোখের সামনে অজ্ঞাত রহস্য আর ভয়াবহতা তুলে ধরল। আগে আগে চলা রাজোর মুখ থমথমে হয়ে আছে। তার হাতে দো-নলা বন্দুক উঁচিয়ে ধরা।

আবার ওরা নদীর পাড় বেয়ে নিচে নামছে। বাঁদিকের আকাশ দিগন্তে লাল হয়ে আছে। হরনামসিং বন্তোর হাত টেনে ধরে আস্তে বলল, 'বাঁদিকে তাকাও। দেখছ?'

'দেখেছি। কোনো গ্রাম জ্বলছে।'

'...বাহ গুরু...' বন্তো বিড়বিড় করে বলল।

চলতে চলতে হরনামসিংয়ের পা আবার থেমে গেল। অন্যদিকের আকাশটাও লাল হয়ে আছে।

'ওটা কোন্ গ্রাম? ওটাও তো জ্বলছে!

বন্তো চুপ করে গেল।

হরনামসিং পেছন ফিরে দেখল চাঁদের আলোয় গ্রামের একটা ধারে মাটির বাড়ি। কোনো কোনো ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। ঘরের বাইরে ভুষি স্তূপাকার হয়ে আছে। কোথাও কোথাও দাঁড়ানো গরুর গাড়ি।

গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে পীরের সাদা কবর ওদের নজরে পড়ল। কবরের ওপর আলো জ্বলছিল না। আজকের দিনটাতে লোকে ওখানে প্রদীপ দিতে ভুলে গেছে।

রাজো ঝোপের ধার দিয়ে দিয়ে হাঁটছিল। ঝোপ পেরিয়ে সেই ঢাল। যেটা পেরিয়ে হরনামসিং আর বন্তো এই গ্রামে এসেছিল। রাজো দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তার হাতে ধরা বন্দুকটা হরনামসিংয়ের হাতে তুলে দিল।

'যাও, এবার আল্লা রক্ষা করেছেন। সোজা ধার দিয়ে দিয়ে চলে যাবে। তারপর তোমাদের ভাগ্য।'

বলতে গিয়ে রাজোর গলা ধরে এল। বন্তো বলল, 'রাজো বোন, আমাদের যে উপকার করলে, আমরা কখনও তা ভুলতে পারব না।'

'যতদিন প্রাণ থাকবে তোমার ঋণ…' কাঁপা গলায় হরনামসিং তার কথা শেষ করতে পারল না।

'কী জানি বোন! জানি না তোমাদের জান বাঁচাচ্ছি, না যমের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। চারদিকে আগুন জ্বলছে।'

এই কথা বলে রাজো তার কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাদা কাপড়ে জড়ানো একটা ছোট পুঁটলি বার করে আনলো।

'এই নাও, এ তোমাদের জিনিস।'

'এতে কী আছে, রাজো বোন?'

'এটা তোমাদের বাক্সের ভেতর পাওয়া গিয়েছিল। আমি বার করে এনেছি। তোমাদের সামনে কঠিন সময়। সঙ্গে দুটো গয়না থাকলে আপদে বিপদে কাজে লাগবে।'

'বাহ্ গুরু তোমার ভালো করুন, বোন। অনেক পুণ্য করেছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল'—বলতে বলতে বন্তো কেঁদে ফেলল।

'যাও, আল্লা রক্ষা করেছেন আর দেরি কোরো না' রাজো বলল। ওদের সে কিছু বলতে পারল না ওরা যে কোথায় যাবে, কোন গাঁয়ের দিকে যাবে, গিয়ে কার দরজায় কড়া নাড়বে। রাজোর পক্ষে কোনোটাই বলা সম্ভব ছিল না।

হরনামসিং আর বন্তো ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল। রাজো টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগল। রাস্তা ছিল এবড়ো-খেবড়ো, বালি আর নুড়ি পাথরে ভর্তি। মাথার ওপর ফুটফুট করছে চাঁদের আলো। তাতে সারা মাঠ জুড়ে আলোর ছায়াছবি ছড়িয়ে আছে। কোথাও অন্ধকার জমে আছে, কোথাও বা কোনো পাড়ার আলোর চমক।

কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা পেছন ফিরে দেখল, রাজো তখনও টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে। ওদের অজানার পথে যাত্রা রাজো দূর থেকে লক্ষ্য করছে। তারপর ওদের দেখতে দেখতে রাজো ঘুরে আবার নিজের গ্রামের দিকে রওনা দিল। রাজো চলে যাবার পর ওদের দুজনে কাছে চারিদিকের বিস্তীর্ণ খাঁ খাঁ করা ভাব আরো বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সতেরো

এর মধ্যে মফস্বলের এবড়ো-খেবড়ো জমিতে আরও এক নাটক জমে উঠল। রমজান আর তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা ঢোক-ইলাহিবক্স আর মুরাদপুরের দিক থেকে লুটের মালপত্র নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতে যখন ফিরছিল, তখন ওরা দূরে একজন শিখকে পালিয়ে যেতে দেখল। ও কি আগে থেকেই ছুটছিল, না এদের দলটাকে দেখতে পেয়ে ছুট দিয়েছিল, সেটা ঠিক জানা যায়নি। তবে এরা মাঝের থেকে বেশ একটা খেলা পেয়ে গেল। রমজান 'ইয়া আলী' রব তুলল আর তার সঙ্গে বিশ

তিরিশজনের এই দলটা শিখটার পেছনে ধাওয়া করল। খোলা জায়গা। কিন্তু সমতল নয়। জায়গায় জায়গায় ঢিবি, নিচে গরখাই আর ঢিবির আশপাশে ছোটবড় নানা আকারের গর্ত। সরদারের মুখ ছিল গাঁয়েরই দিকে। কিন্তু গরুর গাড়ির রাস্তা ছেড়ে সে ক্ষেতবাগানের পথ ধরে যাবার চেষ্টা করছিল। ভেবেছিল এইভাবে স্থানীয় লোকের নজর এড়িয়ে যেতে পারবে।

একটিবার নজরে আসার পরই লোকটা এদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল।

'শিখ ব্যাটা লুকিয়ে পড়েছে'—বলেই রমজান হনহন করে এগিয়ে গেল। গজ পঞ্চাশেক দূরে আবার সে দৃষ্টিগোচর হল। তখনও সে ঢিবি-গরখাইয়ের রাস্তা বরাবর সামনে এগিয়ে চলেছিল। যেখানে সর্দারকে দেখা গিয়েছিল, সেইখানে পৌঁছে এরা আর তার কোনো পাত্তা খুঁজে পেল না।

'কোনো খানাখন্দে ঢুকে বসে আছে।' বলে নূরদীন হাঁক পাড়ল, 'এই, বেরিয়ে আয়। তোর মাকে...'

সেই সময় এরা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর এই ধর্মযোদ্ধার দল ঢিল আর পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে পলাতক শিখকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে শুরু করেছিল। এবার গর্তের ভেতর নিশানা করে এরা আশপাশের উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়তে লাগল। যাতে ঐ শিখ সরদার আর থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে আসে। ও যদি তখন ছুটত, তাহলে মুষলধারে ছোঁড়া পাথরের চোটে ও নিশ্চয় অক্কা পেত—যেমন বর্ষার মরশুমে ইঁদুর মরে। কিন্তু সেই শিখ প্রাণভয়ে পালিয়ে একটা টিলার ভেতর অন্ধকার গর্তে ঢুকে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। আশপাশে ছিল অসংখ্য গুহাগর্ত। তার মধ্যে ও কোনটাতে ডুব মেরেছে, তা নির্ণয় করা এদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য।

নূরদীন চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ও শিখ, এই বেল্লিক! আয় বেরিয়ে!' শুনে এরা হো হো করে হাসতে লাগল। নূরদীন আর রমজান একই গাঁয়ে থাকে। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে মাটি আর ইট বওয়ার কাজ করত সে। ওর দাঁতের ওপর লাল লাল মাড়ি। হাসলে অনেক দূর থেকে ওর মাড়ি দেখা যেত।

এদের মধ্যে কয়েকজন নিচে নেমে গেল।

'এই গর্তটাতে থাকতে পারে।' একজন বলল।

'বেরিয়ে আয়, বলছি। তোর মাকে...' অন্য একজন বলল। বলে গর্তের ভেতর ঢেলা ছুঁড়ল। তাতে কোনো কাজ হতে দেখা গেল না। গর্তের ভেতরটা অন্ধকার। আর তেমনি গভীর। কথার কোনো জবাব মিলল না।

এরপর আরও অনেকে মিলে ঢেলা উঠিয়ে উঠিয়ে ছুঁড়ল। তাতেও কোনো ফল হল না।

রমজান বলল, 'আরে ভেতরে ঢুকে দ্যাখ্। খুঁজে পাবি।'

'দেখেশুনে যাস, রমজান। ওর কাছে কিন্তু কৃপাণ আছে।'

'ওর মাকে...' হেসে বললেও রমজান বোঝে সাবধানের মার নেই। এই ভেবে

নিজের ছুরিটা বার করে নিল। রমজানকে গর্তে ঢুকতে দেখে ওর পেছন পেছন আরও দু'তিন জন ওর সঙ্গ নিল।

রমজান হাঁক দিল, 'বেরিয়ে আয়, ক্যাওড়া!...' আরও কয়েকজন ভেতরদিকে এগিয়ে গেল।

গর্তটা তন্ন তন্ন করে ওরা খুঁজল। কিন্তু শিখ সরদারের কোনো হদিশ করতে পারল না। অন্য কোনো খানাখন্দে ব্যাটা সেঁধিয়ে বসে আছে।

দলের একজন তখনও ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: 'ঐ যাচ্ছে, ঐদিকে চলে গেল।' বাঁদিকের দু'তিনটে ঢিবি ছেড়ে তার পরের ঢিবিটার দিকে ইশারা করে সে দেখাল। সরদারের ঝকমকে কাপড় ঐদিকটাতে তার নজরে পড়েছে।

সেইদিকে পুরো দল ছুটল। দু'তিনটে গর্তের ভেতর পাথরের শিলাবৃষ্টি হল। একটি গর্তে একটা ঢেলা সরদারের হাঁটুতে এসে লাগল। টুঁ শব্দ না করে ও পেছনে সরে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর আবার এক পশলা শিলাবৃষ্টি। কোনোটা গর্তের দেয়ালে, কোনোটা ওর হাঁটু, কাঁধ বা মাথায় এসে লাগছিল। সরদার একটু উঃ-আঃ করেই থেমে যাচ্ছিল। তিনটে গর্তেই সমানে ঢিল এসে পড়ছিল। এরপর একটি গর্ত থেকে চাপা গলায় একটা কাতরানির আওয়াজ পাওয়া গেল। এই হামলাবাজিতে ধরা পড়ে গেল ঠিক কোন্ গর্তে ঐ শিখ গুঁড়ি মেরে বসে আছে। জানার পর আরও বেশি জোরসে সেখানে ঢেলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

এই সময় ওদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ লোক মনে মনে কিছু একটা ফন্দি এঁটে চিৎকার করে বলল, 'আরে, দাঁড়া। ঢেলা মারিস নে!'

শুনে অনেকেই ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করল। তা সত্ত্বেও একেবারে বন্ধ হল না।

তখন সেই সেয়ানা লোকটা গর্তের মুখের কাছে গিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'ও সরদার, দীন্ কবুল কর্। তাহলেই আমরা তোকে ছেড়ে দেব।'

ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল কাঁপা গলার গোঙানি ভেসে এল।

'বল সরদার, ইসলাম কবুল করবি কি করবি না? যদি করিস তো নিজে নিজে বাইরে বেরিয়ে আয়। আমরা তোকে কিছু বলব না। রাজী না হলে কিন্তু ঢিল মেরে তোকে সাবাড় করব।'

ভেতর থেকে এবারও কোনো জবাব এল না। একটা-দুটো পাথর তখনও গর্তে গিয়ে পড়ছিল যাতে সরদার তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

'বেরিয়ে আয়, বজ্জাতের ডিম! না হলে ভেতরে গিয়ে তোর লাশ টেনে বার করব।'

তাও কোনো সাড়া নেই। গর্তের ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। দলের লোকজন আবার ঢিল উঠিয়ে উঠিয়ে ভেতরে ছুঁড়তে লাগল। এবার রমজান আলী একটা বড় পাথর উঠিয়ে নিয়ে গর্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এক্ষুনি বেরিয়ে আয়, নইলে এই পাথর মেরে তোকে ছাতু বানিয়ে দেব।'

কেউ কেউ হেসে উঠল। সমানে পাথর বৃষ্টি হতে লাগল।

এই সময় গর্তের ভেতর থেকে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে সরদার গর্তের মুখের কাছে চলে এল। ওর পাগড়ি খুলে গিয়ে গলায় এসে ঝুলছে। জামাকাপড়ে মাটি মাখা আর ছেঁড়া ফাটা। মাথা আর হাঁটু জায়গায় জায়গায় ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে আর চোট থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে।

তখনও সরদার মাটিতে চারপা হয়ে বসে। আর ওর চোখ চারপাশে ঘুরছে। যন্ত্রনায় ওর মুখ বেঁকে গেছে।

রমজান বলল, 'বল, কলমা পড়বি, না পড়বি না?' ওর হাতে তখনো বড় পাথরটা উঁচিয়ে ধরা।

সরদার গোড়ায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল। এবার মাথাটা ওপর থেকে নিচে হেলিয়ে দিল।

নুরদীনের পেছনে দাঁড়ানো একজন লোক সরদারকে দেখে চিনতে পারল। এ হল ইকবালসিং। মীরপুরে এর কাপড়ের দোকান ছিল। এর বাপ হরনামসিংয়ের ঢোক-ইলাহিবক্সে চায়ের দোকান ছিল। এ বোধহয় ঢোক-ইলাহিবক্সের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তায় ধরা পড়ে যায়। লোকটা একে চিনতে পারলেও যাতে চোখোচোখি না হয়, তাই নুরদীনের আড়ালে চলে গেল। তারপর আরো পেছনে চলে গেল। সে একটাও কথা বলেনি, পাথর ছোঁড়েনি। কিন্তু সঙ্গের লোকদের বারণও করেনি। লোকটা জানত সে বারণ করলেও তার কথা কেউ শুনবে না।

'মুখ দিয়ে বল, মাদার···! বল, নইলে এই পাথর দিয়ে তোর মাথা ভাঙব।'

গোঙাতে গোঙাতে ইকবালসিং বলল, 'কলমা পড়ব।'

সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী আওয়াজ উঠল:

'আল্লা-হো-আকবর!'

তারপর সবাই হেঁকে বলল:

'নারা-এ-তকবীর! আল্লা-হো আকবর!'

রমজান হাতের পাথরটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার দেখাদেখি বাকি লোকেরাও হাতের ঢিলগুলো ফেলে দিল। রমজান সামনে হাত বাড়িয়ে বলল, 'উঠে আয়, এখন তুই আমাদের ভাই।'

ইকবালসিংয়ের সারা শরীরে ব্যথা। এখনও সে কাতরাচ্ছে। ব্যথায় আর ভয়ে ও উঠে দাঁড়াতে পারছিল না।

'আয়, গলায় গলা মেলাই'—বলে রমজান ওর সঙ্গে কোলাকুলি করল।

রমজানের পর একে একে সবাই এসে ওর সঙ্গে গলায় গলা মেলাল। প্রথমে মাথাটা ডান কাঁধে রাখতে হয়, ফের মাথা উঠিয়ে বাঁ কাঁধে রাখতে হয়, তারপর আবার ফিরে ডান কাঁধে। কোলাকুলি করার এটাই হল মুসলমানী কেতা। ইকবাল সিংয়ের পা লগবগ করছিল, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু তিনচার বার মকশো করেই কোলাকুলির কায়দাটা তার শেখা হয়ে গেল।

ইকবালসিং আশা করেনি এত তাড়াতাড়ি গোটা অবস্থা বদলে যাবে। যারা ওর রক্তপানের জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিল, তারা এসে ওর বুকে বুক মেবে!

ওরা টিলার এলাকা পেরিয়ে বাইরে চলে এল। রমজান ইকবালসিংকে ধরে ছিল। তারপর ওরা গমের শিষের ঢেউ-তোলা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। ইকবালসিং তখনো হাঁফাচ্ছে। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে, ওকে বিজয়ের নিশান হিসেবে লোককে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে, না পালাতে-চেষ্টা-করা এবং শেষপর্যন্ত ধরা পড়া একজন ঘৃণ্য কয়েদি হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে? নাকি তাকে নিয়ে যাচ্ছে একজন ধর্মভাইয়ের মতন, যাকে তারা বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে! ইকবালসিং ঠিকমত চলতে পারছিল না। কম করে পাঁচটা ঢিল ওর বাঁ হাটুতে এসে লেগেছে। ওর মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এক জায়গায় জমির আল পেরোবার সময় ওর পা লগবগ করতে থাকলে পেছন থেকে নূরদীন ওকে ধাক্কা দেওয়ায় ও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠে পড়ে সে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখো রমজানজী, এখনও ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে।' এ কথাটা এমন ছেলেমানুষের মত বলল যেন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা কথার খেলাপ করে তাকে পেটাচ্ছে।

'এই, কে ধাক্কা মারছে?' বলে রমজান ওর সঙ্গীদের দিকে ফিরে মুচকি হেসে চোখের ইসারা করল।

পেছন থেকে আরেকজন রমজানকে নকল করে 'এই, কে ধাক্কা মারছে' বলে ইকবালসিংকে আবার ছোট্ট একটা ধাক্কা মারল।

ঘৃণা আর বিদ্বেষ অত তাড়াতাড়ি প্রেম আর সদিচ্ছায় রূপান্তরিত হয় না। ওটা কেবল বদলে ভাঁড়ামি আর ব্যঙ্গবিদ্রূপের চেহারা নেয়। ওরা ইকবালসিংকে আর পেটাতে পারছিল না, কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যংগবিদ্রূপ তো করতে পারে।

'দেখো রমজানভাই, পেছন থেকে কে আমাকে ঠেলা মারছে।'

ইকবালসিংয়ের তখন মানইজ্জত বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। অনেকটা জীবনকে আঁকড়ে ধরা সেই সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতন যে কেবল হাতেপায়ে ধরতে পারে, বুক ঘষটে চলতে পারে। হাসতে বললে হাসবে, কাঁদতে বললে কাঁদবে।

তখন নূরদীন আরেকভাবে মস্করা করবার ফন্দী আঁটল।

ইকবালসিংয়ের হাত ধরে টেনে থামিয়ে বলল, 'এই দাঁড়াও।'

ইকবালসিং দাঁড়িয়ে পড়ে করুণভাবে নূরদীনের দিকে তাকাল।

'এর সালোয়ার খুলে নাও, একে উদোম করে গাঁয়ে নিয়ে চল। এ আমাদের চোখে খুব ধুলো দিয়েছে।'

এরপর নূরদীন সামনে এগিয়ে গিয়ে ইকবালসিংয়ের সালোয়ারে হাত ঠেকাল। কিছু লোক তাই দেখে হাসতে লাগল।

রমজানের দিকে ফিরে ইকবালসিং অনুযোগ করল, 'দেখো রমজানজী...'

রমজান চিৎকার করে বলল, 'আ বে খবরদার, কেউ যদি সালোয়ার খুলেছ...'

'এখনও এ কলমো পড়ে নি। কলমা না পড়া পর্যন্ত এ কাফের, মুসলমান

নয়। খোলো এর সালোয়ার।'

রমজানকে স্বপক্ষে দেখে ইকবালসিংয়ের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। তাই ঝাঁঝ দেখিয়ে বলল, 'দেবো না সালোয়ার খুলতে, যা পারো করো।'

শুনে কিছু লোক হেসে উঠল। এইভাবে ইকবালসিংয়ের পেছনে লাগতে লাগতে ওকে হেয় করতে করতে দলবল শেষে গ্রামে পেঁছুল।

ইমামদীন তেলীর ডেরায় তাকে ধর্মান্তরিত করার অনুষ্ঠান-আয়োজন হল। সেখানে হাজির গ্রামের নাপিত, মসজিদের মোল্লা। তেলীবাড়ির উঠোনে তখন উৎসুক জনতার ভিড়।

নাপিতের আঙুল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চুল ঠিকমত কাটা যাচ্ছিল না। ভিড়ের মাঝখানে মাটিতে ইকবালসিং উদ্ভ্রান্তের মতো বসে। নাপিত গোড়ায় কাঁচি দিয়ে চুল কাটছিল। পরে ঘোড়ার নাদি আর চোনা দিয়ে চুলের আলাদা আলাদা গোছা বেঁধে তারপর কাটছিল। শেষে সে এনে হাজির করল ঘোড়ার চুল কাটার বড় মেশিন। মেশিন চলতেই ইকবালসিংয়ের মাথার খুলিতে যেন ঝড় নেমে এল। এইভাবে তার মাথার ব্রহ্মতালুও সাফ করা হল। এতক্ষণ পর ইকবালসিং ঘাড় সোজা করার মওকা পেল। তখনও দাড়িতে হাত পড়ে নি। দাড়ি কাটার যখন সময় এল, তখন একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল :

'দাড়ির কাট যেন মুসলমানী হয়।'

'আগে দাগ দিয়ে নিয়ে তারপর দাড়ি কাটো। গোঁফটা পাতলা করে দাও।'

ইকবালসিংয়ের চুপসে যাওয়া মুখ, তার ভয়ত্রস্ত চোখ বাদ দিলে ওকে দেখতে মুসলমানের মতই লাগছিল।

এইসময় ভিড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে নুরদীন বাড়ির মধ্যে এল। যখন ইকবালসিংয়ের চুল কাটা শুরু হয়, তখন কাউকে না বলেই সে সটকে পড়েছিল। ওর ফিরে আসা টের পাওয়া গেল ভিড় সরিয়ে যখন ও বাড়ির মধ্যে ঢুকছে।

'আ বে পিছিয়ে যা, রাস্তা দে।'

ভেতরে এসে সে সোজা ইকবালসিংয়ের পাশে গিয়ে বসল। বাঁ-হাতে ইকবাল-সিংকে হাঁ করিয়ে ডান হাতে মাংসের একটা বড় টুকরো ওর মুখে ঠুসিয়ে দিল। মাংস থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল। ইকবালসিংয়ের চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

'হাঁ কর, তোর মাকে···হাঁ কর···। এবার চুষতে থাক মাদার··· ।'

নুরদীন লোকজনদের দিকে তাকিয়ে তার লাল মাড়ি বার করে খিলখিল করে হেসে উঠল।

এই সময় মোল্লা আর গ্রামের এক বৃদ্ধ সামনে এল। বুড়ো মানুষটি নুরদীনকে এক ধমক দিয়ে সেখান থেকে উঠিয়ে দিল—'ভাগ্ এখান থেকে। তুই দীন্ কবুল করা নিজের ভাইকে জ্বালিয়ে মারছিস।'

বুড়ো মানুষটি ভেতরে আসতেই গোটা দৃশ্য অন্য চেহারা নিল। লোকে পেছনে সরে গেল। ইকবালসিংকে ধরে ধরে তোলা হল। একজন একটা খাটিয়া

দিয়ে এল, তাতে ওকে বসানো হল। বাকি অনুষ্ঠান খুব যত্নের সঙ্গে যথাযথভাবে শুরু হল।

হাতে তস্‌বী নিয়ে মোল্লা ইকবালসিংকে কল্‌মা পড়াল—

'লা ইলাহ ইল্লিল্লা
মুহম্মদ রসুল আল্লা'

তিনবার কল্‌মা আওড়ানো হল, আশপাশের লোকেরা চোখে আঙুল ঠেকাল। তারপর আঙুলে চুমো খেল। তারপর একেক করে জন কুড়ি লোক তার সঙ্গে কোলাকুলি করল।

এরপর মিছিল করে তাকে কুয়োর ধারে নিয়ে যাওয়া হল। স্নানের পর তাকে দেওয়া হল পরবার নতুন কাপড়।

স্নান করে নতুন কাপড় পরে যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সত্যি ইকবাল আহমেদ। লোকে আবার আওয়াজ তুলল:

'নারা-এ-তকবীর! আল্লা-হো-আকবর।'

মিছিল আবার ইমামদীন তেলীর ঘরের দিকে ফিরে চলল। আকাশে বাতাসে তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে এক জবরদস্ত ধর্মভাব। পড়ন্ত বেলায় ইকবাল আহমেদের সুন্নত হল। ওর পক্ষে এর ব্যথা সহ্য করা খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। মোড়ল সারাক্ষণ তাকে সাহস জুগিয়েছে, আর সুন্নতের সময় বারবার ওর কানে কানে বলেছে: 'তোর নিকা দিব, খুব সুন্দর মেয়ে তোমাকে দিব। কালু তেলীর বেওয়া তোমারই বয়সী হবে, জোয়ান স্বাস্থ্যবতী। ওকে দেখলে তোর মন নেচে উঠবে। এখন তুই আমাদের আপন। এখন তুই শেখ। শেখ ইকবাল আহমেদ।'

সন্ধ্যে হওয়ার আগেই ইকবালসিংয়ের শরীর থেকে শিখের সব লক্ষণ মুছে ফেলে সে জায়গায় মুসলমানের চিহ্নগুলো ভরে দেওয়া হয়েছে। পুরনো চিহ্ন থেকে নতুন চিহ্নে আসতে যেটুকু সময় তারই মধ্যে একটা মানুষ বিলকুল বদলে গেল। এখন আর সে শত্রু নয়, এখন বন্ধু। আর কাফের নয়, এখন মুসলমান। ওর সামনে এখন সব মুসলমানের দরজা খোলা।

খাটিয়ার ওপর শুয়ে থেকে সেদিন ইকবাল আহমেদ সারাটা রাত ছটফট করে কাটাল।

আঠারো

তুরুকরা এসেছিল। এসেছিল পাশের প্রতিবেশী গ্রাম থেকে। তুরুকদের মনে এই ছিল যে, তারা তাদের পুরনো শত্রু শিখদের ওপরই হামলা করছে আর শিখদের মনেও ছিল সেই দুশো বছর আগের তুরুক—যাদের সঙ্গে খালসারা লড়েছিল। ইতিহাসের পরম্পরায় এটাও ছিল একটা কঠিন সংগ্রামের সোপান। যারা এ লড়াইতে নেমেছিল তাদের পা ছিল বিংশ শতাব্দীতে, আর মাথা মধ্যযুগে।

হল প্রচণ্ড এক লড়াই। দুটো দিন আর দুটো রাত ধরে সমানে। অস্ত্রশস্ত্র যখন ফুরিয়ে গেল, তখন আর লড়াই সম্ভব হল না। গুরু গ্রন্থসাহেবের চৌকির পেছনে এখন সাদা চাদরে ঢাকা সাতটা লাশ। পাঁচটা লাশের মাথা নিজেদের কোলে নিয়ে বসে আছে তাদের সহধর্মিণীরা। অনেক করে অনুনয় বিনয় করলে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে তারা উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু তেজাসিং ঘাড় ফিরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফের এসে বসে যাচ্ছিল। দুটো লাশের কোনো ওয়ারিশ ছিল না, তার মধ্যে একটা ছিল নিহাং-সিংয়ের। যখন মুষলধারে গুলিবৃষ্টি হচ্ছিল, তখনও সে গোঁফ মুচড়ে, বুক টান করে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য লাশটা ছিল শহর থেকে দাঙ্গা থামাতে আসা সোহনসিংয়ের। এই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে সে যখন শেখ গোলাম রসুলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় গলির মোড়ে পৌঁছে সে খুন হয়। ওর লাশ সেখানেই পড়ে থাকত। কিন্তু কিছু মুসলমান গভীর রাত্তিরে তার লাশ গুরুদ্বারের সামনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল এটাই বোঝাতে যে, সোহনসিংকে তোমরা যে প্রস্তাব দিয়ে পাঠাচ্ছিলে এটা তারই সমুচিত জবাব। সোহনসিংয়ের লাশ এককোণে পড়ে ছিল, মাথা কোলে করে নিয়ে বসার মত কেউ তার ছিল না। সোহনসিংয়ের মৃত্যুর কিছু আগে তার মতো মীরদাদেরও একই হাল হয়েছিল। শান্তিরক্ষার কাজে তাদের অবস্থা নিছক ভগ্নদূতের ভূমিকায় পর্যবসিত হয়েছিল।

এছাড়া আরও লাশ গঞ্জের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। এসময়ে তাদের সৎকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। খালসা স্কুলের চাপরাসির লাশ ইস্কুলের উঠোনেই পড়ে ছিল। যেদিন দাঙ্গা হয়, যখন গুরুদ্বারে সবাই এসে জমায়েত হচ্ছিল তখন চাপরাসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে যেন বুক ফুলিয়ে ইস্কুলেই থাকে। চাপরাসির বউ বেঁচে গিয়েছিল, গাঁয়ের মোড়ল তাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। ফলে তার গায়ে আঁচড় লাগেনি। ভাগাঁ-মার লাশ তার বাড়ির উঠোনেই পড়ে রয়েছে। ভাগাঁ-মা মরে গেলেও তার গয়নাগুলো বেহাত হতে পারেনি। কারণ গয়নাগুলো ছিল দেয়ালের গায়ে লুকোনো। যারা হামলা করতে এসেছিল তারা সেটা টের পায়নি। তার ঘর যে পুড়িয়ে দেয় নি, তার কারণ তার ঘরের ঠিক লাগাও ছিল রহিম তেলীর ঘর। এক ঘায়েই ভাগাঁ-মার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। বুড়ো সওদাগরসিংও মরে পড়ে ছিল। ওকেও গুরুদ্বারে আনার কথা লোকের মনে ছিল না। গঞ্জের বাইরেও কোথাও কোথাও লাশ পড়ে ছিল। একটা লাশ পড়ে ছিল কুয়োর ধারে মুখ থুবড়ে। একটি লোককে ভুলক্রমে মারা হয়েছিল। সে ছিল গঞ্জের ভিস্তিওয়ালা আলাহর খাঁ। শেখের বাড়িতে জল ফুরিয়ে যাওয়ায় বাচ্চারা তেষ্টায় কাঁদছিল। তাই দেখে আলাহর খা চাঁদনি রাতে দাঙ্গার মধ্যেও ভিস্তি নিয়ে কুয়ো তলায় এসেছিল জল নিতে। সেই সময় ওই শেখেরই বাড়ির ছাদ থেকে অব্যর্থ নিশানায় গুলি এসে সোজা তার পিঠে লেগেছিল। শহর থেকে আসবার রাস্তায় একজন সরদারের লাশ পড়ে ছিল। ফতেদীন রুটিওয়ালার দোকান ছিল গুরুদ্বারে যাওয়ার রাস্তার গলির বাঁদিকে।

ফতহদীন বেঁচে গেছে বটে কিন্তু তার দোকানে যে দুটি ছোট ছেলে কাজ করত তারা দুজনেই মারা পড়েছে। দাঙ্গার মধ্যেও তারা থেকে থেকেই দোকান ছেড়ে বাইরে চলে যেত। কখনও এ-ওকে ধরতে ছুটত, কখনও গলির ভেতরেই এটা-সেটা খেলত। এছাড়া পুড়ে-যাওয়া খালসা ইস্কুল থেকে এখনও ধোঁয়া বার হচ্ছে। বাঁদিকের গলির মাথায় নদীর ঠিক ওপরদিকে শিখদের সমস্ত বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কসাইয়ের তিনটে মাংসের দোকান আর তেলীপাড়ায় মুসলমানদের তিন চারটে ঘর এখনও জ্বলছে।

এখন গুরুদ্বারে আর অস্ত্রশস্ত্র বলতে কিছু নেই। ছাদে মোতায়েন বিষণসিং দু-এক মিনিট অন্তর অন্তর এক আধটা গুলির ফাঁকা আওয়াজ করছিল যাতে শত্রুদের ধারণা হয় যে, এদিকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যোদ্ধারা প্রস্তুত। কিন্তু ভেতরের অবস্থা ছিল খুবই কাহিল। সারা গুরুদ্বারে একটা থমথমে ভাব, প্রত্যেকে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু কারো মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। 'বারুদ শেষ হয়ে আসছে'—কথাটা যে কার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল কেউ জানে না, তবে যারই কানে গেছে তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা হালছাড়া ভাব। অন্যদিকে শেখদের 'কেল্লা'তেও গোলাবারুদ শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু নিজেদের অবস্থা গোপন করার জন্যে তারা বারবার উচ্চনিনাদে স্লোগানের শাক দিয়ে মাছ ঢাকছিল। 'আল্লা-হো-আকবর' এই আওয়াজ এখন একদিকের বদলে তিনদিক থেকে আসছে। তার জবাব গুরুদ্বার থেকেও দেওয়া হচ্ছিল, আগের চেয়ে আরো জোরে—কিন্তু তার শূন্য-গর্ভতা সবাই ধরে ফেলেছিল।

চরদের খবর ছিল, বাইরে থেকে মুসলমানদের সহায়-সম্বল এসে পড়ছে। এদিকে ঠিক সেই সময় বাইরের সঙ্গে শিখদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দুজন লোককে লুকিয়ে চুরিয়ে কহুটায় পাঠানো হয়েছে সাহায্য পাওয়ার জন্যে। তারা এখনও ফিরে আসেনি। যুদ্ধপরিষদের অভিমত হল, পয়সার লেনদেন করে একটা রফা করে নেওয়া হোক। এ বিষয়ে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে শেখদের সঙ্গে একটা আপোষ-আলোচনা শুরুও করে দিয়েছিল।

গুরুদ্বারের ভেতরে দরজার পাশে যুদ্ধ পরিষদের পাঁচজন সদস্য তেজাসিংজীর সঙ্গে মীমাংসার শর্তাবলী নিয়ে আলোচনায় বসেছিল।

'দু লাখ চাইছে। দু লাখ আমরা দেব কোথা থেকে?' তেজাসিংজী উষ্মার সঙ্গে বললেন।

একজন সদস্য প্রশ্ন করল, 'আমাদের ছোট গ্রন্থীকে আপনি কোনো কথা বলে পাঠিয়েছিলেন?'

সোহনসিং মারা যাবার পর আপোষ-মীমাংসার কথা বলার জন্যে তেজাসিংজী মীরদাদকে মধ্যস্থ বানাবার চেষ্টা করেছিলেন। তার কারণ, মীরদাদ দাঙ্গার আগে থেকেই সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মীরদাদ যখন জানতে পারল টাকা লেনদেন করে গুলি চালানো বন্ধ করা হবে, তখন সে বেঁকে বসে। তেজাসিং তখন উপায়ান্তর

না দেখে গ্রন্থীর ছোট ভাই, যাকে সবাই 'ছোট গ্রন্থী' বলে ডাকে, তাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

তেজাসিংজী বললেন, 'আমি তাকে বলতে বলেছিলাম কুড়ি তিরিশ হাজার। কিন্তু ওরা চাইছে দু লাখ।'

'আমাদের যে অবস্থা কাহিল, হয়ত ওরা তা টের পেয়ে গেছে।'

মুন্দী হীরাসিং সতেজে বলল, 'ওদের বাপেরও ক্ষমতা নেই টের পাওয়ার। আমরা ওদের কম লোক মারিনি। ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য উনিশ-বিশের। সিংজী, আমাদের পোড়া কপাল যে আমাদের গুলিগোলা ফুরিয়ে গিয়েছে…।'

দূর থেকে রব ভেসে এল, 'আল্লা-হো-আকবর!'

একজন সদস্য জিজ্ঞেস করল, 'গয়নাগাঁটি কেমন জমা পড়েছে?'

তেজাসিংজী উঠে গুরু গ্রন্থসাহেবের কাছে রাখা একটা বাক্সের কাছে গেলেন। বাক্সের মধ্যে মেয়েদের গা থেকে খুলে খুলে দেওয়া গয়নাগুলো রাখা ছিল। বাক্স খুলে তেজাসিংজী নিজের দুহাতে গয়নাগুলো তুলে ধরে তার বাজারদর যাচাই করার চেষ্টা করলেন।

'উঁহু, বিশ-পঁচিশ হাজারের বেশি হবে না…ওরা চাইছে দু লাখ। আমরা কোথা থেকে দেব।'

'তা আপনি চাইলে একাই দু লাখ দিতে পারেন, তেজাসিংজী। আপনার তো অগাধ টাকাকড়ি।'

তার এই টিপ্পনী গায়ে না মেখে তেজাসিংজী বললেন,

'গিয়ে বলো পঞ্চাশ হাজার দেব।'

'পঞ্চাশ হাজার বড় কম, ওরা রাজি হবে না।'

'আহা, তুমি বলেই দেখ না কম দিয়ে শুরু করলে তবেই তো একলাখে উঠে রফা হতে পারে।'

তেজাসিংজী ছোটগ্রন্থীকে ডেকে বললেন, 'যাও গ্রন্থীজী, ওদের সঙ্গে শেষমেষ এক লাখে ফয়সালা করে নাও। তবে শর্ত হল, বাইরে থেকে আমদানী করা লোকেরা নদীর ওপারে চলে যাবে, তারপর ওরা ওদের তিনজন প্রতিনিধি পাঠাবে। আমাদের লোকজনেরা থলি নিয়ে তাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

ছোটগ্রন্থী হাত জোড় করে বলল, 'সৎ বচন, মহারাজ! এখন ওরা যদি বলে আগে থলি দাও, পরে আমাদের লোকেরা নদী পার হবে। তাহলে?'

এতে মুন্দী হীরাসিং আবার তেতে উঠল: 'কী? আমাদের কথায় অবিশ্বাস? আমরা কী লাহোরিয়া, না অমৃতসরিয়া যে আজ এক কথা কাল অন্য কথা বলব? আমরা হলাম সৈয়দপুরিয়া। পাথরে লেখা আমাদের জবান।'

সৈয়দপুরের বাসিন্দা হওয়ার গুমোর শিখদেরও যেমন, মুসলমানদেরও তেমন। এদের সকলেরই সৈয়দপুরের লালমাটি, উপাদেয় গম, লুকোট ফলের বাগান—এ সমস্তই ছিল গর্বের জিনিস। সৈয়দপুরের কড়া শীত, বরফের মতন কনকনে হাওয়া—ঐ নিয়েও তারা বড়াই করত। সেইভাবেই তারা গর্ব করত নিজেদের অতিথিবাৎসল্য

নিয়ে। নিজেদের দরাজ দিল্ আর আমুদে মেজাজের জন্যে। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর দুপক্ষেরই সৈয়দপুরিয়ারা নিজেদের স্থানমাহাত্ম্যে ডগমগ হয়ে বুক ঠুকে মাঠে নেমে পড়েছিল।

চাঁদ আবার আকাশে হেসে উঠেছে। ফলে, রাত্তিরে প্রহরীদের গা ছমছম করছিল। আজ রাত্তিরে আবারও গোলাগুলি চললে কী না হতে পারে। ঘরে আগুন লাগতে পারে, লুটপাট হতে পারে। এখন মনে হয় আগে কার, সব সিদ্ধান্তই ভুল ছিল। গুরুদ্বারে জমায়েত হওয়াটা ছিল ভুল। শেখ গোলাম রসুল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় ইতি টানাটা ভুল হয়েছিল। ভুল যে কত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যদি শত্রুকে হার মানানো যেত, তাহলে এই ভুল রণনীতিকেই তখন মোক্ষম চাল বলে মনে করা হত।

শেখ গোলাম রসুলের বাড়ির বাইরের চাতালে বসে কিছু লোক কথা বলছিল। এদেরও নিজেদের লাশগুলোর দাফন করার সুযোগ হয়নি। তবে গুরুদ্বার হল একটা ঘেরা জায়গা। তার অবস্থা একটু আলাদা। এখানে শেখের বাড়ি খোলা জায়গায়। আশপাশের সমস্ত গ্রামের সঙ্গেই তাদের সরাসরি সম্পর্ক।

চাতালে বসে থাকা ধর্মযোদ্ধারা সব বহিরাগত। তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কেরামতির বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিল। তারা বলছিল নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা ঃ

'আমরা যখন গলিতে ঢুকেছি, তখন বজ্জাতের দল পালাতে শুরু করেছে। কেউ এদিকে যাচ্ছে, কেউ ওদিকে যাচ্ছে। এক হিন্দু মেয়ে নিজেদের বাড়ির ছাদে উঠে পড়েছিল। আমাদের সেটা চোখে পড়েছিল। আমরা দশ বারোজন ওর পিছু নিয়ে সোজা ছাদে চলে গিয়েছি। ও যখন ছাদের পাঁচিল টপকে অন্য ছাদে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই খপ করে আমরা তাকে ধরেছি। নবী, লালু, মীর, মুর্তজা একে একে সবাই এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একজন অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'সত্যি ?'

'আল্লার কসম। যখন আমার পালা এল, তখন নিচে থেকে হুঁ-ও নেই, হাঁ-ও নেই। নড়ছেও না, চড়ছেও না। চেয়ে দেখি মেয়েটা মরে গেছে।' কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'লাশের সঙ্গেই আমি সঙ্গম করে যাচ্ছিলাম।'

ওর এক সঙ্গী হেঁকে উঠে বলল, 'সত্যি ?'

'কোরান শরীফ ছুঁয়ে বলছি। আমি মিথ্যে বলছি না। বিশ্বাস না হয়, জালালকে জিজ্ঞেস কর। জালালও আমাদের সঙ্গে ছিল। সেই সময় আমি দেখি কী, মেয়েটা মরে গেছে।' বলে মুখ বেঁকিয়ে থুথু ফেলল।

আরেক ধর্মযোদ্ধা তখন বলতে শুরু করল : 'সময় সময় এরকম ঘটেছে। এক বাগড়ী মেয়েকে আমি গলিতে ধরেছিলাম। এক কাফেরের ঘর থেকে আমি তখন বেরিয়েছি। আমার তখন বেজায় হাত চলছে। যে সামনে আসছে এক কোপেই তার মুণ্ডু কাটছি। এই মেয়েটা আমার সামনে এসে পড়ে চিৎকার করতে

শুরু করে দিল। হারামজাদা বলে চলেছিল, 'আমাকে মেরো না! আমাকে তোমরা সাতজনে মিলে রেখে দাও। কিংবা একজন একজন করে যা ইচ্ছে তাই করো। আমাকে মেরো না।'

'তারপর?'

'এর আর পর কী? আজীজ তার ছোরা সোজা বুকে বসিয়ে দিল। ব্যস, পড়ল আর মরল।'

ঢালের ওপর ছড়ানো চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে ছোটগ্রন্থী আস্তে আস্তে নেমে আসছিল। নদীর ধারে মুসলমানদের প্রতিনিধিরা সন্ধিবার্তার জন্য অপেক্ষা করছিল। গুরুদ্বারের একটা জানালা দিয়ে ঢালু জায়গাটা চোখে পড়ে। তাই অনেকে ভিড় করে রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার ভেতর দিয়ে ছোটগ্রন্থীকে দেখছিল। চাঁদের আলোয় শুধু দেখা যাচ্ছিল একটি ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে নিচে নামছে। এই সময় ছাদের ওপর ছুটে পালানোর পদশব্দ শোনা গেল। আর নিহাং-সিং সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল: 'পশ্চিম থেকে দাঙ্গাবাজেরা আসছে। শত্রুপক্ষ সহায়-সম্বল পেয়ে গেছে।'

আর দেখতে দেখতে দূর থেকে দাঙ্গাবাজদের পরিচিত আওয়াজ কানে এল। ঢোল বাজানোর আওয়াজ আর 'আল্লা-হো-আকবর' বলে চেঁচিয়ে ওঠার আওয়াজ।

তেজাসিংজীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। জানলা দিয়ে বড়গ্রন্থী তার ভাই ছোট গ্রন্থীকে নেমে যেতে দেখছিল। বড়গ্রন্থী চিৎকার করে উঠল, 'যাস নে, মেহরসিং। ফিরে আয়।'

কিন্তু ছোটগ্রন্থী শুনতে পেল না। সে নদীর পাড় বরাবর নুড়ি পাথরের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছিল।

বড়গ্রন্থী চেঁচাচ্ছিল, 'ফিরে আয়, মেহরসিং! ফিরে আয়!' এরপর আরও অনেকে চেঁচাল। ছোটগ্রন্থী একবার থেমে পেছন দিকে তাকাল। তারপর আবার চলতে শুরু করে দিল।

ঢোল পেটাতে পেটাতে দাঙ্গাবাজদের এগিয়ে আসার আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছিল। তাতে সাড়া দিয়ে এবার নদীর ধারে দাঁড়ানো ধর্মযোদ্ধারাও 'আল্লা-হো-আকবর' বলে চেঁচাতে লাগল। ছোটগ্রন্থী চাঁদনি রাতের আলোছায়ার দৃশ্যপটে আস্তে আস্তে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল।

জানলা থেকে এই সময়ে খুব একটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও মনে হল, কিছু লোক ছোটগ্রন্থীর সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে এগিয়ে এল। ওদের এটাও মনে হল যে, ওরা যেন ছোটগ্রন্থীকে ঘেরাও করে ফেলেছে। যেন এও মনে হল যে, কয়েকটা লাঠি উঁচানো হয়েছে এবং সেইসঙ্গে কিছু জিনিসে চাঁদের আলো পড়ে চকমক করছে। হয়ত তার মধ্যে ছিল কারো কুড়ুল, কিংবা ছোটগ্রন্থীর তরোয়াল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার 'আল্লা-হো-আকবর' রণধ্বনিটি বহুকণ্ঠে মুখরিত হল।

তেজাসিংয়ের বুক হিম হয়ে গেল। বড়গ্রন্থী পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'মেরে ফেলেছে আমার ভাইকে ওরা মেরে ফেলেছে।' আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে বড়গ্রন্থী খালি পায়ে একেবারে নিরস্ত্র হয়ে গুরুদ্বার থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

'থামাও! থামাও ওকে!' কেউ চিৎকার করে বলল। শুনে দরজায় দাঁড়ানো নিহাং-সিং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঢালের মাঝামাঝি রাস্তা থেকে গ্রন্থীজীর কোমর পাকড়ে ধরে, কোনোরকমে পাঁজাকোলা করে ফিরিয়ে আনতে লাগল।

ঢোলকাঁকের আওয়াজ গ্রামে এসে পৌঁচেছিল। চারদিক থেকে রব উঠছে। আবার বন্দুক গর্জে উঠল। লোক এদিক ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

'যো বোলো সো নিহাল!
সৎ সিরি অকা···ল!'

বাতাস ফুঁড়ে আওয়াজ উঠল।

হাওয়ায় হিসহিসিয়ে উঠল তলোয়ার। আর সেইসঙ্গে খোলা তলোয়ার নাচাতে নাচাতে একদল শিখ ঢাল বেয়ে দুশমনদের দিকে যুদ্ধং-দেহি বলে ছুটে চলল। বড়গ্রন্থীও ছিলেন এই দলে। তাদের প্রত্যেকের খোলা চুল। রণধ্বনি মুখে নিয়ে পাথরের ওপর এলোমেলো পা ফেলে, তারা যেন 'মারো নয় মরো' এই প্রতিজ্ঞায় নিজেদের বেঁধে নিয়েছে।

গুরুদ্বারের ভেতরে বাঁদিকের দেয়ালের দিকে আবালবণিতার ভিড়। বাইরে চিৎকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেয়ে নিজে থেকেই এক জায়গায় এসে জমাট বেঁধে গেছে।

যশবীর কাউরের মুখে ভর করেছিল যেন একটা উন্মত্ততার ভাব। ওর কোমরে ঝোলানো কৃপাণের মুখ এখনই সে শক্ত করে চেপে ধরেছে।

মেয়েরা আপনা থেকেই গায়ত্রীর মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিল। গুরুদ্বারে ওদের সেই গুঞ্জন ক্রমশ উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হতে থাকল।

সেই সময় বাঁ হাতের গলির ওপাশের বাড়িগুলোর পেছন থেকে আগুনের শিখা উত্তরোত্তর উঁচু হয়ে উঠছিল। আর চারদিকে আগের চেয়েও বেশি লালিমা ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'আগুন লেগেছে! আগুন! ইস্কুলের পাশের গলিতে। বিষণসিংয়ের বাড়ি জ্বলছে।' যশবীরের কানে গেলেও দেখে মনে হল না ও শুনেছে। ওর শরীরে বার বার কিসের যেন একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। চোখের সামনে সব কিছু সে আবছা দেখছে। যেন সব কিছু তরঙ্গে ভাসছে। আধফোটা আলোয় যেন সব কিছু তার চারপাশে ঘুরছে। মেয়েদের মাঝখানে ঠিক আলোর নিচে সে দাঁড়িয়ে, ওর চোখমুখ দিয়ে এখন যেন জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে।

গলির বাঁ দিকের মাথায় যে রক্ষাব্যূহ ছিল, সেটা বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ল। জ্যোৎস্নাস্নাত ঢালের ওপর কিছু লোক বুকে হেঁটে ওপরে উঠছে নজরে এল। ছাদের ওপর মোতায়েন নিহাং-সিংয়েরই সেটা প্রথম চোখে পড়ে। দেখার

পর সে বলে বিষনসিংকে। কিন্তু বিষনসিং হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাড় কাত করে বসে রইল। ঢালের ওপর দিয়ে উঠে আসা কিলবিল করা মূর্তিগুলোর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আর এখন আগুনের আলোয় তাদের ক্রমশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু গুলি-বারুদ কোথায় যে ওদের দিকে বন্দুক ছুঁড়বে? বিষণসিং দু-একবার বন্দুক ছোঁড়ার পর নিরুপায় হয়ে এখন চুপচাপ বসে আছে।

গুরুদ্বারের বাইরে শিখদের আরও একটা জাঠা চুল এলো করে দিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বাঁদিকের গলির দিকে এগিয়ে গেল। কেননা রক্ষাব্যূহ ভেঙে পড়ায় তুরুকরা এই পথ দিয়েই গুরুদ্বারের ওপর আক্রমণ করবে।

ঠিক সেই সময় শোনা গেল চিৎকার-চেঁচামেচি আর বার কয়েক গুলি ছোঁড়ার শব্দ। এরপর হঠাৎ আকাশ-ফাটা আওয়াজ শোনা গেল: 'আল্লা-হো-আকবর।'

আর তলোয়ার নাচাতে নাচাতে সরদাররা গলির অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ঐ সময়ে উজ্জ্বল পোশাকে মেয়েরা গুরুদ্বারের একটি দরজা দিয়ে বাইরে বেরোচ্ছিল। আগে আগে চলেছিল যশবীর কাউর। তার অর্ধনিমীলিত চোখ। জ্বলজ্বল করা চেহারা। প্রায় সব মেয়েই নিজেদের দোপাট্টা মাথা থেকে খুলে গলায় জড়িয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকেরই খালি পা। প্রত্যেকেরই মুখে একটা উদ্দীপিত ভাব। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা গুরুদ্বার থেকে বেরিয়ে আসছিল।

'তুরুকরা এসে গেছে! তুরুকরা এসে গেছে।' এই বলে কিছু মেয়ে চেঁচাচ্ছিল। কেউ গুরুবাণী পাঠ করছিল। কেউ উন্মাদের মত চিৎকার করে যাচ্ছিল: 'যেখানে আমার সিংহবীর গিয়েছে, সেখানে আমিও যাব।

কিছু মেয়ের সঙ্গে ছিল তাদের বাচ্চা। কারো কারো বাচ্চা ছিল তাদের কোলে। কেউ কেউ তাদের বাচ্চাকে হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেছিল।

গুরদ্বার থেকে বেরিয়ে মেয়েদের এই দলটা গলির ডানদিকে মোড় নিয়ে তারপর বাঁদিকে ঘুরে গেল। কিছুদূর যাবার পর দুটো বাড়ির মাঝখানে ছোট যে পাকদণ্ডী ঢাল বেয়ে নেমে এসে তারপর পাক খেয়ে সোজা চলে গেছে ইঁদারার দিকে, সেই পথ দিয়েই মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছিল।

চারদিকে একটা হাহাকার। দুটো জায়গা থেকে এই সময় আগুনের শিখা লী লী করে জ্বলতে দেখা গেল। ঢালের গায়ে দালানগুলোর দেয়ালে। গলির ইঁটের মেঝেতে সেই আগুনের ছায়াগুলো নাচছিল। নদীর জলে লাল অগ্নিশিখার ছায়া ঝিলমিলিয়ে উঠছিল। নদীর জল তখন আপনাআপনি রক্তবর্ণ। সেই হাহাকার ধ্বনির মধ্যে ঘরের দরজা ভাঙার শব্দ ভেসে আসছিল। গঞ্জ এলাকায় লুটপাট শুরু হয়ে গিয়েছিল। গুরুদ্বারের সামনে গলির মাঝামাঝি নিহাং-সিং বল্লম উঁচিয়ে চিৎকার করছিল:

'আয় তুরুক, আয়! কত তোর শক্তি আছে, আয় দেখি! আমি তোদের দেখে নেব। আয়!'

মেয়েদের দঙ্গল ইঁদারার দিকে এগিয়ে চলেছিল। ইঁদারাটা ছিল ঢালের নিচে বাঁহাত বরাবর। এখানে গাঁয়ের মেয়েরা যেত স্নান করতে, কাপড় কাচতে আর

গম্পগ্রুজব করতে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা সেইদিকে সবাই মিলে এগিয়ে চলছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—এসব কোনো বোধ তখন ছিল না। ছিটকে আসা চাঁদের আলোয় সেখানে যেন অপ্সরার দল নেমে আসছে।

সবার আগে যশবীর কাউর ইঁদারার মধ্যে ঝাঁপ ছিল। যশবীর কোনও ধ্বনি দেয় নি, কাউকে ডেকে নেয় নি। শুধু বলল, 'বাহগুরু!' বলেই জলে লাফিয়ে পড়ল। ওর লাফ দিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঁদারার বাঁধানো পাড়ে আরও অনেক মেয়ে উঠে পড়ল। প্রথমে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল হরিসিংয়ের বউ। তারপর আবার তার চার বছরের ছেলেটাকে হাত ধরে টান দিয়ে ওপর তুলল। তারপর হেঁচকা টান দিয়ে একসঙ্গে দুজনে ইঁদারার মধ্যে ঝাঁপ দিল। দেবসিংয়ের বউ তার দুধের বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধরে লাফিয়ে পড়ল। প্রেমসিংয়ের বউ নিজে ইঁদারায় ঝাঁপ দিল, পেছনে তার বাচ্চা একা পড়ে রইল। জ্ঞানসিংয়ের বউ এসে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তাকে মার কাছে পেঁছে দিল। দেখতে দেখতে গাঁয়ের জন দশেক মা তাদের সন্তানদের নিয়ে ইঁদারায় ঝাঁপ দিল।

তুরুকের দল যখন সত্যিই মৃতদেহ মাড়িয়ে মাড়িয়ে গুরুদ্বারের দিকে এগোচ্ছে, তখন গুরুদ্বার সম্পূর্ণভাবেই স্ত্রীবর্জিত। ইঁদারার ভেতর থেকে তখন ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি আর বাচ্চাদের আর্তরব। রোজকার মতো তখনও বয়ে চলেছিল স্বচ্ছ শীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় গ্রামের বাইরে মাঠে মাঠে পাকা গমের শীষগুলো দুলছে। হাওয়ায় ম' ম' করছে লুকাট ফুলের গন্ধ। তার সঙ্গে এসে মিশে যাচ্ছে ঝোপেঝাড়ে এই মরশুমে ফোটা সাদা সাদা ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ। কোনো কোনো সময় ভেসে আসে লুকাটের বাগান থেকে তোতার ঝাঁকের পাখা ঝাপটানোর শব্দ আর চিঁ-চিঁ করে উড়ে যাওয়ার আওয়াজ। নদীর জলে নীলচে ভাব। ঝিরঝিরে হাওয়ায় জলে ঢেউয়ের কাঁপন।

রাত্তিরে যে কখন লুটপাট শেষ হয়েছে কে জানে! গুরুদ্বারের গলি বাদ দিলে গোটা গাঁয়েই মুসলমান আর শিখদের বাড়িঘর পাশাপাশি হওয়ায় বেশি ঘরে মুসলমানেরা আগুন লাগিয়ে উঠতে পারে নি। ইস্কুলগুলো ছিল আলাদা আলাদা। আর ছিল কিছু একটেরে বাড়ি। সকাল হওয়ার পর আগুনের তেজ কমে এসেছে। ছোট বাড়িগুলো পুড়ে ছাই হতে দেরি হয়নি। জ্বলন্ত বাড়িগুলো থেকে এখন বেশি পরিমাণে বার হচ্ছে হলুদবর্ণ ধোঁয়া।

গুরুদ্বারে একটিমাত্র বাতি এখনও জ্বলছে। যুদ্ধপরিষদের চারজন সদস্য যেন অন্তিমকালের অপেক্ষায়। ক্লান্ত অবসন্ন তেজাসিংজী গুরুদ্বারের ভাঁড়ার ঘরে একটা গমের বস্তার ওপর মাথা নুইয়ে বসে আছেন। বিষণসিং এখনও ছাদের ওপর তাঁর নিজের চেয়ারে আসীন। একা নিহাং-সিং এখনও প্রবেশদ্বারে পাহারায় রয়েছে।

সকালের আলো ফুটে উঠতেই ঝাঁকে ঝাঁকে কাক-চিল আকাশে উড়তে লাগল। দেখা গেল অনেক শকুনিও মাথার ওপর পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ইস্কুলের বাইরে পাতাঝরা গাছে দশ-পনেরোটা শকুন এসে বসে গেল। কিছু শকুন ইঁদারার ধারে

গিয়েও বসল। ইঁদারার মধ্যেকার লাশগুলো ততক্ষণে ফুলে ফুলে ইঁদারার মুখের কাছে চলে আসার উপক্রম হয়েছে। অনেক বাড়ির পাঁচিলেও জায়গায় জায়গায় শকুনেরা এসে বসেছে। গলিগুলো শুনশান হয়ে পড়ে আছে। ছড়ানো মৃতদেহের গন্ধ নিস্তব্ধতাকে আরও ভারী করে তুলেছে। গ্রামের রাস্তায় এখন পা টিপে টিপে হাঁটলেও লোকের কানে তার আওয়াজ যাবে। দাঙ্গাবাজের দল লুটপাট করে লুটের মাল নিয়ে সরে পড়েছে। তাদের মরেছে ও অনেক। গুরুদ্বার থেকে ইঁদারায় যাবার রাস্তায় মেয়েদের পরান্দা (খোঁপায় ঝোলানোর ট্যাসেল), ওড়না, চুড়ি পড়ে আছে। বিশেষ করে গুরুদ্বারের কাছে জায়গায় জায়গায় ছত্রাকার হযে পড়ে আছে হাত থেকে পড়ে ভাঙ্গা চুড়ির টুকরো। গলির মধ্যে লুণ্ঠনের কাহিনী বলবার জন্যে আছে ভাঙ্গা আর খালি সিন্দুক, ক্যানেস্তারা, খাট। বাড়ির দরজাগুলো হয় আধখোলা, নয় ভাঙা। এখানে সেখানে সেই ঝঞ্ঝার চিহ্ন, যা কাল সারা রাত ধরে সব কিছু ওলট পালট করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু লড়াই তখনও থামেনি। মোটা কসাইয়ের ছেলে চোরাগোপ্তাভাবে গুরুদ্বারের পেছনে এসে পেঁছিছিল। গুরুদ্বারের পেছনে জানালাগুলোতে তেল ছিটিয়ে সে আগুন লাগাবার তোড়জোড় করছিল।

হঠাৎ আকাশপথে একটা আজব আওয়াজ হতে শোনা গেল: গমগমে, ঢিমে ঘর্ঘর শব্দ। কিসের আওয়াজ? সে আওয়াজ ঘরের মধ্যে বসে থাকা তেজাসিংজীর কানেও পেঁছিছিল। গুরুদ্বারের ছাদে মোতায়েন বিষণসিংও সে আওয়াজ শুনেছিল। শেখদের হাবেলীর সবার কানেই সেই শব্দ পেঁছিছিল। সবাই শুনে থ' হয়ে গেল। গুরুদ্বারে আগুন লাগাতে গিয়েছিল মোটা কসাইয়ের যে ছেলে, ঐ আওয়াজ শুনে তারও আক্কেল গুড়ুম। কিসের আওয়াজ ওটা? একটা অতলস্পর্শী ঘর্ঘর শব্দ। আর সে আওয়াজ ক্রমাগত চড়ছে। দরজা আর দেওয়ালের আড়াল থেকে দু-একজন লোক বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। চেয়ারে বসা বিষণসিং উঠে বসল। তারপর এক ছুটে পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়াল।

হাওয়াই-জাহাজ। বেশ বড়সড়। কালো ডানাওয়ালা হাওয়াই জাহাজ। পাহাড় আর উপত্যকার ওপর দিয়ে পাখা মেলে ঘর্ঘর শব্দে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। কখনও পাখার রং মসীকৃষ্ণ, কখনও বা রুপোর মতো ঝকঝকে। কখনও ডানদিকের পাখা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কখনও বাঁদিকের পাখা। উড়োজাহাজটা শূন্যে যেন খেলা দেখাতে দেখাতে চলে আসছে।

হাওয়াই জাহাজ যখন কাছে এসে পড়েছে—তখন সবাই উঠে উঠে বাইরে চলে এল। গলি, ছাদ, চাতাল সবকিছু দাঁড়ানো লোকের ভিড়ে ভরে গেল। সবাই উন্মুখ হয়ে উড়োজাহাজ দেখতে লাগল। গ্রামের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে যখন আরও নিচে নেমে এল তখন দেখা গেল উড়োজাহাজ চালাচ্ছে একজন গোরা পল্টন। সে হাত নেড়ে নিচের লোকদের অভিবাদন জানাচ্ছে। উড়োজাহাজটার বড় বড় ডানার নিচে দাঁড়ানো কিছু লোক নাকি সেই গোরা পল্টনকে হাসতেও দেখেছিল।

'লোকটা হাসছিল। হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি।' বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি

ছেলে আরেকটি ছেলেকে বলছিল 'লোকটার হাতে ছিল সাদা দস্তানা। ও হাত নাড়ছিল তুই দেখিসনি?'

সবার হাত থেমে গিয়েছে এখন আর কিছু হবে না। ইংরেজদের কাছে খবর পেঁছে গেছে। এবার কেউ আগুনও লাগাবে না। বন্দুকও চালাবে না। গুরুদ্বারের জানলায় তেল ছিঁটিরে দিয়ে শুধু দেশলাই জ্বালাবার অপেক্ষায় ছিল মোটা কসাইয়ের একটি ছেলে, তার হাত গুটিয়ে নিল : লোকে মুখ তুলে তুলে ঠায় উড়ো জাহাজটাকে দেখছে।

ককপিটে বসে থাকা গোরা পল্টন গুরুদ্বারের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হাত নাড়ল। নিচে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে বিষাণসিংয়ের মনে হল ওই গোরা বিমান-চালক যেন তাকে লক্ষ্য করেই হাত নেড়েছে। সাথী সৈনিককে দেখে, ওকে সে অভিনন্দন জানিয়েছে। যে বিষাণসিং এতক্ষণ ক্লান্ত আর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ উঠে এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গোড়ালিতে গোড়ালির ঠোক্কর মেরে স্যালিউট করল। কেননা সৈনিক সব সময়ই সৈনিক, তাদের একজনের সঙ্গে আরেক-জনের দেখা হলে স্যালিউট না করে পারে না। বিষাণসিং হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। বর্মার লড়াইতে সে যখন ছিল প্রত্যেক সন্ধ্যায় সে ক্যাপটেন জ্যাকসনের সঙ্গে দেখা করতে যেত। জ্যাকসন সব সময় খুব মন দিয়ে ওর কথা শুনতেন আর বিষাণ সিং স্যালিউট করলে তিনিও নিয়মমত স্যালিউট করতেন।

বিষাণসিং আবেগের বশবর্তী হয়ে হাত নেড়ে নেড়ে চীৎকার করে বলল :

'গড সেভ দি কিং, সাহেব! গড সেভ দি কিং!'

হাওয়াই জাহাজ এগিয়ে গিয়ে এখন শেখদের হাবেলীর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। বিষাণসিং চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল। শেখদের বাড়ির ছাদে লোকে ভিড় করেছিল। তারা হাত নেড়ে নেড়ে সাহেব বিমানচালককে অভিবাদন জানাচ্ছে। বিষাণসিং লক্ষ্য করছিল ওই গোরা পল্টন মোছলাদের অভিবাদনের সাড়া দেয় কি না। আর মনে হল পাইলট যেন তার হাত সত্যিই ভেতরে টেনে নিল। এটা দেখে বিষাণসিংয়ের মনে খুব আনন্দ হল। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই সে বিড়বিড় করে বলল, 'দুদিন আগে যদি আসতে সাহেব তাহলে আর আমাদের এত ক্ষয়ক্ষতি হত না। যাক, ও নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই।...'

এরপর বিষাণসিং মনে খুব জোর পেয়ে গেল। হাত মুঠো করে শেখদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল, 'এবার চালাও গুলি, মোছলার দল! এই আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি চালাও গুলি, কী? চালাচ্ছে না কেন, তখন তো খুব শের বনেছিলে, এখন চালাও গুলি' এই বলে ভারিক্কি চেহারায় বিষাণ সিং পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে, ঘুসি পাকিয়ে পাকিয়ে পাগলের মত নাচতে শুরু করে দিল।

তেজাসিংজী তখন ভাবছিলেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শহরে যেতে হবে। গিয়ে ডেপুটি কমিশনার সাহেবকে সমস্ত ঘটনা খুঁটিয়ে বলতে হবে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির একটা তালিকা করে তাকে দিতে হবে। যা হবার হয়েছে, ও নিয়ে এখন আর ভেবে

লাভ নেই। আমরাও আচ্ছা করে ওদের ধুনে দিয়েছি। মোহল্লার দল আর আমাদের ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।

গুরুদ্বারের পেছনে দাঁড়িয়ে মোটা কসাইয়ের ছেলে কেরোসিনের বোতলটা নর্দমায় উপুর করে দিল। তারপর খালি বোতলটা চাতালের তলায় লুকিয়ে রাখল। শুকনো ন্যাকড়াগুলো ঘুলঘুলি থেকে নিয়ে ভেতরদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেইদিকেই ফিরে গেল।

হাওয়াই জাহাজ গোটা গঞ্জটা তিনবার পাক দিল। তৃতীয়বার পাক দেওয়ার সময় নিচে দাঁড়িয়ে থাকা গাঁয়ের লোকেরা হাত নেড়ে নেড়ে বিমান চালকের অভিবাদনের জবাব দিল। তিনপাক দেবার পর সেই উড়োজাহাজ অন্য গ্রামগুলোর দিকে উড়ে গেল।

গঞ্জের চেহারাটাই বদলে গেল। লোকে বাইরে বেরোতে শুরু করল। লড়াই থেমে গেছে। লাশগুলো তুলে সৎকারের ব্যবস্থা করা হল। কিছু লোক নিজেদের গহনা-কাপড়ের কতটা কী বেঁচেছে, কতটা কী লুট হয়েছে তা দেখার জন্যে নিজের নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। সেবাদার আর নিহাং-সিং গুরুদ্বার ধোয়া-মোছা করতে শুরু করে দিল। ওদিকে শেখের হুকুমে মসজিদও ঝাঁটা দিয়ে সাফ করা হতে লাগল। দুই সম্প্রদায়েরই লোক যে যার ধর্মস্থান ধুয়ে সাফ করতে লাগল।

যে যে গ্রামের ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ উড়ে গেল সেই সেই গ্রামে ঢোল বাজানো বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল রণধ্বনী। ঘরে আগুন দেওয়া আর লুট-পাট সব বন্ধ হয়ে গেল।

উনিশ

শহরের রাস্তায় বেরিয়ে এলেই বোঝা যায় সে অবস্থা আর নেই। কুতুবদীনের মহল্লার মসজিদের সামনে রাস্তার ধারে চারজন সশস্ত্র ফৌজ চেয়ার পেতে বসেছে। রাস্তার সমস্ত মোড়ে মোড়ে দু-তিনজন করে ফৌজ বন্দুক বাগিয়ে ধরে আছে। কোনও কোনও বাড়ির রোয়াকে বসে কিংবা রাস্তার ধারে দাঁড়ালে সেটা সোজা নজরে পড়ে। শহরে ফৌজ মোতায়েন করা হয়েছে। দাঙ্গার চতুর্থ দিনে আঠার ঘণ্টার কারফিউ জারি করা হয়েছিল। আজ পঞ্চম দিনে তার মেয়াদ কমে বারোঘণ্টা হয়েছে—সন্ধ্যে ছটা থেকে সকাল ছটা। কানাঘুসো খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, সিটি ম্যাজিস্ট্রেট আর ডেপুটি কমিশনারও পালাক্রমে গাড়িতে করে সশস্ত্র সেপাই নিয়ে শহরময় চক্কর দিচ্ছেন। কোথাও কোথাও দোকানদাররা ঘুলঘুলি-ফাঁক দোকান খুলে বসেছে। বড় রাস্তার ওপর ঘোড়সওয়ার পুলিশের দুজন করে সিপাই কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে তাগড়াই ঘোড়ায় চেপে জায়গায় জায়গায় টহল দিচ্ছে।

আপিস-কাচারি এখনও বন্ধ। গলিতে গলিতে কোনও খুপচিতে কিংবা প্রকাশ্যে এখনও অল্প কিছু লোক বল্লম সড়কি উঁচিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে দেখা যায়। তবে কারফিউ জারি করলে আর ফৌজ মোতায়েন করলে দাঙ্গার পরিস্থিতি হতো না। লোক বাইরে বেরোতে আরম্ভ করেছে। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে লোকে এক মহল্লা থেকে এমনকি অন্য মহল্লাতেও যেতে শুরু করেছে। খবরের ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, দুটো রিফিউজি ক্যাম্প খোলা হবে, তাতে বিশটি গ্রাম থেকে আসা লোক ঠাঁই পাবে। ক্যান্টনমেন্ট আর শহরের দুটো সরকারী হাসপাতাল শুধু আহত লোকদের ভর্তি করা হচ্ছে, শুধু তাই নয়, মৃতদেহগুলোকেও তুলে তুলে এনে একজায়গায় জড়ো করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা শোনা খবরেই ডেপুটি কমিশনারের নাম থাকছে। পাইপ মুখ দিয়ে সব জায়গাতেই তাঁকে হাজির থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর সম্বন্ধে শোনা যাচ্ছিল যে, কারফিউয়ের মধ্যে খবরদারি করতে বেরিয়ে তিনি নাকি হাসপাতালের বাইরে এক ছোকরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এবং তাকে দু-দুবার চ্যালেঞ্জ করেন। সে বেগড়বাই করায় তৎক্ষণাৎ গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দেন। সারা শহরে একথা রাষ্ট্র হয়ে যায় যে দাঙ্গা আর হতে পারবে না। কংগ্রেসের তরফ থেকে একটা ইস্কুলের মধ্যে একটা রিফিল সংক্রান্ত দপ্তর খোলা হয়েছে। সেখানে গ্রাম থেকে আসা লোকের ভিড় জমে থাকছে। সেখানের ডি-সি তিন-তিনবার এসে ঘুরে গেছেন। সর্বজনীন সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে সরকার সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। সরকারের এই রূপ দেখে সর্বজনীন সংস্থার নেতারাও খুব উদ্যোগী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে সরকারী অফিসাররাও খুব করিতকর্মা হয়ে উঠেছেন। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও ডি-সি সম্বন্ধে আগেকার ধারণা বদলাতে শুরু হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার যে সাম্রাজ্যবাদী মেশিনের যন্ত্রাংশ সে কথা ঠিক। কিন্তু তা হলেও ডেপুটি কমিশনার নিছক যন্ত্রাংশ নয়। এই ডি-সি খুব বিবেচক এবং সহানুভূতিশীল মানুষ। ডি-সি যেদিন সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতালের বাইরে লোকটাকে গুলি করেছিলেন, সেদিন ওর এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সারারাত ঘুমোতে পারেননি। প্রফেসর রঘুনাথ তো বলেছিলেন লোকটা আদৌ প্রশাসনেরর জগতে খাপ খায় না। আসলে লোকটা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কেতাবী মানুষ, এঁকে ব্রিটিশ সরকার এই কাজে লাগিয়ে ওঁর প্রতি ঘোর অবিচার করেছে। হ্যাঁ, কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি এখনও এঁকে গালাগালি করেছে। তারা বলছে এর সবটাই নাকি এরই কারসাজি।

পরিদর্শনে বেরিয়ে রিচার্ডের জিপগাড়ি হেলথ অফিসারের বাড়িয় সামনে এসে দাঁড়াল। সাহেব আসবেন এ খবর আগেই টেলিফোনে হেলথ অফিসারকে জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে তার মনে মনে বেশ ডগমগ ভাব হয়েছিল। যেলথ অফিসার ইচ্ছে করেই কোট প্যান্টের বদলে দেশী পোষাক পরেছিলেন। গায়ে দিয়েছিলেন সিল্কের কুর্তা, তার নিচে খসর-মসর করা পাঞ্জাবী সালোয়ার আর পায়ে পেশোয়ারী জুতো। ওঁর স্ত্রী চা-কফির বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। সাহেব ভেতরে আসতেই

পাইপের তামাকের সুগন্ধে উঠোন ভরে গেল। ডি-সি কিন্তু চা-কফি কিছুই খেলেন না, পাঁচমিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা সারলেন। তারপর গৃহকর্তার হাতে হাত দিয়ে বললেন, 'নাইস। ভেরি নাইস! এরকম সময়ও দেখছি তোমার পোশাকের দিকে খুব নজর। দেশী পোশাক তোমাকে খুব মানায়।'

এরপর হেলথ অফিসারের স্ত্রীর হাতে হাত দিয়ে বললেন, 'আপনার দেখছি দিন এখনও শুরু হয়নি। তাই না?' এটা বলার কারণ, হেলথ অফিসারের স্ত্রী তখনও ড্রেসিংগাউন পরে ছিলেন।

এরপর হেলথ অফিসারের দিকে ফিরে বললেন, 'রিভিউজি ক্যাম্পে জলের বন্দোবস্তটা আবার একবার দেখে নেওয়া দরকার।' ডি-সি এমনভাবে বললেন যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। 'জল নিকাশির নালিটা কিন্তু এখনও কাটা হয়নি।' কথাটা বললেন মাথা ঝাঁকিয়ে হাসি হাসি মুখে। এই হাসিটা ছিল মনে করিয়ে দেবার জন্যে যে, দুদিন আগে বলা হলেও এখনও কাজটা করা হয়নি।

'ব্যবস্থা সব করে রেখেছি, আজ থেকে কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

'গুড,' বলে ডেপুটি কমিশনার আরাব হাসলেন। 'যে গাঁয়ে মেয়েরা বাচ্চা নিয়ে ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়েছিল, ওখানে মড়ক লাগতে পারে এটা তোমার জানা দরকার।'

হেলথ অফিসার সাবধান হয়ে গেলেন। গ্রামের লোক পালিয়ে পালিয়ে শহরে চলে আসছে; সেখানে আমি গিয়ে কী করব। অবশ্য ডি-সির সবদিকে খেয়াল আছে।

'এই নিয়ে আজ তিনদিন। ওখানে লাশগুলো ফুলোগলতে শুরু করেছে। ইঁদারায় এখুনি সংক্রামণ-প্রতিষেধক ওষুধ ফেলা দরকার, যাতে অসুখ বিসুখ ছড়িয়ে পড়তে না পারে। কাল থেকে রোজ সকালে উঠে তুমি যাও। বাসের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দুজন সশস্ত্র সেপাই তোমার সঙ্গে যাবে। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

ডি-সি শুধু শহরের নয়, সারা জেলারই নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখেন।

হেলথ অফিসারের স্ত্রী ইতিমধ্যে কাপড় বদলে ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট হয়ে এসে গেলেন। উনি এসে আবার চা-কফির অনুরোধ জানানোয় ডি-সি হেসে ফেলে বললেন :

'চা খাওয়ার অনেক মওকা মিলবে, মিসেস কাপুর! আজ নয়। থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর আবার যেন নিজের মনেই বলছেন এমন ভাব করে বললেন 'দেখুন একাজে আপনাকেও কিছুটা হাত লাগাতে হবে। রিফিউজি ক্যাম্পে দুহাজার খাট আজই পৌঁছে যাবে কিন্তু কাপড়-চোপড়ের কিছুটা বন্দোবস্ত করা খুবই জরুরী। মেয়েদের নিয়ে ছোটোখাটো একটা রিলিফ কমিটি গড়ে ফেলতে পারলে ভালো হয়' বলে ডি-সি আবার হেসে ঘাড় নাড়লেন।

রিচার্ডের এই একটা বড় গুণ। সে এমনভাবে কথা বলে যে শুনে মনে হয় কোনও সমস্যায় পড়ে ও যেন পরামর্শ চাইছে। আসলে কিন্তু এটা তাঁর হুকুম, তাঁর নির্দেশ। হেলথ অফিসারের স্ত্রীও আহলাদে আটখানা। ডি-সির বউয়ের সঙ্গে

কাজ করার মওকা মিলবে, এর চেয়ে বড় কথা আর কী আছে। কিন্তু সে বিষয়ে কথা হবার আগেই রিচার্ড হেলথ অফিসারকে নিয়ে দরজার বাইরে চলে গেলেন।

'লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলার ব্যাপারে তুমি কী ভাবছ? আমার মনে হয়, এ কাজ মিউনিসিপ্যাল কমিটির তরফ থেকে হওয়া উচিত। পোড়ানোর কথা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানানোর দরকার নেই। তাতে উত্তেজনা বেড়ে যেতে পারে।'

হেলথ অফিসার তাতে ষোলআনা একমত।

'গোড়া থেকেই এটা হয়ে আসছে। গর্তের মধ্যে ফ্যালো আর জ্বালিয়ে দাও। একটা একটা করে কিছু করেছ কি মরেছ। উত্তেজনা বাড়বে।' হেলথ অফিসার ডি-সির গোড়ে গোড় দিয়ে বলল, অবশ্য নিচু গলায় বিড়বিড়িয়ে: 'প্রথমে তো একদফা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করলে, এরপর আবার এটাও আশা কর যে, তোমাদের মৃতদের সৎকার তো সরকার করে দেবে।'

ডি-সি একবার আড়চোখে তাকে দেখলেন। এক মুহূর্ত চোখ ছানাবড়া করে থেকে তারপর হেসে বললেন: 'আচ্ছা, এবার যে যার কাজে লেগে পড়া যাক। হাতে আর নষ্ট করার মতো সময় নেই।

দশ মিনিট পরে ডি-সি রিলিফ কমিটির আপিসে পৌঁছে গেলেন। সেখানে শহরের বাছা বাছা লোক এসে হাজির। সরকারের রিলিফ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিয়ে সভায় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা চলছে:

'বাজারহাট খুলে গেছে। চার ওয়াগন কয়লা রেলস্টেশনে মজুদ। আরও দশ ওয়াগন মঙ্গলবার তক্ এসে যাবে। এখনও কিছুদিন সন্ধ্যে ছটা থেকে সকাল ছটা কারফিউ বলবৎ থাকবে। শহরের যত লাশ সব উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, খোদ সরকার তার সৎকারের ব্যবস্থা করবে। পোস্টাপিস আজ দুপুরে খুলে যাবে। কিন্তু আগেকার চিঠিগুলোর বিলিব্যবস্থা এখনই করা যাবে না। বড় ডাকঘরের সমস্ত ডাক বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে, হ্যাঁ, রেজিস্ট্রি ডাক আর পার্সেল গুলো বিলি করা হবে।' বলতে গিয়ে রিচার্ডের মুখ কোনও কোনও সময় রাঙা হয়ে উঠেছিল, ঠোঁট কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। কেননা বক্তৃতা দেওয়ার ওঁর তো অভ্যেস নেই। কিন্তু ওর বলার মধ্যে একটাও ফালতু কথা ছিল না।

'আমি চাই রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে বেসরকারী সংগঠনগুলো সরকারের কাজে সাহায্য করুক। রেশনে মাল যোগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে। এখন আমাদের কিছু ডাক্তার লাগবে। দরকার পড়বে বেশ কিছু ভলান্টিয়ারের, যারা রিফিউজিদের দেখাশুনো করার ব্যাপারে সাহায্য করবে।...'

বলতে বলতে সভায় উপস্থিত অনেককে রিচার্ড তীক্ষ্ণ নজরে দেখে বুঝে নিচ্ছিল কার কী মনোভাব। বারান্দার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মনোহরলাল; কালো, মোটা মনোহরলাল হাত পাঁজাকোলা করে মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডি-সির প্রত্যেকটি বাক্যে সে নাক সিঁটকায়। লোকটা দাঙ্গার আগে গুণ্ডাদের পেয়ারের লোকের সঙ্গে এসে রিচার্ডের আপিসে দাঁড়িয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং

করে খুব কথা বলছিল। দেখে রিচার্ডের মনে হল, ও এখানেও বকে বকে মাথা খারাপ করে দেবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল কমিউনিস্ট দেবদত্ত। গত এক বছরে রিচার্ড দুবার ওকে তিন তিন মাসের জন্যে জেলে পুরেছিল। এই লোকটা দাঙ্গার আগে এবং দাঙ্গার দিনেও দাঙ্গা ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের কর্মকর্তাদের একসঙ্গে বসিয়ে যাতে শহরে শান্তি বজায় থাকে, তার জন্যে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে গেছে। এখনও এ লোকটির সেই এক লক্ষ্য—শান্তি বজায় রাখার। বাড়তি কথা এ বলবে না। দপ্তরে উপস্থিতদের মধ্যে কংগ্রেসের বক্সী এবং আরও কেউ কেউ আছে যারা সেটা জানে। রিচার্ডের চেনা কিছু উকিল এ সভায় হাজির হয়েছিল। এ সভায় আরও একজন আছে, যে, কংগ্রেসে ছিল, সোস্যালিস্ট পার্টিতেও ছিল। আবার গোয়েন্দা পুলিশও ছিল। এই লোকটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে, শ্লোগান দিয়ে মিটিং ছেড়ে চলে যেতে পারে, সরকারকে গালিগালাজও করতে পারে।

রিচার্ড সোজা পথে গেল। শহরের অবস্থা নিয়ে কোনো বাদ্-বিতণ্ডার সুযোগ না দিয়ে শুধু কতকগুলো প্রস্তাব পেশ করে বসে পড়ল।

রিচার্ড বসতে না বসতেই লালা লক্ষ্মীনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন: 'ডি-সি সাহেবকে কথা দিচ্ছি যে, সমস্ত শহরবাসী এবং শহরের সমস্ত সংস্থা সরকারের সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, যোগ্য, এমন হৃদয়বান একজন হাকিম এই জেলায় উপস্থিত আছেন…।'

এই শুনে রিচার্ড দুম করে উঠে পড়ে রিলিফ কমিটির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লক্ষ্মীনারায়ণ আর সেই সঙ্গে কিছু উকিল ঘর থেকে ছুটে বাইরে এসে তাকে জীপগাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন। মিটিং পনেরো মিনিটের মধ্যে খতম। কিন্তু সেই সময় পেছনে যেদিকে দেবদত্ত বসে, সেইদিক থেকে একজনের গলা শোনা গেল ঃ

'এখানে এসে জুটেছে যত সব খয়ের-খাঁর দল। কেবল সরকারের ধামা ধরে বেড়ানো তাদের কাজ। আমি কাউকে ভয় পাই না। মুখের ওপর সাফ সাফ বলব। এই দাঙ্গার জন্যে কে দায়ী? শহরে যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ছিল, তখন কোথায় ছিল সরকার? এখন কারফিউ জারী করা হয়েছে। তখন করা হয়নি কেন? কোথায় ছিলেন তখন সাহেব বাহাদুর? কাউকে আমি পরোয়া করি না সাফ কথা সকলের মুখের ওপর বলে দিতে পারি।' মনোহরলাল বলে চলেছিল।

ততক্ষণে জীপ ছেড়ে চলে গেছে।

রিলিফ কমিটির কর্মকর্তারা যখন উঠতে আরম্ভ করেছে, তখন এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে। থামো। এখানে এসব কথা এখন তুলে কী লাভ? সরকারকে গাল দেওয়া বন্ধ করো। গাল দিয়ে হবে কী? সরকারকে গাল দিয়ে এ সময়ে তুমি কী পাবে?'

'ছি, বক্সীজী! শেষে আপনার মুখেও এই কথা? যান, আপনিও গিয়ে এখন

চরকা কাটুন কিংবা গলি সাফ করুন। আপনার নাড়ীজ্ঞান নিয়ে আর রাজনীতি করা যাবে না।'

'তোর এত চেঁচাবার কী হল? আমি বুঝি জানি না দাঙ্গা ইংরেজই লাগায়? গান্ধীজী একবার নয়, দশ বার বলেছেন…'

'সে তো হল, আপনারা কী করেছেন?'

'কোন্‌টা না করেছি? মুসলিম লীগওয়ালাদের কাছে গিয়েছি, বলেছি শহরে শান্তি বজায় রাখো। আমাদের সঙ্গে কাজ করো। ডি-সিকে গিয়ে বলেছি মিলিটারি এনে শহরে বসিয়ে দাঙ্গা ঠেকাও। আমরা আর কী করতে পারতাম? আর আজ যখন দেশের মানুষ ফৌত হয়ে যেতে বসেছে, তখন আমাদের কোন্‌টা কর্তব্য হবে—দেশের মানুষকে সাহায্য করা, না সরকারকে গাল পাড়া? এসেছেন কী আমার বিপ্লবী!'

'আমিও ঢের ঢের দেখেছি। বেশি খাপ খোলাবেন না, বক্সীজী! কংগ্রেসের সদস্য রিফিউজী ক্যাম্পে সরকারের কাছ থেকে মাল যোগানোর ঠিকা পেয়েছে। বলেন তো নামও বলে দিতে পারি।'

'ঠিকা নিয়েছে তো আমি তার কী করব?

'আপনারা এদের কংগ্রেসের মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন।'

এই সময় এক মাতব্বর মনোহরলালের কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ছেড়ে দাও ইয়ার! ওসব অনেক দেখেছি। এখানে সব তোতা পাখিটি হয়ে বসে আছে, গান্ধীজী ওয়ার্ধায় বসে হুকুম দেন আর এরা এখানে তামিল করে। কিন্তু এরা নিজেরা তার ছাতা মাতা কিছু বোঝে না।'

'ডেপুটি কমিশনারকে এখানে ডাকার মানেটা কী?'

তাকে তখন তার বন্ধু ঠেলতে ঠেলতে ফটক পর্যন্ত নিয়ে গেল। গেটে পেঁছে মনোহরলাল বকবকানি থামিয়ে দিল।

'নাও এবার একটা সিগারেট বার করো। দুটো টান মারি…'

এই বলে দুই বন্ধুতে রোয়াকে গিয়ে বসল।

ডেপুটি কমিশনারের চলে যাওয়া থেকে বক্সীজীর মনের অবস্থাও হয়েছে একই রকম।

'দাঙ্গা বাধানোতে যে ইংরেজ, দাঙ্গা থামানোতেও সেই ইংরেজ। যে ইংরেজ এক হাতে ক্ষুধার্তকে না খাইয়ে মারে, সেই ইংরেজই আবার অন্য হাতে নিরন্নকে অন্ন যোগায়। যে ইংরেজ গৃহস্থের ভিটেমাটি চাটি করে, সেই আবার বাস্তুহারার পুনর্বাসনের কাজ হাতে নেয়…।' যে দিন থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত, সেই দিন থেকে বক্সীজীর মাথায় ঘুণপোকা বাসা বেঁধেছে। বার বার উনি শুধু একটা কথাই বলছেন: 'ইংরেজ আবার তুরুপের তাস পিটেছে।' কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে কার্যসিদ্ধি করে উঠতে পারেন নি।

যে সময় রিচার্ড সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়টাতেই লীজার হয়ে চলেছিল ভোগান্তির একশেষ।

নিজের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে লীজা হলঘরে গেল। আলমারিতে ঠাস বইগুলো ওর বুকে জগদ্দল পাথরের মত ভারী ঠেকে। ওর মনে হয় নট্‌ নড়ন চড়ন হয়ে সময় থেমে আছে? সব কিছুই যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। জীয়ন্তের মধ্যে এক শুধু গৌতম বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বের চোখ। আর সব মৃত। অন্ধকার কোণগুলো খল আর কপটে ভর্তি। তারা অসংখ্য ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সন্ধ্যের পর এ-ঘরে আসতে ওর গা ছমছম করে। ইতস্তত খাড়া করা মূর্তিগুলো বিষধর সাপের মাথা বলে ওর ভ্রম হয়।

লীজা ডাইনিংরুমে চলে এল। এ ঘরের আবহাওয়া তুলনায় অনেক শান্ত। আলো তত জোরালো নয়। পাথরের মূর্তি নেই। বইয়ের পাহাড় নেই। ঘর জুড়ে এমন এক স্নিগ্ধতা, যাতে সব কিছু ভুলে থাকা যায়, অনেক কিছু স্মরণে আসে। এ আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল প্রেম করার জন্যে, আরামে গা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে, আলিঙ্গন আর চুম্বনের জন্যে। লীজার যেন বাক্‌রোধ হয়ে আসছিল। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ওর মনের মধ্যে কী যেন গুমরে উঠছিল। আস্তে আস্তে ওর অস্বস্তি বেড়ে উঠতে লাগল। এ ঘরের স্নিগ্ধতাও তার কাছে এক অসহ্য জড়ত্বে রূপান্তরিত হল। তার মনের মধ্যে এমন আকুলিবিকুলি করে উঠল যে, ভেতরের ফোঁপানি চাপা দেবার জন্যে লীজা উঠে পড়ে রসুই ঘরের দিকে গিয়ে হাঁক দিল, 'বেয়ারা!'

দূরে কোথাও থেকে অসংখ্য দেয়ালের পর্দা ভেদ করে জবাব এল:

'মেম সা···ব!'

কাঁধে ঝাড়ন ফেলে দুলকি চালে হেঁটে খানসামা মেমসাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল। চারটে বাজতে যায়। মেমসাহেব কী ফরমাশ করবেন সে তা জানে। কখনও তিনটে বাজলে, কখনও চারটে, কখনও সাড়ে চারটে হলে মেমসাহেব আর থাকতে পারেন না। যে কামরাতেই থাকুন, চিৎকার করে ডেকে এনে বলবেন, 'বীয়ার লাগাও, ঠাণ্ডা বীয়ার মাংতা।'

এরপর লীজা কিছুটা মন হাল্কা করে ডাইনিংরুমে ফিরে এল। লীজা হাউসকোট গায়ে দিয়েই ওর সামনে বেরিয়ে এসেছিল। সেই হাউসকোটেরও আবার কশি বাঁধা ছিল না। এই খাঁ খাঁ করা বিজনপুরীতে বীয়ার ছাড়া আর কী-ই বা মানুষের থাকে, যা দিয়ে তার অস্তিত্ব, তা নিজেকে সে নিজে ভুলে থাকতে পারে।

রিচার্ড বাড়ি ফিরল রাত আটটা নাগাদ। লীজা নেশার ঘোরে সোফায় বসে থেকে থেকেই ঘুমিয়ে পড়ছে। তেপায়ার ওপর বীয়ারের বোতলে তখনো খানিকটা তলানি রয়ে গিয়েছে। সোফার এক মুড়োয় লীজার মাথাটা ঝুলে রয়েছে। আর তার আধখানা মুখে তার চুল ছড়িয়ে আছে। তার হাউসকোট ওপরে উঠে যাওয়ায় ওর হাঁটুর দিকটা অনাবৃত হয়ে রয়েছে।

রিচার্ড সোফার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল, 'ড্যাম দিস কান্ট্রি, ড্যাম দিস লাইফ।'

রিচার্ড বাড়ি ফিরলে অন্য এক জগতে পৌঁছে যেত। ঘরের মধ্যে সে পেত ইংলণ্ডের জীবন, তার নিজের জীবন, নিজেদের সমস্যা যার সঙ্গে তার বাইরের জীবনের ক্ষীণতম সম্পর্ক। বাইরের জীবন তো তার কাজের জগত। তার আসল জীবন তার ঘরে। সেটা তার নিজের জীবন, তার পড়াশুনার ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে সে ঘর আর বার দুটোই ভুলে যায়।

রিচার্ড সোফার এক মাথায় বসে পড়ে মুখ বাড়িয়ে লীজার গালে চুমো খেল নিজের কর্তব্য নির্বাহের খাতিরে। কোনও কোনও রাত্রে যে উত্তেজনা আর আগ্রহের সঙ্গে সে যে দেহটি কোলে টেনে নেয়, এ সময় সেই দেহ স্থূল, মাংসসর্বস্ব আর অনাকর্ষক বোধ হল। লীজার ওজন আবার বেড়ে যাচ্ছে। আর ওর চোখের নিচে কালি পড়ে যাচ্ছে। একঘেয়ে জীবনের জন্যে লীজা মোটা হয়ে যাচ্ছে। যখনই সে ঘরে ফেরে লীজার এই অবস্থা দেখে রিচার্ডের মন খারাপ হয়ে যায়। রিচার্ড সামনের দিকে ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, 'লীজা।' তারপর হাত বাড়িয়ে মাথার চুলগুলো সরিয়ে দিল।

লীজার হুঁস ছিল না। রিচার্ড ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল, রিচার্ড দেখল লীজার এমন ক্ষমতা নেই যে উঠে টেবিলে বসে ডিনার খাবে। তার চেয়ে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসাই ভাল। রিচার্ড তখন লীজার ঘাড়ের নিচে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটা হাঁটুর নিচে রেখে লীজাকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। এইসময় তার নজরে পড়ল লীজার হাউসকোটের নিচের দিকটা ভেজা। সোফার দিকে তাকিয়ে দেখল যেখানে লীজা পা রেখেছিল সেদিকটাতেও আসনের একটা অংশ গোল হয়ে জবজব করছে। লীজা এদিনও সোফা ভিজিয়ে ফেলেছে।

রিচার্ডের মন ঘেন্নায় ভরে গেল। পেচ্ছাপের তীব্র গন্ধ ওর নাকে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রিচার্ডের মাথা ঝুঁকে পড়ল। আবার সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। পুরো বছর লণ্ডনে কাটিয়ে লীজা সবে ফিরে এসেছে। তার আগে বিরক্ত হয়ে সে এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আবার হয়ত চলে যাবে। ওর ফেরা ঠেকাতে গেলে আবার আমাকে অন্য জায়গায় বদলি হওয়ার চেষ্টাচরিত্র করতে হবে।

সোফার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লীজার অদ্ভুত একটা কথা মনে পড়ায় রিচার্ড হেসে ফেলল...। এখানে বদলি হয়ে আসার পর এই সোফাটা সে কমিশনার লরেন্সের কাছ থেকে নিয়েছিল। লরেন্স তখন বদলি হয়ে লক্ষ্মৌ যাচ্ছিল। পরে যখন সেই সোফার কাপড় পাল্টানো হয় তখন তার নিচেও ঠিক এই রকমের বিশ্রী দাগ দেখেছিল। রিচার্ড শুনেছিল সেই কমিশনারের বউও ছিল এই একঘেঁয়েমির শিকার। সেও নেশায় বুঁদ হয়ে কখনো কাঁদতে কাঁদতে, কখন হাসতে হাসতে সোফা ভিজিয়ে ফেলত। আর সেই কমিশনারও জায়গায় জায়গায় নিজেকে বদলি করিয়ে নিত। শেষে লরেন্সের বউ লরেন্সকে ছেড়ে চলে গিয়ে মিলিটারীর এক ছোকরাকে বিয়ে করে। রিচার্ড একবার লীজার দিকে আরেক বার সোফার দিকে তাকিয়ে দেখল।

ওর মন বলল, এই ঘরটাও খানিকটা অভিশপ্ত। তারপর লীজাকে পাঁজা কোলা করে উঠিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে চলে গেল।

শোবার ঘরে পেঁছুবার ঠিক আগে লীজা চোখ খুলল। ততক্ষণে ওর নেশাও কিছুটা ছুটে গেছে।

'কী ব্যাপার রিচার্ড', আমায় কোথয় নিয়ে চললে ?'

তোমার গাউন ভিজে গিয়েছে, লীজা, আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।'

কিন্তু লীজা কথাটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না। রিচার্ড বিছানার পাশে রাখা ইজিচেয়ারে লীজাকে এনে বসিয়ে দিল।

'রাতের খাবার খাবে তো লীজা ?'

'খাবার ? কি রকম খাবার ?'

রিচার্ডের ইচ্ছে হল লীজার কাঁধটা ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে দেয়, যাতে তাড়াতাড়ি ওর ঘুম ছুটে যাবে। কিন্তু রিচার্ড এসব কিছু না করে কোমড়ে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগল।

লীজা তার এলোমেলো চুলের ভেতর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বলল, 'রিচার্ড তুমি হিন্দু না মুসলমান ?'

বলে লীজা মৃদু হাসল।

লীজা বলল, 'তুমি এলে কখন, আমি কিছু টের পাইনি। তুমি লাঞ্চ খেতে এসেছ না ডিনার ?'

রিচার্ডের নিমেষের জন্য মনে হয়েছিল, লীজা ওকে খোঁটা দিচ্ছে। ও যতটা দেখাচ্ছে, হয়ত ততটা ও নেশাগ্রস্ত নয়। রিচার্ড তখন সামনের খাটের ওপর বসে পড়ে লীজার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, 'এটা তোমাকে বুঝতে হবে, লীজা, আজকাল আমি নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না। শহরের সব্জীমণ্ডি পুড়েছে, আর এ জেলার একশো তিনটি গ্রাম জ্বলে গেছে।'

'একশো তিনটি গ্রাম পুড়ে গেল আমি জানলাম না। আমি শুয়ে পড়ে থাকলাম, আর কিছু জানলামই না!' তারপর অনুযোগের সুরে বলল, 'আমাকে তো বলা উচিত ছিল রিচার্ড। কেন আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বললে না। এতসব কাণ্ড হয়ে গেল, আর তুমি আমাকে বললেই না ?'

'যাও; শুয়ে পড়গে য়াও। কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়। তোমার চোখে ঘুম রয়েছে।'

'তুমি আমার পাশে এসে বস ঃ আমি একা শুতে পারি না।'

'তুমি শুয়ে পড় লীজা, আমার এখনও অনেক কাজ আছে।'

'এতগুলো গ্রাম জ্বলে গেল, রিচার্ড, এখনও তোমার কাজ ? এখন আর তোমার কী কাজ করবার রইল ?

রিচার্ডের চোখ ছানা হল…,লীজা তাহলে আমাকে ঠাট্টা করছে ? আমার ওপর ওর মন কি বিষিয়ে গিয়েছে, নইলে এমন ধারা কথা বলবে কেন ?

নেশার ঘোরে সকলেরই এই রকম হয়, লীজারও হয়েছে। যা মনে আসছে

তাই বলছে। লীজা চেয়ার থেকে উঠে টলতে টলতে গিয়ে খাটের উপর রিচার্ডের গায়ে গা দিয়ে বসল। তারপর দুহাতে রিচার্ডের গলা জড়িয়ে তার বুকের ওপর মাথা রাখল। না, ওর মধ্যে কোনো ঘৃণার ভাব নেই। বোধহয় না জেনেই ও কথাটা বলেছে।

'তুমি আমায় ভালোবাস না, আমি জানি। হ্যাঁ আমি সব জানি।'

রিচার্ডের চুলে হাত বুলিয়ে দিতেদিতে লীজা বলল, 'আচ্ছা রিচার্ড, কত হিন্দু মরেছে, কত মুসলমান মরেছে, তুমি তো সব জান, তাই না? আচ্ছা, সবজিমণ্ডি জিনিসটা কী?'

রিচার্ড চুপচাপ ওর দিকে চেয়ে দেখছিল। ওর দিকে তাকিয়ে কখনও কখনও রিচার্ডের মনে বিতৃষ্ণার ভাব জাগে। ওর নেশা করা যতই বাড়ছে, ততই ওর প্রতি রিচার্ডের টান কমে যাচ্ছে। লীজা হয়ে যাচ্ছে একটা পানসে মাংসের দলা। এই ধরনের সম্পর্ক বেশিদিন টেনে রাখা যায় না। রিচার্ডের চোখ লীজার মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল। লীজা সম্পর্কে তার নিজের মনোভাবও খুব একটা স্পষ্ট নয়। এই মেয়েটার সঙ্গে সে তার বিয়ের সম্পর্ক রাখবে, না ভেঙ্গে দেবে—এ প্রশ্নে তার কর্মজগতের উন্নতির সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে। সেটা ভাবতে হবে। তার কর্মজীবনে উন্নতির দিক দিয়ে এখন একটা হেস্তনেস্ত হওয়ার সময় এসে গেছে। তারপক্ষে এখন একচুল ও এদিক ওদিক করলে চলবে না। এখন তার পক্ষে সবচেয়ে জরুরি হল এটা দেখা যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যেন সাধারণ মানুষের অসন্তোষের আগুন না জ্বলে ওঠে। এখন পর্যন্ত সব কাজেই তার সুবিবেচনা আর কর্মদক্ষতা প্রমাণ পেয়েছে। লোকের মনে তার আন্তরিকতার ছাপ পড়েছে। তার প্রত্যেকটা কথাই ঠিক ঠিক ভাবে মানুষের মনে ধরেছে। এইসব কারণে এখন লীজাকে যে কোনও ভাবেই হোক নিজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে?

এরপর এগিয়ে গিয়ে ছুটে রিচার্ড লীজার গালে চুমো খেল।

রিচার্ড সহোৎসাহে বলল, 'লীজা শোনো, আমাকে সৈয়দপুরে যেতে হবে। একটা ইঁদারায় সংক্রামণ-প্রতিষেধক ওষুধ ফেলতে হবে। এই ইঁদারায় গ্রামের কিছু বউ-ঝি ডুবে মরে। চলো না, তুমি আমার সঙ্গে। ওখান থেকে আমরা গাড়িতে তক্ষশীলা চলে যাব, সেখানকার জাদুঘর দেখব। কী বল? সব জায়গাই খুব সুন্দর।'

লীজা ঢুলুঢুলু চোখে রিচার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল: 'আমাকে তুমি কোথায় ঘোরাতে নিয়ে যাবে রিচার্ড। তুমি আমাকে জ্বলে যাওয়া গ্রামের ভিতর দিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে? আমি ওসব কিছুই দেখতে চাই না, কোথাও আমি যেতে চাই না।'

রিচার্ড একটুও দমে না গিয়ে বলল, 'না না ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয়? অবস্থা এখন ফিরে গিয়েছে। এখন তুমি ঘুরে ফিরে বেড়াতে পার। এখন আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারি। এখানকার গ্রামাঞ্চলগুলো সত্যিই বড় সুন্দর। সেদিন ফলের বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এই সৈয়দপুরেই আমি কুরেলি পাখির ডাক শুনেছি। বছরের এই সময় ওখানে কুরেলি পাখি দেখতে পাওয়া

যায়। আমার ধারণা ছিল না, আমাদের লার্ক পাখি এই গরমের দেশেও দেখতে পাওয়া যায়। আমি তো অবাক। আরও রকমারি পাখি এদেশে তুমি দেখতে পাবে যা আগে কখনও তুমি দেখনি।

'এ কী সেই জায়গা যেখানে মেয়েরা ডুবে মরেছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জায়গা। ইঁদারার কাছেই নদী বয়ে যাচ্ছে আর সেই নদীর পাড়েই ফলের বাগান…।'

লীজার ঠোঁটে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। লীজা রিচার্ডের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি কেমন মানুষ রিচার্ড যে এমন জায়গায় গিয়েও তুমি নতুন নতুন পাখি দেখাতে পার, লার্ক পাখির ডাক শুনাতে পার?'

'এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় লীজা। সিভিল সার্ভিস হল ধরি মাছ না ছুঁই পানির ব্যাপার। আমরা যদি সব ঘটনাই গায়ে মাখি, তাহলে প্রশাসন একদিনও চলতে পারে না।'

'একশো তিন গ্রাম জ্বলে গেলেও নয়?'

রিচার্ড একটু থেমে বলল 'না, তাহলেও নয়। আমাদের দেশের লোকও এরা নয়।'

লীজা রিচার্ডের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

'কিন্তু, তুমি তো এদের ওপর বই লিখতে যাচ্ছিলে রিচার্ড। এদের ইতিবৃত্ত নিয়ে তাই না?'

'বই লেখা অন্য ব্যাপার লীজা। প্রশাসনের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ?' লীজাকে আবার গুম হয়ে যেতে দেখে রিচার্ড বলল, আজ আমি হেলথ অফিসারের বউকে বলেছি রিফিউজিদের জন্যে জিনিসপত্র জোগাড় করতে—এখানে গ্রাম থেকে আসা রিফিউজিদের জন্যে দুটো ক্যাম্প খুলতে চলেছি। আমি ওদের কথা দিয়েছি যে তুমিও একাজে হাত লাগাবে।' এরপর নিজের প্রস্তাবটাকে খোলসা করার জন্য রিচার্ড বলল, 'রিফিউজিদের জন্য কাপড় চোপড়, তাদের বাচ্চাদের জন্য খাদ্যপানীয় আর খেলনা তুমি জোগাড় করতে পারে। এতে তোমার ঘোরাফেরার সুযোগ মিলবে…।'

এরপরেও লীজা আগের মতই চুপ করে থাকল। রিচার্ড আবার ঝুঁকে পড়ে লীজাকে চুমো খেয়ে ডান হাত দিয়ে তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'আমি আর থাকতে পারছি না লীজা, আমার অনেক কাজ। এই সময় আমার দপ্তরে থাকার কথা।'

বলে রিচার্ড উঠে দাঁড়াল।

দেখা হবে, লীজা। আমার জন্যে বসে থেকো না…আর গ্রামে যাওয়ার জন্যে সকালেই তৈরি হয়ে থেকো। আমরা সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়ব' বলে রিচার্ড ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

লীজা অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। ঘরটা আবার যেন ভুতুরে বাড়ি হয়ে গেল।

কুড়ি

'আমি সংখ্যা চাই, শুধু সংখ্যা ! কেন আপনার মাথায় ঢুকছে না। আপনার তো কথা ফুরোচ্ছে না। আপনি আমাকে সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে চান। আমি অতশত শুনতে চাই না। আমাকে অঙ্কের বলুন। মরেছে কত, ঘায়েল হয়েছে কত, কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে…।'

রিলিফ কমিটির কর্মকর্তা রেজিস্ট্রি খাতা খুলে চটেমটে বলতে থাকেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। রিফিউজিরা বোঝেই না সারাটা দিন ঠায় বসে থেকে রেজিস্ট্রি খাতার সমানে কালি বোলাও, সন্ধ্যেবেলায় লিস্ট তৈরি করতে গিয়ে দেখবে দুটো গ্রামেরও পুরো হিসেব নিকেশ হয়নি। কে এদের বোঝাবে। এদের সঙ্গে রুখে কথা বলা যাবে না। দপ্তর থেকে বার করেও দেওয়া যাবে না। সবাই গুঁতোগুঁতি করে এগিয়ে আসছে। একজনের বদলে এক সঙ্গে তিনজন কথা বলতে থাকবে। কখনও কখনও কর্মকর্তাটির মনে হয় যেন দপ্তরে বসে শতেক রিফিউজি সমস্বরে কথা বলছে। আর তার কানের পর্দা ফাটিয়ে যে যার নিজের কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের কে কী বলবে—এরা এসেছে উচ্ছন্ন হয়ে, ভিটেমাটি হারিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে। কর্মকর্তার টেবিলে তারা সব ঝুঁকে পড়ে। লোকগুলো যদি অত ব্যাখ্যার মধ্যে না যায় তাহলে হিসেবগুলো দুমিনিটের মধ্যে নিয়ে ফেলা যায়। আমার অত কথার দরকার নেই, আমাকে সংখ্যা বল, সংখ্যা। এ সত্ত্বেও টেবিলের সামনে বসে কর্তার সিং হাতজোড় করে বলে যাচ্ছিল :

'আমি ওকে আবার বললাম, ওহে ইমদাদ খান, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে আমরা বড় হয়েছি। তুই আমাকে ভুলে গিয়েছিস ? তখন ছিল সকালবেলা। বাবুজী, বাহ গুরু মাথায় আছেন, মিথ্যে বলব না—ইমদাদ খান গোড়ায় আমার গায়ে হাত তোলেন নি।'

ভদ্রলোক অতিষ্ট হয়ে ওঠেন। উনি চাইছেন সংখ্যা। আর এ নিজের মার খাওয়ার গল্প বলছে।

'কাটারিটা সোজা আমার মাথায় এসে পড়ল। এই যে, এই আমার চোখের ওপর এসে লাগল। আচ্ছা বাবুজী আমার চোখটা বেঁচে যাবে ? দাদা বলতে লাগল : 'বন্তাসিং চোখ থেকে যেন পট্টি খুলিস না। বাবুজী, আমি পট্টি খুলিনি' এগুলো হচ্ছে হজরং হজরং। এই সময় আরও একজন টেবিলের সামনে বসে গেল।

হিসেববাবু টেবিল থেকে চোখ না তুলেই প্রশ্ন করেছিলেন আর উত্তর লিখছিলেন :

'নাম ?'

'হরনামসিং।'

'পিতার নাম ?'

'সরদার গুরুদয়ালসিং।'

'মৌজা ?'

'ঢোক-ইলাহী-বক্স।'

'তহশীল ?'

'নুরপুর।'

'হিন্দু-শিখ কত ঘর ছিল ?'

'সেরেফ এক ঘর। 'শুধু আমার, বাবু।'

বাবু মাথা তুললেন। এক বুড়ো সর্দার প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিচ্ছিলেন।

'প্রাণ নিয়ে এলে কী করে ?'

'করিম খানের সঙ্গে আমর খুব সদ্ভাব ছিল সন্ধ্যেবেলায় যখন...'

হিসেববাবু আঙুল তুলে ইশারা করতেই থেমে গেল।

'মরেছে কেউ ?'

'না বাবু, আমি আর আমার বউ প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। আমার ছেলে ইকবালসিং ছিল নুরপুরে, ওর কী হয়েছে জানি না। মেয়ে যশবীর সৈয়দপুরে ছিল। সে ইদারায় ডুবে মরেছে...।,

হিসেববাবু ফের আঙুল তুলে ইশারা করে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন: 'যা জিজ্ঞেস করছি বল। মরেছে কেউ ?'

'এক মেয়ে ডুবে মরেছে।'

'কিন্তু ও তো আপনার গাঁয়ে মরেনি ?,

'না বাবু।'

'এই হিসেব তো অন্য গাঁয়ের। নিজের গাঁয়ের কথা বলুন।,

'বিষয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ?'

'দোকান পুড়ে গেছে। সব মালপত্র লুট হয়েছে। একটা তোরঙ্গ ছিল সেটাও চুরি হয়েছিল, কিন্তু তা থেকে দুটো সোনার বালা...কিন্তু সেই তোরঙটা আমি নিজেই এহসানআলীকে দিয়ে এসেছি। তার বউ বড় ভালো মানুষ। সে...।'

হিসেববাবুর আঙুল আবার খাড়া হয়ে গেল। দেখে হরনামসিং চুপ হয়ে গেল।

'দোকানে লগ্নী কত ছিল ?'

'কী বল্লো ? দোকানে লগ্নী কত ছিল ?'

'একটা মোটা হিসাব বল ? মালপত্র সমেত...তাড়াতাড়ি বল। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে...।'

'এই ধরুন সাত-আট হাজার। পেছনের জমিও ছিল কিছুটা...'

'দশ হাজার লিখি ?'

'হ্যাঁ বাবু, তাই লিখুন।'

'কোনও মাল উদ্ধার করার আছে ?'

'হ্যাঁ বাবু। একটা বন্দুক। দো-নলা বন্দুক। ওটা অধিরোতে জালালদীন সুবেদারের ঘরে রাখা আছে···।'

'আপনি তো অধিরোর লোক নন, আপনি তো ঢোক-ইলাহীবক্সের লোক।'

'হ্যাঁ পালিয়েছিলাম ঢোক-ইলাহীবক্স থেকে। প্রথম রাত তো আমরা নদীর ধার বরাবর হেঁটেছি। দিনের বেলায় থেকেছি এহসানআলীর বাড়িতে। ফের চলতে শুরু করেছি। পরেরদিন জালালদীন আমাদের অধিরোতে আশ্রয় দেয়। জালালদীন বড় ভাল লোক, বাবু! সে আমাদের রান্নার জন্য আলাদা বাসনপত্র দিয়েছিল।'

'হয়েছে হয়েছে, থাক। এই সুবেদারের নাম ঠিকানা বলুন।'

হরনামসিং চেয়েছিল তার আখ্যান শোনাতে, তার ছেলের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে। কিন্তু হিসেববাবু কোন কথাই শুনলেন না। সর্বক্ষণ ঠোঁটের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে রাখলেন, তারপর সেটা নাড়তে শুরু করে দিলেন।

'এবার আপনি যেতে পারেন।'

হিসেববাবু শুধু নিজের দরকার মতো জিনিসটুকুই লিখে নিলেন। ধানের থেকে শুধু চালটাই বার করে নিলেন—বাকি সব তাঁর কাছে ভুসি। ভুসি তো একেবারেই ভুসি! কখনও কখনও হিসেববাবু আবার সমানে শুনে যেতেন। কোনও কোনও কাহিনী যেন তার মর্মে গিয়ে বিঁধত। হৃদয় আর মস্তিক বাঁধা পড়ে যেত।

'কেননা, বাবুজী! আমার মেয়ে সুখবন্ত ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়েছে কী দেয়নি, কী জানি। সে তার ছেলেকে নিয়ে গাঁয়েই কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে? গলি দিয়ে ছুটে আমি ঘরে গিয়েছিলাম, বাবু। খাটিয়া আনতে। কেননা আশাসিং জখম হয়ে যায়। সেই সময় অনেক মেয়েকে আমি গুরুদ্বার থেকে বেরিয়ে যেতে দেখি। সুখবন্তও সেই দলে ছিল। আমি কী করে জানব, ও কোথায় যাচ্ছিল না যাচ্ছিল! ওর হাত ওপর দিকে ওঠানো ছিল। আর ওড়নাটা ছিল ওর গলায়। আমি যখন গলিতে খাটিয়া নিয়ে এলাম, সুখবন্ত তখন গলিতে দাঁড়িয়ে। গোড়ায় সুখবন্তও মেয়েদের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল, পরে ও দাঁড়িয়ে যায়। বাচ্চা গুরমীত তখন গুরুদ্বারের চাতালে দাঁড়িয়ে। সেই সময় পেছনদিকে ইস্কুলবাড়ি জ্বলতে শুরু করে। আগুনের মুখ যেই ওপর দিকে ওঠে, অমনি আলোর জোর বেড়ে যায়। নেমে গেলেন গলিটা আলোআঁধারি হয়। এই আলোআঁধারিতে দেখলাম সুখবন্ত আমার খুব ঘাবড়ে গেছে। ওর কিছুতেই কোন ভয়ডর ছিল না, বাবু। দেখলাম সেদিন ও ঘাবড়ে গেছে। ওখান থেকে সুখবন্ত ওর ছেলের কাছে ফিরে আসে। তারপর আবার গলিতে এসে দাঁড়ায়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই দেখি সুখবন্ত গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। 'সুখো করছিস কী?' আমি হেঁকে বলছিলাম, কিন্তু বললে কী হবে। কিন্তু তখন আর চিন্তা করবার বা কথা কওয়ার সময় কোথায়। তখন যদি ওর নজরআমারদিকে পড়ত, তাহলে তো ও গুরমীতকে নিয়ে যেত না, বাবুজী! আবার একবার ও ছেলের কাছে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল। আমি কী জানি, বাবুজী, ও

তখন কী করতে যাচ্ছে, ওর মনে কী আছে ? সেই সময় গ্রামের বাইরে শোরগোল উঠল। 'ইয়া আলী', 'ইয়া আলী' আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘাড় ফেরালাম। দেখি সুখবন্ত লাফ দিয়ে গুরমীতের কাছে চলে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে মেয়েদের দলের পেছনে পেছনে যেতে থাকল। বাবুজী, শেষ যেবার সুখবন্তকে আমি দেখি, ও তখন ছুটছে। ওর গলার সবুজ ওড়না উড়ছিল। তারপর গলির মোড়ে বাঁক নিল। আর তখনই, বাবুজী, সুখবন্ত আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল।…আমি এটাই শুধু জানতে চাইছি। বাবুজী—আমার সুখবন্ত ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়েছে কিনা। গুরমীতকেও সঙ্গে নিয়েছিল কিনা। নাকি ও ইঁদারায় চারপাশেই এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন বাবুজী? কেন, এ খবরটা একটু নেওয়া যায় না?…' কিন্তু এর মধ্যে তো সংখ্যা আসছে না। আর যদি উদ্ধারের ব্যাপার হয় সেটা হিসেববাবুর এক্তিয়ারে নয়। তার জন্যে যেতে দেবরাজজীর কাছে। উদ্ধার এংক্রান্ত এব কাজ, পুঁতে-রাখা সোনা বার করা, কাঁথা কাপড় টেনে বার করা—এই যাবতীয় কাজের দায়িত্বে আছেন দেবরাজজী। সরদারজী, আপনি আপনার ছেলের খবর পেতে চান তো ওঁর কাছে যান। এর জন্যে আমার কাছে আসবার কোনো দরকার নেই। আপনি এই নিয়ে তিনবার আমার কাছে এলেন। বার বার সেই একই কথা। ওসব গল্প শোনা আমার কাজ নয়।…'

এ সত্ত্বেও সরদারজী হিসেববাবুর সামনে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ও কোন্ আশায় আমার কাছে আসে? ওকে আমি কি করে বোঝাই যে, এ সমস্যার আমি কোন সমাধান করতে পারব না। হিসেববাবু সুর নরম করে বলেন ঃ

'মঙ্গলবার হয়ত একটা বাস আপনার গাঁয়ে যাবে। দেবরাজজীকে আমি বলব যাতে ঐ বাসে আপনিও যেতে পারেন। কিন্তু এ কথা আর কাউকে বলবেন না। বললে সারা গ্রামের লোক আমার ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়বে।…'

কিন্তু এসব কথাও সরদারের মনে খুব একটা রেখাপাত করে না। পরে নিজেকেই নিজে এই বলে বুঝ দেবার চেষ্টা করে : 'নিজের চোখে দেখে নেওয়াই ভাল। সব কিছু বুজিয়ে নিতে হয়। ছেলে যদি কোথাও লুকিয়ে বসে থাকে। আমাকে দেখলেই সে বেরিয়ে চলে আসবে। হয় ছুটে আসবে, নয় যেখানে আছে সেখান থেকেই চিৎকার করে বলবে : কানামাছি ভোঁ-ভোঁ…বাড়িতেও ঠিক যা করত। একবার এ-দরজার পেছনে। একবার ও-দরজার পেছনে…'

হিসেববাবু টুক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে এলেন। ঝুলবারান্দা থেকে দেখলে বোঝা যায় চত্বরটাতে লোকের কী ভিড়। নিচের উঠোনে জায়গায় জায়গায় গাঁ থেকে আসা লোকেরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসেছে। পেছনের চাতালে ভর্তি লোক। বাণপ্রস্থীজী সেখানে বসে বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। লোক উপচে সিঁড়ির ধাপগুলোতেও এসে বসেছে।

'কাঁদে না, গণ্ডাসিং। কাঁদে না!' কথাগুলো হিসেববাবুর কানে এসে ঘা দিল। এক বৃদ্ধ একজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল : 'কেঁদো না, গণ্ডাসিং! যে চলে

গেছে তাকে গুরু মহারাজ কোলে তুলে নিয়েছেন। পন্থের জন্যে নিজেকে সে বলি দিয়েছে। চিরদিন সে অমর হয়ে থাকবে।

'বাহে গুরু বাহে গুরু! সত্যনাম, সাচ্চে বাদ্‌শাহ্‌!'

সিঁড়ির ওপর বসে থাকা তিন-চারজন শিখ হেঁকে উঠল।

হিসেবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আরও একজন সরদার ওঁর কাছে এল। ওকে দেখে তিনি না হেসে পারলেন না। ভারী ভারী চোখ, প্রৌঢ়ত্বের ঢলঢলে শরীর। এ লোকটাও বার বার হিসেববাবুর কাছে আসত, এসে প্রায়ই কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলত।

'বাবুজী, গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাপত্তর কিছু হল? বাস যাবে না? কবে যাবে?'

'বাস যেদিন যাবে। তার আগে খবর পেয়ে যাবে। আর দেখ, এ দায়িত্ব আমার নয়। লালা দেবরাজ…'

এরপরও কানের আরও কাছে মুখ এনে বলে, 'আমার কাজটা হয়ে যাবে তো? হলে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেব।'

এতে বাবু বিরক্ত হন। বলেন, 'ও সরদারজী, একটু বুদ্ধিবিচার করে কথা বল। ইঁদারায় মেয়ে ডুবেছে কমপক্ষে সাতাশ। তার মধ্যে থেকে কী করে তুমি খুঁজে বার করবে তোমার গিন্নীকে?

'সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। বীরজী! আমি উল্টে পাল্টে দেখে ঠিক চিনে নেব। তার যে বালা জোড়া ছিল, তার একেকটারই পাঁচ তোলা ওজন। গলায় ছিল সোনার চেন। এখন তো গিন্নী ডুবে মরল, সে হল সবার সাথী—কিন্তু সে তো আমারও সাথী। কিন্তু ঐ বালা আর চেন-হার আমিই বা কী করে ছাড়ি? কেন ছাড়ব, বীরজী?'

তারপর আবার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বাবুজী' যদি এটা উদ্ধার করে দেন, তাহলে আপনাকেও তার একটা ভাগ দেব। এমন নয় যে…। আমি শুধু ভাবি, ভালমানুষের বেটি একবার এটা ভাবল না যে, আমি তো ডুবতেই যাচ্ছি, তো যাবার আগে হাতের বালা আর গলার চেন খুলে রেখে যাই? ঠিক কথা নয়, বীরজী! তা আমি আপনাকে খুশি করে দেব, বাবুজী। আপনি শুধু আমার এই উপকারটা করে দিন।' তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'ব্যস, কেবল আপনি আর আমি। আর কেউ যেন টের না পায়। ওখানে আর কাউকে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

'ও সরদারজী, লাশ ফুলে ঢোল হয়ে যে ওপর পর্যন্ত উঠে এসেছে। ফুলে ওঠা লাশের কব্জি থেকে পারবে তুমি বালা খুলতে? একটু বুদ্ধিবিচার করে কথা বল! সরকার তোমাকে দেবে খুলে নিতে?'

'কেন দেবে না, বাবু? আমার বিবি, আমার মাল! আমি তো চুরি করে আনি নি? বালা গাড়িয়েছি গাঁটের পয়সায়। ছেনি-হাতুড়ি সঙ্গে নিয়ে যাব? বলেন তো স্যাকরার দোকান থেকে একজন ছোঁড়াকেও ডেকে নিয়ে যেতে পারি।

কাজ সারতে এক মিনিটও লাগবে না। ইচ্ছা থাকলে করা যায় না এমন কাজ নেই।

'ওহে সরদার, একটু বুদ্ধিবিবেচনা করে কথা বল। প্রথমত, সরকার চাইবে লোক দিয়ে শনাক্ত করাতে। সাক্ষীসাবুদ চাইবে। ফুলে-ওঠা লাশ চেনা চাট্টিখানি ব্যাপার?

'আরে বীরজী, তার জন্যে তো আপনি আছেন। আপনার জলপানি যা লাগবে আমি দেব। আপনি আমার জন্যে এটুকু করবেন না?

দেখ সরদার। এটা আমার কাজ নয়। আমি শুধু হিসেব নিই। ক্ষয়ক্ষতির লিস্টিতে আমি তোমার গিন্নীর গলার চেন আর হাতের বালা ঢুকিয়ে দিয়েছি। মাল উদ্ধারের দায়িত্বে আমি নেই।...'

সরদার এই শুনে বাবুর হাত দুটো দু হাতে ধরে বলল। 'বীবুজী, ফিরিয়ে দেবেন না। বাবুজী, নারাজ হবেন না। দুনিয়ায় কী না হয়?' বলে হিসেব বাবুর গায়ের কাছে ধরে এসে তাঁর ডান হাতের একে একে তিনটে আঙুল ধরে বলল, 'কী? ঠিক তো? রাজী?' (তিনটি আঙুল ধরার মানে হল, তিন কুড়ি—অর্থাৎ, ষাট টাকা।)

'সরদার, কেন তুমি সময় নষ্ট করছ? আমি কিছু করতে পারব না।'

এরপর সরদার বাবুর আঙুল ছেড়ে দিয়ে ওঁর মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর কাঁধের চাদর সামলাতে সামলাতে ঘুরে সিঁড়ির দিকে গেল। তারপর আবার একটু দাঁড়াল।

'ও বাবু?...কী?' বলে নিজের চারটে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল: 'ও বাবু? ...কী? রাজী?'

হিসেববাবু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার সরদারের গলা শোনা গেল: 'একটু দয়া করুন, বাবু! আমরা সব কিছু খুইয়ে এসেছি।'

বাবু ফিরে তাকিয়ে দেখলেন সরদার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর হিসেববাবু নিজেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের উঠোনে এলেন। টেবিলে ঠায় বসে থাকতে থাকতে মাজা ধরে যায়। বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব হয় না, সন্ধ্যে পর্যন্ত দপ্তরে থাকতেই হয়। সারাদিনের পাওয়া খুঁটিনাটি তথ্য সন্ধ্যে বেলায় একত্র করে এক কপি সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে, এক কপি কংগ্রেস আপিসে পৌঁছে দিতে হয়। এক কপি ফাইলে রাখা হয়। প্রাণহানির সংখ্যায় ফারাক হয় উনিশ বিশ কোথাও দুটো মুসলমান বেশি। কোথাও দুটো হিন্দু কম। সম্পত্তিহানি হয়েছে হিন্দু আর শিখদের। কাল দেবদত্ত এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কত দাঁড়ালো?'

'আজ নূরপুর তহসিলের কিছু হিসেব মিলেছে। মৃতের সংখ্যায় খুব একটা ইতরবিশেষ নেই। যতজন হিন্দু-শিখ, মুসলমানও প্রায় তত।'

দেবদত্ত রেজিস্ট্রি খাতার পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন। 'এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস জুড়ে দিন। মরেছে গরিব কত আর অবস্থাপন্ন কত।'

'ওসব করে কী হবে? তোমার সব তাতেই গরিব বড়লোক।'

'তথ্য সংগ্রহের এটাও একটা বিশেষ দিক। আমীরওমরা কত মরেছে? এথেকেও কিছু জিনিস ধরা পড়বে।'

আঙিনা পেরোবার সময় হিসেববাবুকে দেখে অনেকেই চিনতে পারলেন। সিঁড়ির নিচে ডান হাতে রোজকার মতন আজও গুটিসুটি হয়ে বসে আছে সেই লোকটি। ওর সঙ্গে যার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সে বেঁচে আছে কিনা এখনও ও জানতে পারে নি। তিনটে হাসপাতাল ঘুরে দেখে এসেছে, কিন্তু তার কোন পাত্তা করতে পারে নি। আরেকটু পাশে দো-নলা বন্দুকওয়ালা হরনামসিং তার বউয়ের সঙ্গে বসে রয়েছে। হিসেববাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চোখে চোখ পড়লেই লোকটা বন্দুকের কথা বলে মাথাখারাপ করে দেবে।

চাতালে কিছু কংগ্রেসের লোক বসে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়েছে। কাশ্মীরীলাল বলছিল। 'তুমি আমার এই প্রশ্নের সিধে জবাব দাও। কেউ যদি আমার ওপর হামলা করতে আসে তো আমি কী করব? ওর সামনে হাত জোড় করে বলব যে, আমাকে তুমি মারো—আমি কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাস করি! তাই করব?'

'তোর তো পুঁটিমাছের প্রাণ। তোর ওপর হামলা করে কার কী লাভ?' শঙ্কর ওকে ঠুকল।

জীতসিং তাতে ফোড়ন কাটল, 'কী বলছিস? হামলা কী শুধু পালোয়ানদের ওপরই হয়? তালপাতার সেপাইয়ের ওপর না?'

কাশ্মীরীলাল তাতে দমল না। ফের বলল, 'এসব ঠাট্টা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। আমি জানতে চাই এসব ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির কী নির্দেশ? কী কর্তব্য হবে আমার?'

এ কথাটা কাশ্মীরীলাল বলল বক্সীজীর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু বক্সীজী প্রশ্নটাকে তেমন আমল দিচ্ছিল না।

আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি, বক্সীজী। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবেন না।'

'কী হল? প্রশ্ন? কিসের প্রশ্ন?'

'বাপুজী যে বলেছেন, হিংসা করো না। কিন্তু দাঙ্গার সময় কেউ যদি আমার ওপর হামলা করে, সে ক্ষেত্রে আমি কী করব? আমি তখন তার সামনে দুহাত জোড় করে কি বলব—মার আমাকে ভাই! এই আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমার গলা কাট। তাই করব?'

শঙ্কর মাঝের থেকে বলে উঠল, 'গান্ধীজী বলেছেন, তুমি আগ বাড়িয়ে কাউকে মারবে না। কিন্তু এ বলেন নি যে, কেউ তোমার ওপর চড়াও হলে তুমি তাকে কিছু বলবে না।'

'কী করব আমি?'

জীতসিং বলল. 'তুমি তখন করবে কি তা কে বলবে—দাঁড়াও। আমি কংগ্রেস আপিসে গিয়ে জেনে আসি, আমি আত্মরক্ষা করব কিনা।'

'বাপুজী হিংসা করতে বারণ করেছেন। তুমি তাকে তখন বোঝাতে থাকো যে, তুমি যা কিছু করছ সবই খুব অন্যায় কাজ।'

রামদাস মাস্টার বলল, 'আমার কথা হল, উঠে দাঁড়িয়ে তার মহড়া নাও।'

'মহড়া যে নেবো, কী দিয়ে ? আমার ঘরে তো থাকার মধ্যে আছে চরকা।'

'তা তুমিই তো সবচেয়ে বড় চরকিবাজ হে ! দাঙ্গা মিটে গেল, এখন তুমি তাই নিয়ে সমস্যায় পড়েছ।'

'তোমরা এড়াবার জন্য মজা করছ। কিন্তু সমস্যাটা খুব ঘোরালো' জীতসিং বলল।

শান্তভাবে থমথমে গলায় অনেকক্ষণ ধরে এসব শোনার পর বক্সীজী বলতে লাগলেন, 'শোনো সৌভাগ্যবানেরা। জার্নাইলের মধ্যে কোনো দোনামনা ছিল না। নিজের জীবনের ব্যাপারে ও কখনও কোনো পরোয়া করে নি। জার্নাইল ক্ষ্যাপাটে ছিল, নিরক্ষর ছিল—কিন্তু কেউ হামলা করলে ও কী করবে, এ বিষয় নিয়ে ওর কোনই মাথাব্যথা ছিল না…'

সবাই চুপ করে গেল। জার্নাইল গত হওয়ার পর সকলেরই মনে লেগেছিল।

কাশ্মীরীলাল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু এইসবই জজীয়তী কথা।'

বক্সীজী আবার বললেন, 'শোনু, তুই নিজে কাউকে মারবি না একনম্বর। যে তোকে মারতে আসবে তাকে বোঝাবি, যদি বোঝানোর সুযোগ পাস দুনম্বর। সে যদি না মানে, তবে ডেঁটে তার মোকাবেলা করবি এই হল তিননম্বর।'

'হল তো কথা, একে বলে জবাব। এবার খুশি তো, কাশ্মীরীলাল ! ব্যস, চুপ করে যা।'

তবু কাশ্মীরীলাল বলতে লাগল, 'কী নিয়ে মোকাবিলা করব চরকা নিয়ে ?'

জীতসিং বলল 'চরকা নিয়ে কেন তলোয়ার নিয়ে। তলোয়ার রাখার অনুমতি পাব তো ? কী বক্সীজী ?'

বক্সীজী চুপ।

'আর পিস্তল রাখবে ?'

শঙ্কর ফোড়ন কাটল, 'পিস্তলে হিংসা বেশি।'

'তলোয়ারে কম ?'

'হ্যাঁ তা তো বটেই তলোয়ার চালাতে গায়ের জোর দরকার। পিস্তলে ঘোড়া টেপ আর মেরে দাও।'

'তবে আমি তলোয়ার রাখব তো ? কী বলেন বক্সীজী ?'

বক্সীজী কোনও উত্তর দিলেন না। বলতে গেলে হয়তো আবার তিনি জার্নাইলেরই দৃষ্টান্ত দিতেন। হিসেববাবুও এগিয়ে গেলেন। দাঙ্গার পর সত্যিই এসব তর্ক খুব অর্থহীন বলে মনে হয়।

দাঙ্গার বানের জল নেমে যাওয়ার পর তলা থেকে অনেক জঞ্জাল পাঁক হাড় কঙ্কালের টুকরো সামনে ফেটে বেরিয়ে আসছিল।

বারান্দার দিকে-বার হওয়ার দরজার পাশে দশবারোজন লোক গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে হাসিগল্প করছিল। হিসেববাবু দাঁড়ালেন। সেখানে দঙ্গলের মাঝখানে বেশি বয়সের একজন বেঁটেখাটো শিখ আধশোয়া অবস্থায় ছিল। তার অগোছালো ঘন গোঁফদাড়ির ভেতর থেকে ওর সহাস্য চোখ নজরে এল। কী একটা কথায় সে বাচ্চাদের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাসছিল। তার আশপাশে দাঁড়ানো, হয়তো তার আত্মীয় বন্ধুরা, তারাও হাসছিল।

'নিজের গাঁয়ে যাবে, নৎথাসিং?'

এই কথায় মাটিতে শোয়া নৎথাসিং তার পা দুটো মুড়ে চিত হয়ে হাত দিয়ে হাঁটু বেড় দিয়ে ধরল।

'যাব না।'

কেন যাবে না?,

'যাব না', বলে নৎথাসিং বাচ্চাদের মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'যাব না।'

হাত দুটো হাঁটুর পাশে আরও আঁট করে বেঁধে সে ঘুরপাক খেতে লাগল। আশেপাশে বসে থাকা লোকেরা হেসে উঠল। হিসেববাবুর মনে হল ওকে এ প্রশ্ন অনেকবার করা হয়েছে। এখন এটা ওদের কাছে একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'কেন যাবে না?'

'যাব না।' বলে নৎথাসিং তার হাঁটুর চারদিকে হাত দুটো কষে বাঁধে আর বাচ্চাদের মত ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকে।

'কিন্তু কেন যাবে না, কিসের জন্যে?'

'ওরা সুন্নত করে।'

এই বলে ও নিজেই হাসতে থাকে। আর হাতদুটো আরও আঁট করে বেঁধে অন্যদিকে ঘুরে যায়। সরদাররা সব খিল খিল করে হাসতে থাকে।

বারান্দা পেরিয়ে উঠোনের একদিকে ইস্কুলের চাপরাশির ঘর। রোজকার মত আজও চাপরাশির আত্মীয় তার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মাথা নিচু করে বসে ছিল। প্রথম দিনেই চাপরাশি এদের নিয়ে এখানে চলে এসেছিল। ওদের মেয়েটি নিখোঁজ, আর ঐ ব্রাহ্মণীটি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। হাতে পায়ে ধরে বলছে ওর মেয়েটার খোঁজ নিতে। ওরা এও বলেছিল, গ্রামের এক গাড়োয়ান তার বাড়িতে ওকে আটকে রেখেছে। সে আর ওদের কাছে ফিরতে পারে না।

হিসেববাবু পণ্ডিতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'কাল সকাল সকাল একটা বাস নূরপুর যাবে। সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ থাকবে। মেয়ের খোঁজ নিতে চাইলে কাল সকালে ওই বাসে চলে যাও। সঙ্গে সরকারী লোকজন থাকবে।'

পণ্ডিত মাথা তুলে খোলা ঘোলা চোখে কুৎকুৎ করে বাবুর দিকে তাকাল। তারপর হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'আর পাওয়া যাবে না বাবু। এখন আর কোথায় প্রকাশকে পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তুমি যে বলছিলে গ্রামেই একজন লোক ওর বাড়িতে আটকে রেখেছে।'

'ভগবান জানেন বাবু, মেয়ের সঙ্গে ওর কী হয়েছে ?'

'কাল আরও লোক অন্য সবগ্রামে যাবে। বউ কী বলছে ?'

ব্রাহ্মণী মাথা তুলল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি আর কি বলব বাবু, যেখানে আছে সুখে থাক।'

উত্তরটা হিসেববাবুর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। উনি ভেবে নিলেন মেয়েটির মা-বাবা বোধহয় গ্রামে যেতে ভয় পাচ্ছে।

'তোমরা আমাকে ঠিকানাপত্র দিয়ে দাও। আমি পুলিশকে বলে এর একটা কিনারা করার ব্যবস্থা করব।'

ব্রাহ্মণী তখন বলল, 'এখন আর আমাদের কাছে এসে কী করবে বাবু ? অখাদ্য তো আগেই খাইয়ে দিয়েছে।'

এই কথার পর পণ্ডিত বলল 'আমরা বাবুজী নিজেদেরই জান সামলাতে পারছি না। পকেটে দুটো পয়সা নেই। ওকেই বা কী খেতে দেব আমরাই বা কী খাব ?'

হিসেববাবুর এরকমের অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি এগিয়ে চললেন।

আল্লারাখা প্রকাশকে সত্যিই ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। গ্রামে যখন দাঙ্গা বাঁধে, মা মেয়ে তখন পাহাড়তলীতে কাঠ কুড়োচ্ছিল। আল্লারাখা আগে থেকেই দু তিনজন লোক নিয়ে ওত পেতে বসেছিল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে মা মেয়ে যখন ছুটে পালাচ্ছে সেই সময় আল্লারাখা কান্নাকাটি করা অবস্থায় প্রকাশকে তুলে বাড়ি নিয়ে যায়। প্রথম দিন প্রকাশকে রাখা হয় একটা কুঠুরিতে। পরের দিন আল্লারাখা তাকে নিকা করে নেয়। কোথাও থেকে জোগাড় করে ওকে একটা নতুন বিয়ের পোষাকও দেয়। দুদিন পর্যন্ত প্রকাশ নির্জলা পড়ে থেকে কেবল কেঁদেছে আর যেন পাথরের ঠায় ওদের বাড়ির পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তৃতীয়দিন প্রকাশ একবাটি লস্যি খেয়েছিল আর মুখও ধুয়েছিল। সেই সঙ্গে ওর খিদেও পেয়েছিল। তখনও ওর মা-বাবা ওর চোখের সামনে ভাসছিল। কিন্তু প্রকাশ জানত আল্লারাখার মহড়া নেওয়ার ক্ষমতা ওর মা বাবার নেই। তারা খুবই দীনহীন মানুষ। আস্তে আস্তে আল্লারাখার বাড়ির জিনিসগুলো তার চোখে পড়তে লাগল। ঘরের বাইরের উঠোনে ঘোড়া বাঁধা আছে। ঘোড়ার পিঠের ওপর ঝিরঝির করে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ঘরের বাইরে গাছতলায় আল্লারাখার টাঙ্গা। প্রকাশ আগেও কয়েকবার এই টাঙ্গা দেখেছে। আসলে প্রকাশের ওপর আল্লারাখার নজর অনেকদিন থেকে। প্রকাশও এর কিছুটা আভাস পেয়েছিল। গ্রামে যেতে আসতে, ঝরনায় জল ভরতে যেতে, কাপড় ধোবার সময় মাঝে মাঝে আল্লারাখা যা-তা বলত, ঢিল ছুঁড়ত। প্রকাশ এ নিয়ে কখনও বাপের কাছে নালিশ করেনি। কেননা সে জানত ওর বাবা কিছুই করতে পারবে না। প্রকাশ আল্লারাখাকেও যেমন ভয় করত, তেমনি নিজের বাপকেও ভয় করত।

এদিকে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ায় সেই সুযোগে আল্লারাখা প্রকাশকে নিজের

বাড়িতে তুলে আনতে পেরেছিল প্রকাশ হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে কাদা সত্ত্বেও। আর যে সময়ে রিলিফ দপ্তরে প্রকাশের মা মেয়ের কথা ভেবে চোখ ফুলিয়ে কাঁদছিল, যখন মেয়েকে ফিরিয়ে আনার মত সাহসও পাচ্ছিল না, তখন ঠিক সে সময়ে প্রকাশ আল্লারাখার ভয়ে কেঁচো হয়ে নতুন জোড় পরে আল্লারাখার ঘরে খাটের ওপর বসেছিল, সেই সময় আল্লারাখা ওর সামনে এসে বসল। তারপর রুমালে বাঁধা একটা পুঁটলি খাটের ওপর ওর সামনে খুলে বলল :

'খা।'

প্রকাশ সারাক্ষণ টুঁ শব্দ না করেও খাটের দিকেই চেয়েছিল, ও চোখ তুলে না চেয়েছিল আল্লারাখার দিকে, না রুমালের দিকে।

'খা, মিঠাই খা, হারামজাদী তোর জন্যে মিঠাই এনেছি।'

এইবার প্রকাশ চোখ তুলে মিঠাইয়ের দিকে তাকাল। আল্লারাখার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস তখনও তার হয়নি।

হঠাৎ আল্লারাখা চীৎকার করে বলে উঠল, 'খা!' প্রকাশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

'আরে হারামজাদী এটা মিঠাই, বিষ নয়।'

বলে আল্লারাখা সাদা বরফি থেকে একটা টুকরো ভেঙে হাতে নিল। তারপর এগিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে প্রকাশের গাল এমনভাবে চেপে ধরল যে প্রকাশ হাঁ না করে পারল না। আল্লারাখা সেই সময় তার মুখে বরফির টুকরো ঠুসে দিল।

আল্লারাখার চেঁচানোর পেছনে কী আছে প্রকাশ তার সূত্রটা ধরতে পেরেছিল। কিন্তু তবুও সে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইল। মুসলমানের হাত থেকে কী করে সে মিঠাই খাবে?

'হিন্দু ময়রার দোকান থেকে এনেছি হারামজাদী খা।'

ভয়ে পড়ে প্রকাশ আস্তে আস্তে মিঠাইয়ের টুকরোটা চিবোতে আরম্ভ করল। ওকে চিবোতে দেখে আল্লারাখা হেসে ফেলে বলল, 'কীরে, বিষ না মিষ্টি?'

প্রকাশ একটু একটু করে মিষ্টি চেবোয় আবার মুখ বন্ধ করে রাখে।

তখন আল্লারাখা গলা চড়ায়। আর প্রকাশের চোয়াল ফের নড়তে থাকে। প্রকাশের শরীরের গন্ধ আল্লারাখাকে উতলা করে দেয়।

'নিজের হাতে খাও।' এবার আল্লারাখার গলার স্বর অনেকটা নরম। 'না খেলে তোকে পেড়ে ফেলে সমস্ত মিঠাই মুখের মধ্যে ঠুসে দেব, খা।'

প্রকাশ ওর দিকে চাইল। আল্লারাখাকে সে আগেও দেখেছিল কিন্তু কখনই এত কাছ থেকে নয়। ওর পাতলা পাতলা কালো গোঁফের দিকে প্রকাশের নজর পড়ল। আল্লারাখা চোখে সুর্মা দিয়েছে। চুলে তেল লাগিয়েছে।

প্রকাশের ভয় কিছুটা কমল। কিন্তু সে আগের মতই বাইরে ভয়ে গুটিয়ে যাওয়ার ভাব করে বসে রইল।

'খাবে, না পেড়ে ফেলে খাইয়ে দেব?' এই বলে আল্লারাখা তার বাঁ-হাত

আবার তার গাল আর চিবুক ধরার জন্য বাড়িয়ে দিল।

আস্তে আস্তে প্রকাশের মনে হল যেন তার শরীর থেকে আল্লারাখার ভয় উবে যেতে আরম্ভ করেছে। ভয় চলে যাচ্ছে, ভয় চলে যাচ্ছে। বরফির টুকরো চিবোতে চিবোতে প্রকাশ আবার একবার আল্লারাখার দিকে তাকাল। এবার ওর ঘাড়ে আর গলার কালো কারে বাঁধা তাবিজের ওপর প্রকাশের দৃষ্টি গেল। ওর গলার বোতাম খোলা ছিল। আল্লারাখার ডোরাকাটা কামিজও দেখতে পেল। আল্লারাখা খুব ছিমছাম হয়ে এসে বসেছে।

আল্‌লারাখা বরফির আরও একটা টুকরো হাতে করে নিয়ে বসেছিল এই ভেবে যে, প্রকাশ মুখ চালান বন্ধ করলে সে আরও একটা টুকরো মুখে গুঁজে দেবে। প্রকাশ ওর সেই হাতটা দেখে ফেলল। হঠাৎ প্রকাশ নিচু গলায় বলল, 'তুই খা।'

এই কথায় আল্‌লারাখার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'সেই তো কথা বললি।···খা'

'না।'

'খা।'

প্রকাশ মাথা নাড়ল। আল্‌লারাখার মনে হল প্রকাশের ঠোঁটের ওপর দিয়ে একটু হাসি খেলে গেল। প্রকাশ চোখ তুলে আল্‌লারাখার দিকে তাকাল।

'তুই খাইয়ে দিলে খাব।'

প্রকাশের চোখ দুটো আল্‌লারাখার মুখের ওপর মুহূর্তের জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। এরপর সে আলগোছে বরফির একটা টুকরো উঠিয়ে নিল। টুকরোটা নেওয়ার পরও ওর হাত উঠছিল না। প্রকাশের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ওর হাত কাঁপতে শুরু করে দিল। হঠাৎ যেন ওর হুঁস হল এ কী করতে যাচ্ছে সে। ওর বাবা মা জানতে পারলে কী বলবে? কিন্তু সেই সময় ওর চোখে পড়ে গেল আল্‌লারাখা কী রকম উন্মুখ হয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আল্‌লারাখার মুখে প্রকাশের হাত পৌঁছে গেল।

দুজনে দুজনের কাছাকাছি এসে যাচ্ছিল। আল্‌লারাখা আগ বাড়িয়ে প্রকাশকে বুকের মধ্যে নিল। ভয় তড়াসে হয়েও প্রকাশ এই অদ্ভুত অনুভূতির শরিক হয়ে যাচ্ছিল। প্রকাশ তাকে গ্রহণও করে নিচ্ছিল। ওর মনে হতে লাগল অতীত যেন তার পেছন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর বর্তমান যেন দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকে করে নেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে। অবস্থার এমনই বদল হয়ে গেল যে সেখানে প্রকাশের কাছে অবান্তর হয়ে যেতে লাগল তার মা, তার বাবা।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে একদেহ একপ্রাণ হয়ে পড়ে রইল। দীর্ঘক্ষণ প্রকাশ চুপ করে ছিল। পরে যখন সে আল্‌লারাখার দিকে পিঠ আর ঘরের দেয়ালের দিকে চোখ রাখল তখন আস্তে আস্তে বলল, 'আমি জল আনতে গেলে তুমি ঢিল মারতে কেন?' এর উত্তরে আল্‌লারাখা হাত উঠিয়ে ওর কোমড়ে রাখল।

'ঢিল মারতাম বেশ করতাম, তুই আমার সঙ্গে কথা বলতিস না কেন?'

'আমি কেন বলতে যাব?'

'এখন বলছিস না ?'

প্রকাশ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে, 'আমার মা কোথায় ?'

'আমি কী করে বলব তোর মা কোথায় ? কেন ঘরে নেই ?'

ওর মনের মধ্যে হুহু করে উঠছিল। ওর চোখ জলে ভরে গেল। ওর মন বলল ওর মা-বাবা কোথাও ছিটকে চলে গেছে। ওর সঙ্গে আর তাদের দেখা হবে না।

'আমাদের বাড়িতে কী আগুন লাগিয়েছিল ?'

'না। লোকে আগুন লাগাতে গিয়েছিল। আমি গিয়ে পড়ে ঠেকিয়েছি। বাড়িতে আমি তালা লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। আল্লারাখার উত্তরে ওর মন ভাল হয়ে গেল। প্রকাশ আস্তে করে নিজের হাত উঠিয়ে কোমরে রাখা আল্লারাখার হাতের ওপর রাখল।

রিলিফ আপিসের চত্বরে ঘোরা প্রত্যেকটি লোকই তার নিজের নিজের আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যাচাই করার, বাজিয়ে নেবার, তা থেকে সারাৎসার নিংড়ে নেবার ক্ষমতা কারুরই ছিল না। শূন্যে তাকিয়ে থাকা, ঘাড় নেড়ে কারো কথা শোনা—এছাড়া কিছুই কারও বুদ্ধিগ্রাহ্য হচ্ছিল না। কোনও একটা গুজবের কথা শুনলেই লোকে উঠে উঠে ভিড় করত, তা শুনতে। কেউ জানত না কার কী করবার আছে, কার কোথায় যাবার আছে। দুদিন পরে কী হবে তার একটা ক্ষীণতম রেখাচিত্রও কারও চোখের সামনে ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন একটা অনিবার্য ঘটনার চক্রে পা রেখে ওরা চলেছিল। তার লাগাম কারও হাতে নেই। কারও কাছে নিশানা নেই, চাবুক নেই, না আছে চাবুক মারার ক্ষমতা। সবাই কাঠপুতুলের মত ঘুরছে, খিধে লাগলে উঠে উঠে এধার সেধার থেকে কিছু জুটিয়ে গিলে নিচ্ছে, মনে পড়ে গেলে কাঁদছে আর উদয়াস্ত কান পেতে রেখে শুনছে কে কী বলে।

একুশ

শান্তি কমিটির মিটিং হবে। সবাই হলঘরে এসে জড়ো হয়েছে। বেছে বেছে এমন জায়গা ঠিক করা হয়েছে, যা নিয়ে কারও আপত্তি হবে না। এ কলেজ খ্রীস্টানদের—হিন্দুদেরও নয়, মুসলমানদেরও নয়। প্রিন্সিপালও এদেশী নন। আমেরিকান পাদ্রী। ভারি অমায়িক, ভারি শান্তিপ্রিয় মানুষ। তখন দেরি ছিল মিটিং আরম্ভ হওয়ার। বাছা বাছা গোষ্ঠীর মানুষেরা আসবেন। যারা এসে গেছেন তাঁরা হয় একত্রে দু-তিন জন করে লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে কথা বলছেন। নয় হলঘরে বসে শলাপরামর্শ করছেন।

বাঁটকুল ঠিকাদার মুন্সীরাম শেখ নুরইলাহীকে বলছিলেন, 'যদি খরিদ করার

মতলব থাকে তো এইবেলা। পরে দাম চড়ে যাবে। আমার কাছে জেনে নাও, শেখজী! আমি ঠিক বলছি। যদি কেনো, কথা বলে দেখব?'

শেখজী আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল 'কী জানি। কমতেও তো পারে!'

'এর চেয়ে আর কত কমবে? এই এলাকাতেই কম্পাউন্ডের জমি আমি নিজে পনেরো শো টাকা দরে বেচেছি, আজ সেই জমি সাত শো'য় পাওয়া যাচ্ছে।' তারপর শেখজীর কনুই পাক্‌ড়ে ডিং মেরে উঁচুতে নিয়ে গিয়ে বলল। 'শান্তি-ফান্তি হয়ে গেলে দর কমবে, না বাড়বে? একটু ভাববেন।'

'ভাবব।'

'ভাববেন, নিশ্চয় ভাববেন। কিন্তু শুধু ভেবেই যাবেন না। আগেও আপনি অনেক সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করেছেন।'

দাঙ্গা লাগার পর শহরে যেন একটা ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকে চলেছে। যে এলাকা মুসলমান প্রধান সেখানকার হিন্দুশিখেরা যে যেদিকে পারে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তেমনি হিন্দুশিখ-প্রধান এলাকা থেকে মুসলমানেরা ঘরদোর বেচে দিয়ে চলে যেতে চাইছে।

'আপনি মনস্থির করে নিন। আমি আপনাকে আরও পঞ্চাশ-একশো টাকা কমে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব। এ একটা ভাল দাঁও। পরে আর মওকা পাবেন না। মুসলমান এলাকা হবে এবং বাড়িটা হবে হাইওয়ের ওপর এই তো আপনি চান?'

'ভাল বলেছেন। শিগগিরই আপনাকে জানাব।'

নুরইলাহী আর দুমিনিট সময় দিতে পারলে সওদার ব্যাপারটা তখনই পাকা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কাগাবগাদের হাত ছাড়িয়ে আর ঠিকেদার মুন্সীরামের কবল থেকে বেরিয়ে সে মিউনিসিপ্যাল কমিটির জনকয়েক সদস্যের দঙ্গলে ভিড়ে গেল। মুন্সীরাম এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বাবু পৃথ্বীচন্দ্রের কাছে চলে গেল:

'আপনার মোকামের সঙ্গে লাগানো বাড়িটা নাকি বিক্রি হবে?'

'বাড়ি কে বলল? 'ও তো ছোট্ট পায়রার খোপ।'

'পায়রার খোপ হোক, যাই হোক। ওটা কিনে নিন। একেবারে জলের দরে যাচ্ছে। নিয়ে নিলে আপনার বাড়ি একেবারে খোলতাই হয়ে যাবে]'

'আর যদি পাকিস্তান বানিয়ে দেয়?'

'যাও, রাজা! ওসব রাজনীতি করনেওয়ালাদের ফক্কিকারি। আর যদি হয়ও তাতেও বা কী! লোকে তো এখানেই থাকবে। মানুষ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না...'

মুন্সীরাম চাইছিল না আজকের দিনটা বিনা সওদায় মাঠে মারা যায়। একসঙ্গে ধনদৌলতওয়ালা লোক এমনটা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

বাবু পৃথ্বীচন্দ্র ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ভঙ্গিতে বলল, 'শান্তিফান্তি যদি হয় তো নিজের পাড়া ছেড়ে কেউ কোথাও যাবে না।'

আরে বাবুজী ! এই যদি তোমার ধারণা হয়, সে ধারণা মাথা থেকে বার করে দাও। এখন থেকে হিন্দুর পাড়ায় কোনও মুসলমান, মুসলমানপাড়ায় কোনও হিন্দু আর থাকবে না। ধরে নিও, এই হল কপালে লিখন। এর আর নড়চড় হবে না।'

লালা লক্ষ্মীনারায়ণকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে নূরইলাহী চুটকি কাটল, 'এসে গেছেরে বিটলে।'

কাছে আসতেই নূরইলাহী উঁচু গলায় বলল, 'দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে দম নিচ্ছিলে বুঝি বিটলে !'

আশপাশে সবাই হেসে উঠল। নূরইলাহী আর লক্ষ্মীনারায়ণ মিশন স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে। দুজনেরই কাপড়ের ব্যবসা। সেই সুবাদে পারস্পরিক সম্পর্কে মুখে ওদের আগল রাখার দরকার হয় না।

'বিটলেকে বিশ্বাস নেই। কী বলো, বিটলে ?'

ওদের দুজনের এমন সৌহার্দ্য দেখে সেখানে দাঁড়ানো অন্য একজন সরদার তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের সবারই এই রকম হওয়া চাই। আমাদের মতিচ্ছন্ন হলেও এ কথা তো সত্যি যে, আমাদের সবাইকে এখানেই থাকতে হবে। এটা ওটা নিয়ে মামুলি ঝগড়া লড়াই সে তো হয়েই থাকে। ওটা কোনো কথা নয়। বাড়িতে থালা বাটিতেও ঠোকাঠুকি হয়। পড়শিতে পড়শিতে খিটিমিটি তো বাঁধেই। কিন্তু সবাইকে আমাদের থাকতে হবে পড়শিরা তো হয় নিজের ডান হাত।'

এরপর হল নূরইলাহী আর লক্ষ্মীনারায়ণে কোলাকুলি। দেখবার মতো। অন্তরে অন্তরে দুজনেই বট্টরপন্থী। কিন্তু এক সঙ্গে খেলাধুলো করে তারা বড় হয়েছে বলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। মেলামেশা আছে। পরস্পরের সুখদুঃখ কমবেশি তারা ভাগ করে নেয়। শেখ নূরইলাহীর কথার মধ্যে ছিল কতটা তামাসা আর কতটা ঘৃণা, সেটা বলা কঠিন।

তারপর লক্ষ্মীনারায়ণকে আস্তে আস্তে বলল, 'তোর গাঁঠরিগুলো আমার গুদামে তুলে রেখেছি।'

লক্ষ্মীনারায়ণের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। নূরইলাহী আবার সেই ঠাট্টার সুরে বলল, 'গোড়ায় ভেবেছিলাম পোড়ে পুড়ুক বিট্-লেটার মাল। পরে মনে হল,—ইয়ার না, তা কি হয় ? যত যাই হোক,'আমার বন্ধু…!'

আশপাশে দাঁড়িয়ে যারা শুনছিল, দুই বন্ধুর এই মিলন-দৃশ্য দেখে তাদের খুব ভালো লাগল।

নূরইলাহী থামে না : 'গোড়ায় তো আমার ছেলে কোনও কুলি খুঁজে পাচ্ছিল না। সে রাত্তিরে কোথায় পাবে ঝাঁকামুটে ? ওকে আমি বললাম, যে করে পারিস গাঁঠরি সরিয়ে ফেল্। নয়ত লালা আমাকে আস্ত রাখবে না। তখন কোথা থেকে যেন দুজন কুলি ধরে নিয়ে এল।'

তারপর দুজনে হাসতে লাগল।

এমনিতে এসব হাসিমস্করা স্বক্ষেত্রে ঠিক ছিল। এ তো আর সেই বালক বয়সের অপাপবিদ্ধ আকুলতাময়। এর সঙ্গে ছিল লোকচক্ষুর ব্যাপার, যেটা বড়

বয়সে সংসারী মানুষদের মধ্যে না এসে পারে না। ভেতরে একটা বৈষম্যও না ছিল তা নয়। একটা ঘৃণার ভাব। কিন্তু দুজনেই ব্যবসায়ী। দুজনেই দুঁদে লোক। নিজের স্বার্থেই পরস্পরকে দরকার, এটা তারা বুঝত।

থামের পাশে দাঁড়িয়ে হায়াতবক্স কোন এক শহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করছিল ঃ

'আহা সে কী শহর, সরদাজী! ঠিক যেন বিয়ের কনে!' বলে চলে: 'সন্ধ্যে বেলায় আলো জ্বলে উঠলে ঝকঝক ঝকঝক করে। সমুদ্রের ঠিক ধারে। আর কী সাজানো গোছানো! আপনাকে কী বলব, সরদারজী—ঠিক যেন বিয়ের কনে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝক তকতক করছে রাস্তা—বারবার দেখলেও আশ মেটে না।

'কোন্ শহর নিয়ে এত আদিখ্যেতা করছ, হায়াতবক্স?

'রেঙ্গুন রেঙ্গুন! লাড়াইয়ের সময় গিয়েছিলাম। তোমাকে কী বলব! আহা কী শহর!'

পরস্পর এক জায়গায় হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের লোক সবাই জ্ঞানপাপী। দাঙ্গার কথা কেউ ভুলেও মুখে আনছে না। জ্বলে-যাওয়া গ্রামগঞ্জ। পুড়ে-যাওয়া সব্জীমণ্ডীর পৃষ্ঠপটে কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে বিয়ের কনের মত অপরূপ সুন্দরী কোন্ এক নগরীর কথা।

অন্য একটা দিকে বয়োবৃদ্ধ লালা পৃথ্বীচন্দ্র নিজের দলবলের কাছে তীক্ষ্ণ সরু গলায় বলছিল, 'আমি তাদের বোঝালাম—আরে বেকুব, গলির মাথে লোহার ফটক লাগিয়ে ভাবছিস তোর বাঁচবি? আক্কেল বিবেচনা করে কথা বল। বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না তো বুঝলাম, কিন্তু ভেতরের লোকগুলো বাইরে যাবে কেমন করে? তোরা কি গেট বানিয়ে নিজেরা জেলাখানায় থাকতে চাস?'

আরেক দিকে লালা শ্যামলাল হিসেববাবুকে ঠেলে ঠেলে এক পাশে নিয়ে যাচ্ছিলঃ 'একটা কথা তোমার খেয়াল রাখতে হবে, বাপু···এসো এসো, এই বেঞ্চিতে বসে কথা বলি।'

দুজনে বসল। লাবাজী হিসেববাবুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনে আমাদের ওয়ার্ডে এবার কংগ্রেস থেকে কে দাঁড়াচ্ছে বলো তো?'

'আমি তো জানি না, লালাজী! এখন তো সবাই রিলিফের কাজ নিয়ে মেতে আছে।'

'সবাই কোথায়?' তুমি অবশ্যই রিলিফের কাজে ব্যস্ত। তাও নিশ্চয় শুনেছ-টানেছ কিছু।'

'আমার তো কিছু কানে আসে নি, লালাজী। যা অবস্থা, তাতে ইলেকশন আদৌ হতে পারবে কি? আমার তো সন্দেহ আছে।'

'এতে কি আর দুনিয়ার কাজ বন্ধ হয়? ডি-সির সঙ্গে আমি দেখা করেছি। ইলেকশন দুমাস পরে। নাম দাখিলের তারিখ ঠিক হয়েছে পনেরোই জুন। কাজেই দেখছ সময় বেশি নেই।,

'আমি তো এসবের কিছুই জানি না, লালাজী।'

'দুনিয়ায় চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়, বাছা। আমরা তো আর বেশিদিন জায়গা জুড়ে থাকব না, বাপু—তোমরা জোয়ানবয়সী, তোমাদেরই এসে দুনিয়ার হাল ধরতে হবে।' তারপর আবার হিসেববাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, আমি এবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি।'

হিসেববাবুর নজর চলে গেল লালাজীর মুখের দিকে।

'আমি শুনেছি কংগ্রেস মঙ্গলসৈনকে টিকিট দেবে।'

'কিন্তু লালাজী, আপনার কংগ্রেসের টিকিটের কী দরকার?'

প্রশ্নটা করার সময়ই হিসেববাবু কারণটা ধরতে পেরেছিলেন। কোনও হিন্দু এবার নির্বাচনে দাঁড়ালে তার কংগ্রেসের সমর্থন দরকার। মুসলমান দাঁড়ালে মুসলিম লীগের। লোকের মনে এখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন। লালা শ্যামলাল যে কাপড় পরত, তা দূর থেকে খদ্দর বলে মনে হত—কংগ্রেসের সঙ্গে তার সেইটুকুই সম্পর্ক।

তারপর আবার কানের কাছে মুখ এনে লালাজী বলল, 'এইসব লোককে টিকিট দেবে তো কংগ্রেসের বদনাম হবে না? জুয়োর আড্ডা আছে, ওর নিজের দুটো। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে চালায়। শহরে গান্ধীজী এলে, নেহেরুজী এলে ওঁদের আগু পিছু পেখম মেলে বেড়াবে। ব্যস, তাতেই ও কংগ্রেসী হয়ে গেল? ও তো খদ্দরও পরে না।'

শেষে হিসেববাবুকে বলতে হল, 'উনি খদ্দর পারেন।'

'এখন পরছে। এই বছর দুই। কিন্তু তার আগে? তাছাড়া ওর বাড়িতেও দ্বিতীয় কেউ খদ্দর পরে না।'

হিসেববাবুকে ধৈর্যশীল শ্রোতা পেয়ে লালাজী বলে চলে, 'বীয়ার খায়। বিশ্বাস না হয় তো কোম্পানিবাগের ক্লাবে গিয়ে দেখে এসো। ওর বাবা ছিল গোয়েন্দা পুলিশের লোক, ছেলেও তাই।' তারপর নাক সিঁটকে বলল, 'ওর বাপের ভগন্দর হয়েছিল। মরলও তাতে। এও মরবে ভগন্দর হয়ে।'

হিসেববাবু জানতেন না ভগন্দর অসুখটা কী। তবে ওঁর কিছুতেই মাথায় আসছে না—মঙ্গলসৈনের ওপর লালাজী অত খচে গেলেন কেন?

'আমি এমন করে ওর সব ফর্দাফাঁই করে দেব যে, কাপড় খুলে একদিন ওর আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে। আবার এও বলি—না ভাই, পাঁচজনকে নিয়ে বাস করতে হবে। ওর ভাবনা ও ভাবুক। নিজের ঠেলা নিজে সামলাক। কিন্তু মায়াকান্না কেঁদে আর মিথ্যে কথা বলে মানুষকে ভাঁওতা দেবে, এটাই বা কী?'

কিন্তু লালাজী মঙ্গলসৈন জেলা কমিটির সদস্য। আর আপনি তো চার আনার মেম্বারও নন। আপনি টিকিট পাবেন কেমন করে?'

'কে টিকিট চাইছে? আমি শুধু এইটুকুই চাই যে, এই ওয়ার্ডে কংগ্রেস যেন কাউকে টিকিট না দেয়। নিদর্ল হিসেবে যে কেউ দাঁড়িয়ে যাক।...'

ওধারে লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়িয়ে হায়াতবক্সকে ওষুধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ

করেছিলেন। হায়াতবক্সের আবার অনেক জড়িবুটির নাম জানা আছে। পাথুরির ওষুধ উনি নিজেই তৈরি করেন। গোপন রাখেন শুধু ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালী। কেননা সেটা বললে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়।

দৌড়ে পালাবার সময় রণবীরের চোট লেগেছিল। পা বিশ্রীভাবে মচকায় আর হাঁটুও ছড়ে যায়। হায়াতবক্স শুনতে শুনতে মাথা নাড়ছিলেন. পরে বললেন, 'উহু, তেল মালিশ নয়। তাতে শ্লেষ্মার উদ্রেক করবে। আমার কাছে একটা তেল আছে, আশরফ লাহোর থেকে এনে দিয়েছে। শিরার টান ওতে ছেড়ে যাবে, জলদি আরাম পাবে—এই তোমাকে বলে দিচ্ছি! আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

তারপর গলা নামিয়ে বলল 'ছেলের পা মচকালো কেমন করে?' তারপর ফিসফিস করে বলল। 'আমি শুনেছি ও কোনও দলে-টলে গিয়ে ভিড়েছে। আমি বলি কী, ওকে দিনকতকের জন্যে কোথাও-বাইরে পাঠিয়ে দাও। এখানে থাকলে ধরা-টরা পড়ার ভয় আছে।'

শুনে লক্ষ্মীনারায়ণের পিলে চমকে গেল। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ হতে দিলেন না। বললেন :

'পনেরো বছরের তো বাচ্চা। ও আবার দলে কী ভিড়বে?'

কলেজের দুজন চাপরাশি ফটকের কাছে বসে কথাবার্তা বলছিল। একজন আরেকজনকে বলছিল, 'আমরা হাঁদা লোকেরা লড়াই করি। যারা চালাক, যারা বড় ঘরের লোক, তারা লড়ে না। এখানে এই সভায় হিন্দু এসেছে, শিখ এসেছে, মুসলমান এসেছে। অথচ সবাই কেমন ভাবভালবাসার সঙ্গে দরদ দিয়ে কথা বলেছে···।

রাজনীতির লোকজনেরা সকলেই এসে পড়েছে। আসতে বাকি শুধু বক্সীজী। স্থানীয় নেতাদের বাড়ি বাড়ি খবর পাঠিয়ে দেবদত্ত তাদের এখানে একত্র করেছে। দেবদত্ত নিজেও এসে গেছে। লীগ আর কংগ্রেসের পরিচালকদের ও যে আবার এক জায়গায় এনে বসাতে পেরেছে, তার জন্যে মনে মনে ও খুব আত্মপ্রসাদ বোধ করল। ওর যে সূক্ষ্ম ব্যবহারিক বুদ্ধি আছে, তা প্রমাণ হয়ে গেল—যখন মিটিঙের শুরুতেই সভার সভাপতি হিসেবে সে এই কলেজের অধ্যক্ষ লুকাস সাহেবের নাম প্রস্তাব করল। লুকাস মার্কিন মুলুকের লোক, বয়সও হয়েছে, শহরের লোক তিন-পুরুষে তাঁর কাছে পড়েছে। লুকাস ইংরেজ নন, হিন্দু নন, মুসলমান নন। ব্যস, আর কি চাই! প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে সভাপতি তাঁর আসনে এসে বসলেন। বারান্দা-টারান্দায় যারা ছড়িয়ে ছিল তারা একে একে সভায় এসে বসছে। সেই সময় মুসলিম লীগের এক তরুণ কর্মীর সঙ্গে কী নিয়ে যেন একজন কংগ্রেসীর তর্ক বেঁধে গেল। লীগ কর্মীটি ঠিকরে উঠে স্লোগান দিল :

পাকিস্তান···জিন্দাবাদ!'

তখন দশ জায়গা থেকে আওয়াজ উঠল 'থামো! থামো!'

লুকাস সাহেব বলতে লাগলেন, 'আমি মনে করি, এখন আমরা সবাই মিলে, যে ভাবেই হোক আসুন শহরের হাল ফেরাবার কাজে লাগি। এখানে শহরের বড়

বড় মানুষেরা সবাই হাজির আছেন। তাদের কথা লোকের মনে ধরবে। আমার মতে, এখানে বসে একটা শান্তি-কমিটি গড়া হোক। এই কমিটি প্রত্যেক মহল্লায় প্রতিটি গলিতে শান্তি প্রচার করবে। এখানে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন। আমার ধারণা এই কাজের জন্যে একটা বাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে লাউডস্পীকার আর মাইক্রোফোন লাগানো হোক। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির। ঐ বাসে করে জায়গায় জায়গায় গিয়ে যদি শান্তিরক্ষার আবেদন জানান, তাহলে তা খুবই কাজের হবে।'

হাততালি দিয়ে সবাই সোৎসাহে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল।

হঠাৎ এক সাহেব উঠে দাঁড়াল। সে হল শাহনওয়াজ ঃ

'বাসের ব্যবস্থা আমি করব।'

আবার চটাপট চটাপট হাততালি। দেবদত্ত সামনে এসে বলল, 'আমি খবর পেলাম সরকারের তরফ থেকেই বাসের ব্যবস্থা করা হবে।'

আবার চটাপট চটাপট হাততালি। শাহনওয়াজ তবু বসল না। বলল, 'পেট্রোলের যাবতীয় খরচ আমার।'

'উত্তম! অতি উত্তম! বাঃ, বাঃ!'

এরপর এক ভদ্রলোক উঠে উললেন, 'মহাশয়েরা, প্রোগ্রাম নেওয়ার আগে নিয়মানুযায়ী শান্তি-কমিটির পত্তন করা এবং যথাযথভাবে তার পদাধিকারী নির্বাচন করা—প্রথমেই এসব করে নেওয়া ভাল নয় কি?'

এখানেও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেই নির্বাচনের ব্যাপার। সেইজন্যে দেবদত্ত তাড়াতাড়ি উঠে আগ বাড়িয়ে বলল, 'আমি প্রস্তাব করছি, তিনজন সহ-সভাপতি বাছাই করুন। আমি জনাব হায়াতবক্স…'

'দাঁড়ান! আগে ঠিক হয়ে যাক সহ-সভাপতির সংখ্যা হবে তিন, না তার কম না বেশি? আমার প্রস্তাব সহসভাপতি হওয়া উচিত পাঁচজন। সংখ্যা যত বেশি হবে কমিটিও তত প্রতিনিধিত্বমূলক হবে।'

তখন এক সর্দারজী বলল, 'আমার প্রস্তাব, সহ-সভাপতি তিনজনই থাকুক—এক হিন্দু, এক মুসলমান ভাই, এক শিখ। কার্যকরী সমিতি বেশ বড় করে তাতে ঢালাও ভাবে প্রতিনিধিদের নিন।'

'এখানে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন তুলবেন না। এটা হচ্ছে শান্তি-কমিটি।' এগিয়ে এসে আবার দেবদত্ত বলল ঃ 'আমি আবেদন জানাব, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কমিটিতে যোগ দিন। আমার প্রস্তাব। আসুন আমরা মুসলিম লীগ থেকে জনাব হায়াতবক্সকে, কংগ্রেস থেকে বক্সীজীকে আর গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি থেকে ভাই যোধসিংজীকে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করি।

এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যদি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিতে হয়, তাহলে ঐ তিন পার্টির প্রধান বলে নিন। নাম উল্লেখ করবেন না।'

লালা লক্ষ্মীনারায়ণ উঠে বললেন, 'এটা দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে যে,

আপনারা তিন রাজনৈতিক দলের নাম করলেন, তাতে হিন্দুসভার নাম দিতে একদম ভুলে গেলেন কেন, হিন্দুসভা কি রাজনৈতিক দল নয়?

'না, রাজনৈতিক দল নয়।'

'হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক দল না হয় তো গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটিও রাজনৈতিক দল নয়।'

পাঁচ-সাতজন ব্যক্তি এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এতে শিখ সম্প্রদায়কে হেয় করা হচ্ছে। গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটিই শিখদের প্রতিনিধিত্ব করে।'

দেবদত্ত ফের লাফ দিয়ে সামনে এসে গেল: 'মহাশয়েরা, এইভাবে চললে আমরা কাজ করতে পারব না। সাম্প্রদায়িক বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। কাদের প্রতিনিধিত্ব পাওয়া গেল, সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়েও জরুরী শান্তি-কমিটিতে সব সম্প্রদায়ের একজোট হওয়া। তাতে আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীস্টান সবাই এক মঞ্চ থেকে শান্তির আবেদন জানাতে পারি। এই কথা মনে রেখে আমি প্রস্তাব করছি, শান্তি-কমিটির সহসভাপতি পদে আপনারা জনাব হায়াতবক্স, বক্সীজী আর জ্ঞানী যোধসিংজীর নাম মঞ্জুর করুন।

'মঞ্জুর, মঞ্জুর! ব্যস, তারপর কী আছে বলো।' একজনের হাঁক শোনা গেল। তারপর একজন হাততালি দিতেই আরও অনেকে হাততালি দিয়ে উঠল। যারা বিরোধিতা করত, তারা কোনও সুযোগই পেল না। প্রস্তাব সর্বাংশে গৃহীত হল।

এরপর রামদাস মাস্টার উঠে বলল, 'সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কমরেড দেবদত্তের নাম প্রস্তাব করছি। এক তো উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। ওঁরই চেষ্টায় আমরা আজ এক জায়গায় হতে পেরেছি। আরও কয়েকটা দিন আমাদের সামলে সুমলে চলতে হবে। শান্তি-কমিটিকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে। এ কাজে কমরেড দেবদত্ত হবেন সবচেয়ে উপযুক্ত লোক...'

'কী ব্যাপার? শহরে কি আর যুবক নেই? মরে গেছে?' মনোহরলালের গলা। আজও একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বুকের ওপর দুটো হাত জোড় করে সে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'আমার প্রশ্ন হল, সরকারের এই ল্যাংবোট, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টদের একজনকেই আপনারা এ কাজে বেছে নিচ্ছেন? অন্য যুবকেরা কি মরে গেছে? এ হল লোকঠকানো নির্বাচন। আমি এই মিটিং থেকে ওয়াকআউট করছি।...'

এই বলে সে পেছন ফিরে হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

'দাঁড়াও ইয়ার! কেন সভার কাজে বাগড়া দিচ্ছ?

মনোহরলাল তখনও বিগড়ে ছিল। 'ছাড়ো, ছাড়ো। এসব আমি অনেক দেখেছি। মনোহরলাল সোজা মুখের ওপর বলে। নিজের বাপকেও ভয় পায় না...'

কিন্তু কংগ্রেসের কিছু যুবক ওকে আটকে ফেলল। একজন ওর কোমর ধরে তুলে মিটিঙের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

'সরকারের যত পেটোয়া লোকেরা এখানে এসে জুটেছে। এদের সবাইকে আমার জানা আছে।...'

'চুপ! চুপ!'

'আমি কমরেড দেবদত্তের নাম সমর্থন করছি।

'আমিও সমর্থন করছি।

চটাপট চটাপট হাততালি। মিটিঙের কাজ আবার বেশ সুচারুভাবে চলতে লাগল। কিন্তু কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচনের জন্যে যত রাজ্যের নাম আসতে শুরু করল। লক্ষ্মীনারায়ণ, মরয়া দাস, শাহনওয়াজ।...সেই সময় প্রচুর মুসলমান সদস্য এক সঙ্গে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল। ওদের আগে আগে যাচ্ছিল মৌলাদাদ:

'এই কমিটিতে হিন্দুরাই দলে ভারী। এ কমিটিতে আমরা থাকতে পারি না আমি গোড়া থেকেই জানতাম এ কমিটি হবে হিন্দুদের ধামাধরা।...'

দেবদত্ত সমেত দশজন তাদের থামাতে ছুটে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে গণ্ডগোল হল। শেষকালে একটা সূত্র ঠিক হল যেটা অনুসরণ করে কার্যকরী সদস্যদের নির্বাচন করা হবে। সূত্র অনুযায়ী মোট সদস্য পনেরোজন—সাতজন মুসলমান, পাঁচজন হিন্দু আর তিনজন শিখ। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলতে থাকায় লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু শেষমেষ সূত্রটি গৃহীত হল। কার্যকরী সমিতিতে লালা লক্ষ্মীনারায়ণও এসে গেলেন, লালা মঙ্গলসৈনও, শাহনওয়াজও। সেই সঙ্গে আরও অনেক লোক। বেচারা শ্যামলালের নাম কেউ তুললই না। হিসেববাবুকে অনেকক্ষণ ধরে জামা টেনে টেনে সাধাসাধি করা সত্ত্বেও তিনি দ্বিধা করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল নিজেই উঠে দাঁড়াল:

'আমার অনুরোধ আমাকেও এই কমিটিতে রেখে আপনাদের কাজে লাগার সুযোগ দিন।'

'পনেরো জন হয়ে গেছে। আর নেওয়া যাবে না। বসে পড়ুন।' মঙ্গলসেন বলল। আরেক খেঁড়ু উঠে বলল:

'আমার মনে হয়, নিলে কোনো ক্ষতি নেই। আরও একজন মুসলমান আর একজন শিখ বাড়িয়ে নিলে ল্যাটা চুকে যায়।'

মঙ্গলসৈন আবার আপত্তি জানাল: 'না তা হতে পারে না। এভাবে কত লোককে ঢোকানো যায়?'

তখনও সিদ্ধান্ত পাকা হয়নি। এমন সময় হর্ন বাজবার আওয়াজ শোনা গেল। দেবদত্ত সভাপতির চেয়ারের কাছে গিয়ে বলল, 'মহাশয়েরা শান্তির প্রচারে বেরোবার বাস এসে গেছে। যাত্রার প্রথম পর্বে এখুনি আমরা রওনা হব। আমি সবিনয়ে অনুরোধ করছি, সভাপতি মহাশয় আর সহসভাপতি মহাশয়েরা এবং সেই-সঙ্গে বাসে আরও যতজন ধরে, আপনারা সবাই গিয়ে বাসে জায়গা নিন। বাস নানা জায়গায় থামতে থামতে যাবে। আমাদের বিশিষ্ট প্রবীণেরা থেমে থেমে স্থানীয় মানুষদের কাছে শান্তিরক্ষার আবেদন জানাবেন।'

শ্রোতারা সবাই উঠে দাঁড়াল। তারপর একে একে বাইরে চলে গেল। গোলাপী-সাদা ডোরাকাটা বাস। শান্তির বাস। ছাদের দুই কোণে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের ঝাণ্ডা। সামনে পেছনে লাউডস্পীকারের চোং।

'এই সঙ্গে একটা ইউনিয়ন জ্যাক্‌ও লাগিয়ে নাও।' মনোহরলাল ঠেস দিয়ে বলল।

লোকে বাইরে এসে যাওয়ার পর বাস থেকে স্লোগান দেওয়া হল :

'হিন্দু-মুসলিম—এক হও!'

'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য—জিন্দাবাদ!'

'শান্তি কমিটি—জিন্দাবাদ!'

লোকে বাসের মধ্যে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল। যারা আগে থেকেই উঠে বসেছে তারা কারা। কোন্ লোকটা লাউডস্পিকারে স্লোগান দিচ্ছে! ড্রাইভারের পাশে একজন মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে বসে আছে। অনেকেই তাকে দেখে চিনতে পারছিল না। কেউ কেউ আবার চিনতেও পারল। নাথু ব্যাটা মরে গেছে। নইলে সে এক নজরেই চিনতে পারত। ও তো মুরাদআলী! কালো রং, খোঁচা খোঁচা গোঁফ। ওর সরু ছড়িটা পায়ের নিচে লুটিয়ে রয়েছে। ছোট ছোট গুলিভাঁটার মতো তার চোখ। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে মাইক্রোফোনে স্লোগান দিচ্ছে। আরে, মুরাদআলী তো!

শান্তি অভিযানে বেরোবার আগেই নিজেদের মধ্যে বচসা হয়ে গেল। কে কোন সিটে বসবে। কে আগে কে পরে! প্রথম কে বলবে। কে মাইক্রোফোনে স্লোগান দেবে!

আগুপিছু হয়ে না বসে লীগ আর কংগ্রেসের প্রধানেরা ড্রাইভারের পেছনের সিটে পাশপাশি হয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণ ধরে এই নিয়ে ঠেলাগোঁজা চলল। কিন্তু ফটাফট বাস ভরে গেল। কেননা অনেকেই চাইছিল বাড়ির সামনে গিয়ে নেমে পড়তে। মনোহরলাল শেষ অবধি গোঁ ধরে থাকল—'এ বাসে হয় আমি বসব, নয় কমিউনিস্ট বসবে। যারা দেশের বেইমান, মরে গেলে ও আমি তাদের পাশে বসে যাব না।'

বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেবদত্ত বলল, 'মনোহরলাল সাহেব, আমি কোনও কথা রেখে ঢেকে বলি না। আমরা কংগ্রেসের ল্যাজ নই, বিপ্লবই আমাদের জীবনের ব্রত। শহরে শান্তিরক্ষা আজ জরুরী কাজ। আর তার জন্যেই সব পার্টি'র আর তার নেতাদের আজ এক জায়গায় করা দরকার। আপনার পার্টি'ও—যার নেতা আর অনুগামী একা আপনি। আমি এও জানি নানা ছেলেমানুষী ব্যাপার এর মধ্যে আছে। কিন্তু শান্তির জন্যে সবাইকে এক মঞ্চে আনা আজ নেহাৎই দরকার।

মনোহরলাল চিৎকার করে বলল। 'এখন আর কী শান্তি আনবে? শান্তি তো তোমার সাহেবরাই এনে দিয়েছে। দাঙ্গা করাতেও তারা, শান্তি করাতেও তারা।'

শ্যামলাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে নিজের দাঁড়ানোর ব্যাপারে

উমেদারি করছিল। এর মধ্যে মঙ্গলসেন এক লাফে বাসে উঠে বসে পড়ল। শুধু বসা নয়, রীতিমত সামনের দিকের একটা সিটে। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ে যাওয়ায় শ্যামলাল রেগে আগুন হয়ে গিয়ে 'আমায় কেউ বলেনি, আমায় কেউ জানায় নি।' বলে গুঁতোগুঁতি করে লোক ঠেলে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসের ভেতর লাফিয়ে পড়ল।

মুসলিম লীগের প্রধানের সঙ্গে বসে বক্সীজী তাঁর চোখের সামনে এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা গভীর অনাসক্তির মধ্যে তিনি ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁর মন বলছিল, 'চিলশকুন উড়বে, এবার আরও বেশি করে উড়বে।'

সেই সময় ড্রাইভারের পাশে সিটে বসে মুরাদআলী ফের স্লোগান দিতে শুরু করে দিল। সেইসঙ্গে শান্তির বাসও শান্তির অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

বাংলোর ডাইনিং রুমে টেবিলে মুখোমুখি হয়ে বসে রিচার্ড আর লীজা নিজেদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে কথা বলছিল।

লীজা আবার নিজেকে সামলে নিয়েছে। রিচার্ডের হাতেও বেশি কাজ নেই। শহরের জীবন এখন একটা বাঁধাধরা রাস্তায় এসে গেছে। ছোট অফিসাররা নিজেরাই এখন কাজ চালিয়ে নিতে পারছে।

'আমি চেয়েছিলাম এখানে কিছুদিন থেকে যেতে। ইচ্ছে ছিল তক্ষশিলা মিউজিয়ামে বসে কিছু কাজ করব, এখানকার লোকদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করব। এখন মনে হচ্ছে, এখানে বেশিদিন থাকা হবে না।'

এ রকম একটা আভাস পেয়ে ভেতরে ভেতরে লীজা খুশি হল: 'তার মানে, তুমি বদলি হচ্ছ? তোমার পদোন্নতি হচ্ছে?' রিচার্ড মুচকি হাসল। মুখে কিছু বলল না।

'কিছু বলছ না কেন? সত্যি তোমার পদোন্নতি হতে চলেছে?'

'পদোন্নতির কথা উঠছে না, লীজা। যে জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় সরকার সাধারণভাবে সেখানকার অফিসারদের বদলি করে দেয়। সে জায়গায় নতুন অফিসারদের এনে বসানো হয়।...'

'তার মানে, শিগগিরই এখান থেকে চলে যেতে হবে?'

'মনে হয়। ঠিক কী করবে, আমি জানি না।'

কিন্তু তুমি তো এখানে থেকে যেতে চাইছিলে, তাই না? তক্ষশিলা মিউজিয়ামে গিয়ে কাজ করবে, নিজের বই লিখবে—এটাই তো চেয়েছিলে! তাই না?'

রিচার্ড কাঁধটা একটু ঝাঁকাল। তারপর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে টেবিলের নিচে পা ছড়িয়ে দিয়ে, মজা করে বলল, 'কী দিয়ে শুরু করি?'

লীজা ভুরু তুলে বলল, 'কেন, রিচার্ড! কী দিয়ে শুরু করব বলছ কেন?'

'তুমি এটাই তো জানতে চাইছিলে যে, এখানে কী হয়েছে না হয়েছে। তাই না?'

লীজা এবার কয়েকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিল। তার মানে, ও বলতে চাইছিল—বলো না বলো, ওতে আর এখন কিছু যায় আসে না।